আয়নামহল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য



আয়নামহল

এইমাত্র সূর্য ডুবে গেল। দিগন্তের ক্যানভাসে এখন কত যে রঙের বাহার! লালের তো ছড়াছড়ি। সিঁদুরে লাল, রক্ত লাল, রক্তিম বেগুনি। সঙ্গে মিশেছে পীতাভ কমলা, রঞ্জন হলুদ। একটা আধচেনা মভও। আকাশের জমিনে অতিনাবিকনীল আভা। আরও আরও কত যে চোরা রং উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো পলকা মেঘে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রংগুলো।

পরানবিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে দিব্যজ্যোতি নেশাগ্রস্তের মতো দৃশ্যটা দেখছিল। ছবিটা শুষে নিচ্ছিল চোখে। আকাশের এই বিভঙ্গ তার কত অজস্রবার দেখা। জাহাজের ডেক থেকে, এরোপ্লেনের জানলা দিয়ে, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। আটলান্টিক, ক্যাসপিয়ান, প্রশান্ত মহাসাগর, সাহারা মরুভূমি, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, কোথায় না সূর্যাস্ত দেখেছে সে। তবু তৃষ্ণা মেটে কই! দৃশ্যটা তাকে পিপাসার্ত করে রাখল আজীবন। সে ল্যান্ডস্কেপ আঁকে না। তার বিষয়, মানুষ আর সময়ের জটিল আবর্ত। তবু এই দৃশ্যটা দেখার জন্যই যেন আরও লক্ষ বছর বাঁচতে ইচ্ছে করে দিব্যজ্যোতির।

অথচ ছবিটা তো উলটো সংকেতই পাঠায়। দিব্যজ্যোতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, মৃত্যু আরও একটু কাছে এগিয়ে এল। এখনও কত কিছু করা হয়নি জীবনে, কত কী যে পাওয়া বাকি! বড় ছোট্ট এই জীবনটা, বড্ড ছোট।

পরের ভাবনাটাকে অবশ্য বেশিক্ষণ পাত্তা দেয় না দিব্যজ্যোতি। পঞ্চাশে পৌঁছোলে ওরকম শৌখিন মৃত্যুচিন্তা তো একটু আধটু আসেই। হাহ্, আজকালকার দিনে পঞ্চাশ একটা বয়স নাকি! সামনে এখনও অফুরান সময়। দিব্যজ্যোতির শরীরস্বাস্থ্যও যথেষ্ট মজবুত, এখনও সে

পাহাড়ি খচ্চরের মতো খাটতে পারে, ছুটে বেড়ানোয় জংলি ঘোড়াকেও সে হার মানায়, শ্রমিক পিঁপড়ের মতো ব্যস্ত থাকতে পারে কাজে। তার ছ'ফুট লম্বা ঋজু দেহকাণ্ডে, শক্ত পেশিতে, চওড়া কাঁধে, এখনও টগবগ করছে যৌবন। খুচরোখাচরা ফালতু আশঙ্কায় পীড়িত হওয়া তাকে অন্তত মানায় না।

দূরের ক্যানভাস থেকে প্রিয় রংগুলো মুছে যাচ্ছে ক্রমশ। মাঘ শেষের বিকেল ফুরিয়ে এল, এবার আঁধার নামবে। পশ্চিমের আকাশ থেকে মুখ ফেরাল দিব্যজ্যোতি। লম্বাঝুল পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করল টর্চখানা। জ্বালাল। নেবাল। গলা ছেড়ে গান ধরেছে।

গান গাইতে গাইতে হাঁটছে দিব্যজ্যোতি। লম্বা লম্বা পায়ে। মেঠো রাস্তার বন্ধুরতাকে পরোয়া না করে। তার সুরজ্ঞান প্রায় নিখুঁত, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণও অতি স্পষ্ট। গানের আবেগে মাথা আন্দোলিত হচ্ছে দিব্যজ্যোতির, প্রসারিত দুই বাহু হঠাৎ হঠাৎ উঠে যাচ্ছে ঊর্ধ্বপানে।

পরানবিলের এদিকটা ভারী শুনশান। বেশ কিছুটা পথ দু'ধারে অনাবাদি জমি, জংলা ঝোপঝাড়। তবু মানুষের দর্শন মিলে যায় মাঝে মাঝে। তারা অনেকেই দিব্যজ্যোতিকে চেনে। কলকাতা থেকে এসে সোনামাটিতে সুবর্ণলতার মতো একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছে সে, আশপাশের আর পাঁচটা গ্রামের মেয়ে-বউরাও সেখানে কাজ শিখতে আসে। কাজ শিখছে. করছে, সুবর্ণলতার সূত্রে দুটো-চারটে বাড়তি পয়সা আসছে গরিবগুরবোর সংসারে। বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে জেলা সভাধিপতি, সকলের সঙ্গেই দিব্যজ্যোতির খাতির। স্বয়ং মন্ত্রীমশাই দিব্যজ্যোতির ডাকে সাড়া দিয়ে ঘুরে গেছেন সুবর্ণলতায়। এ হেন ব্যক্তি নির্জন পথে একা একা দু'হাত ছড়িয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, হাওয়ায় উড়ছে তার কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল— দৃশ্যটা দেখে শিহরিত হয় মানুষজন। সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানায়।

তা যথেষ্ট ওজনদার হওয়া সত্ত্বেও দিব্যজ্যোতির চালচলনে কিন্তু কণামাত্র উন্নাসিকতা নেই। চেনা হোক, কি অচেনা, পথচলতি সকলের

সঙ্গেই গান থামিয়ে দু'-চারটে বাক্য বিনিময় সে করবেই করবে।

কী গো কর্তা, আছ কেমন? পরিবারের সব কুশল তো?

এবার চাষবাসের কী হাল? কপিটপি হল? দাম পাচ্ছ ঠিকঠাক? নাকি সবই দালালদের গভ্ভে যাচ্ছে?

হ্যাঁগো মিঞা, ছেলেকে স্কুল ছাড়ালে কেন? বাগাল খাটাতে চাও নাকি?

এমন আন্তরিক প্রশ্নে বিগলিত হয় গ্রামের মানুষ, দিব্যজ্যোতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির পারা আপনাআপনি চড়ে যায়।

আজ অবশ্য একটি জনপ্রাণীর সঙ্গেও দেখা হল না। গানের পর গান, গানের পর গান, কণ্ঠচর্চাতেই কেটে গেল পথটুকু।

বিলের দিক থেকে সোনামাটি এলে প্রথমে মুসলমান পাড়া। গ্রামের এপাশটায় এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। ঘরে ঘরে টেমি জ্বলছে। বাতাসে ভাত ফোটার গন্ধ। দ্রুত পায়ে জায়গাটা পার হতে গিয়েও কী ভেবে দাঁড়াল দিব্যজ্যোতি। রাস্তা ছেড়ে সটান ঢুকেছে এক মাটির উঠোনে। গমগমে গলায় হাঁক পাড়ল, মকবুল? মকবুল আছ নাকি?

কুপি হাতে বেরিয়ে এসেছে মকবুল। বছর চল্লিশ বয়স, রোগা ঢ্যাঙা শরীর, পরনে লুঙ্গি, গায়ে সুতির চাদর। শশব্যস্তভাবে বলল, ছালাম মাস্টারমশাই। সাঁঝবেলায় হঠাৎ আমার ঘরে যে?

দিব্যজ্যোতি রগুড়ে গলায় বলল, কেন? সাঁঝবেলায় আসা মানা নাকি?

তোবা, তোবা। কী যে বলেন! আসেন, আসেন মাস্টারমশাই, আসতে আজ্ঞা হোক।

স্থানীয় মানুষদের মুখে এই মাস্টারমশাই ডাকটা শুনতে দিব্যজ্যোতির বেশ লাগে। অন্য রকম। কলকাতার স্যার সম্বোধনটি দিব্যি এখানে কেমন মাস্টারমশাই হয়ে গেছে। অবশ্য ছাত্রছাত্রীমহলেও সে আর এখন স্যার নয়, দিব্যদা। শুধুই দিব্যদা। বছর দুয়েক হল আর্ট কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকের তকমাটা ঝেড়ে ফেলেছে দিব্যজ্যোতি।

হাসিমুখে দিব্যজ্যোতি এগিয়ে এল, তা চাটাই টাটাই কিছু পাতো

হাত-পা ছড়িয়ে বসি।... আর একটু জল খাওয়াও তো দেখি।

কথাটুকু শুধু বলার অপেক্ষা। মকবুল নির্দেশ দেওয়ার আগেই মকবুলের বিবি সালমা বেরিয়ে এসে পাটি বিছোতে শুরু করেছে দাওয়ায়। ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এল ঘটিতে। বাঁ হাত কনুইয়ে রেখে ডান হাতে ঘটি বাড়িয়ে দিয়েছে।

খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল দিব্যজ্যোতি। জিনস্ পরা পা দুটো মেলে দিল টানটান। গলায় জল ঢালতে ঢালতে চোখ চলে গেছে সালমায়। আলগা ঘোমটা টানা মুখে আলোছায়ার খেলা। বছর পাঁচেক আগেও দিব্যি লাবণ্যময়ী ছিল সালমা, এখন রীতিমতো চোয়াড়ে। নাকছাবিটা একেবারেই বেমানান লাগে। গাঁ-ঘরের এই মেয়েগুলো যেন তিরিশ পেরিয়েই বুড়িয়ে যায়। অভাবের কারণে কি? নাকি শরীরের যত্নআত্তি নিতে জানে না বলে?

ঘটি ফিরিয়ে নিয়ে সালমা ঘোমটাটা টেনে নিল আর একটু। চেটোর উলটো পিঠে চিবুক মুছল দিব্যজ্যোতি। এবার দৃষ্টি ঘরের দিকে, কী গো, তোমাদের বাড়ি আজ এত চুপচাপ কেন? ছেলেমেয়েগুলো সব কোথায়?

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সালমা নিচু গলায় বলল, তিন ভাইবোনই গেছে খালার বাড়ি। রসুলপুর। আগের হপ্তায় তাদের খালাতো ভাইয়ের শাদি কিনা।

তাই বলো।... কবে গেল?

এই তো, পরশু।

পরশু? তবে যে কল্পনা বলল, আমিনা দশ-বারো দিন হল সুবর্ণলতায় আসছে না?

সালমা চুপ। মিঞার সঙ্গে কী যেন কথা হল চোখে চোখে। টুকুস সেঁধিয়ে গেল ঘরে।

মকবুল কাশছে খুকখুক। গলা ঝেড়ে বলল, আমিনাকে আর পাঠানো যাবে না, মাস্টারমশাই।

কেন গো?

ওর শাদির ঠিক হয়েছে। এখন মেয়েটার ঘরে থাকাই ভাল।

বলো কী গো! ওইটুকু মেয়ের বিয়ে দেবে?

ওইটুকু কী বলছেন মাস্টারমশাই! পনেরো পুরে ষোলোয় পড়ল। তা ছাড়া... মকবুল একটু সময় নিয়ে বলল, যেচে এসে পছন্দ করল... ছেলের রোজগারপাতিও ভাল... কুলগাছিয়া বাজারে নিজেদের ফলের দোকান... দাবিদাওয়াও বেশি নেই...। এমন পাত্র হাতছাড়া করি কী করে?

ধ্যাত, তোমরা না...! দিব্যজ্যোতি মাথা ঝাঁকাল, মেয়েটাকে ট্রেনিং ফেনিং দিয়ে তৈরি করলাম, চমৎকার জরির কাজ শিখে নিয়েছিল...। আর দুটো বছর সুবর্ণলতায় থাকলে ওর কত রোজগার হত জানো? নিজের বিয়েশাদির খরচা নিজেই তুলে নিতে পারত।

কী আর করা যাবে, মাস্টারমশাই? আমিনার কপালে নাই।

কপাল কপাল কোরো না তো। মেয়ের কপাল তো তোমরাই নষ্ট করছ।

দিব্যজ্যোতির ঝাঁঝে এতটুকু হেলদোল নেই মকবুলের। উদাসীন স্বরে বলল, ছাড়েন না মাস্টারমশাই। যা হবে না, তা ভেবে কী লাভ?... চা খাবেন?

না।

রাগ করেন কেন, মাস্টারমশাই? আপনার মতো মানী লোক মুখ ফেরালে আমরা গরিবরা যাই কোথায়!

গ্যাস দিয়ো না, আমায় ফোলাতে পারবে না। মানী লোকই যদি ভাবো, বিয়েশাদি ঠিক করার আগে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে পারতে। আমি তো ফি হপ্তাতেই আসি। আসি না? দিব্যজ্যোতি গজগজ করছে। গোমড়া মুখে বলল, অঘ্রান মাসে সরস্বতীটা চলে গেল। কী সুন্দর কাঁথাস্টিচের কাজ করছিল, সবাই ধন্য ধন্য করত। ওই একরত্তি মেয়েটাকে একটা আধবুড়ো পয়েন্টসম্যানের গলায় ঝুলিয়ে দিল! ব্যস, খেল খতম, পয়সা হজম, ভবিষ্যতের বারোটা।

তা কেন মাস্টারমশাই? শিক্ষা তো কাজে লাগেও। দরকার হলে ঘরসংসার করেও তো...

হুম। ওইসব সাত পাঁচ ভেবেই তো আমার সুবর্ণলতা তৈরি করা। দিব্যজ্যোতি ঠোঁট কুঁচকোল, যাক গে যাক, আমি বললেও তো তোমরা কেউ শুনবে না, আইনকানুন না মেনে পনেরো-ষোলো বছরেই মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে দেবে। এতে যে মেয়েদের কত ক্ষতি হয়, তা সরস্বতীর বাবাও বোঝেনি, তুমিও বুঝবে না।

মকবুল করুণ মুখে বলল, কী করি মাস্টারমশাই? দেশগাঁয়ের রীতি তো মানতে হবে।

মানো। দুষ্ট রীতি আঁকড়ে বসে থাকো। আমি কিন্তু রাগ করেছি, সাফ বলে দিলাম। দু'-চার সেকেন্ড ঝুম হয়ে রইল দিব্যজ্যোতি। ফের বলল, যাক গে, আমার কিছু মান তো রাখবে? আমিনা যে কাজটা ধরেছিল, সেটা অন্তত শেষ করে আসুক।

মকবুল মাথা চুলকোল, ক'দিন লাগবে?

কত আর! তিন-চার দিন।

ঠিক আছে। রসুলপুর থেকে ফিরলেই পাঠিয়ে দেব। তবে ওকে কিন্তু আর নতুন কাজ দিতে মানা করে দেবেন, মাস্টারমশাই।

হুম।

আর একটা কথা, মাস্টারমশাই। বলছিলাম... আমিনার শাদি মিটে গেলে যদি আমিনার মা সুবর্ণলতায় যায়... সেলাইফোঁড়াইয়ের কাজ ও শিখে নিতে পারবে না?

দিব্যজ্যোতি হা-হা হেসে উঠল, এই তো, পথে এসেছ! তোমার বউয়েরও তবে রোজগারপাতির সাধ জেগেছে?

মকবুল লজ্জা লজ্জা মুখে হাসল।

আমি তো এইটাই চাই। তোমাদের ভালর জন্যই চাই। তোমরাই শুধু বুঝতে চাও না।... ও.কে। কোনও সমস্যা নেই, তোমার বিবিকে কল্পনার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। ঘরের মেয়ে-বউদের জন্য সুবর্ণলতার দরজা তো খোলাই থাকে।

তা হলে এবার একটু কালো চা করতে বলি? চিনি ছাড়া?

দিব্যজ্যোতির মনে হল, জিভটা একটু চা-চা করছে বটে। কিন্তু গা

ঘরের লোক লিকার চা করতেই জানে না। সস্তা দামের গুঁড়ো চা জলে ফুটিয়ে একটা হাকুচতেতো ক্বাথ বানায়।

হেসে বলল, না না, তোমাদের কষ্ট করার দরকার নেই। গলাটা বড্ড শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার একটু জল খাওয়াও।

জল শেষ করে দাওয়া থেকে নেমেছে দিব্যজ্যোতি, আচমকাই পৃথিবীটা কেমন দুলে গেল। নাকি মাথাটা? দু'-চার সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে সামলাল নিজেকে। তারপর মকবুলের উঠোন পেরিয়ে পায়ে পায়ে রাস্তায়। ক্রমশ গতি বাড়াল। ঠান্ডাটা এবার কমে গেছে হঠাৎ, তবু কেমন যেন শিরশিরানি জাগছে দেহে। যেন বিদ্যুতের হালকা তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে শিরা বেয়ে। হলটা কী? দুপুরে ফুলকপি দিয়ে কইমাছ রেঁধেছিল কল্পনা। মাঘের কপি হজম করা কঠিন, অবেলায় খেয়ে গ্যাসট্যাস হল না তো? কিন্তু এতক্ষণ তো কোনও উপসর্গ ছিল না?

কবে এলেন, মাস্টারমশাই?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। সামনে শ্যামল গুছাইত। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। সোনামাটিরই বাসিন্দা। হাতে চার সেলের একখানা গাবদা টর্চ বাগিয়ে কোথায় যাচ্ছিল কে জানে, দিব্যজ্যোতিকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। অগত্যা দিব্যজ্যোতিকেও থামতে হয়।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিব্যজ্যোতি বলল, এই তো, আজ সকালবেলা।

থাকছেন নাকি কয়েক দিন?

ইচ্ছে তো আছে। বলেই একটা দরকারি কথা মনে পড়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল, সুবর্ণলতার টিউবওয়েলের ব্যাপারটা কদ্দূর এগোল ভাই?

স্যাংশন তো হয়ে গেছে। দু'-এক মাসের মধ্যেই বসে যাবে।... আপনি চেয়েছেন, সরকার দেবে না, এ কি হয়?

সূক্ষ্ম শ্লেষটা দিব্যজ্যোতির কান এড়াল না। শ্যামল গুছাইতের এখনও তার ওপর কিঞ্চিৎ ক্ষোভ আছে, সে জানে। সুবর্ণলতা শুরু করার সময়ে শ্যামল যথেষ্ট বাগড়া দিয়েছিল। বাস রাস্তার ধারে কী করে এক লপ্তে পাঁচ একর জমি পেয়ে গেল একটা বাইরের লোক, তা নিয়ে খোঁচাখুঁচি

করেছিল বিস্তর। পরে অবশ্য পার্টির ওপরতলা থেকে ধমকটমক খেয়ে সে প্রশমিত হয়। এখন টুকটাক টিপ্পনী কেটেই বেচারার সুখ।

দিব্যজ্যোতি শব্দ করে হেসে উঠল, আরে দুর, আপনারা চেয়েছেন বলেই সুবর্ণলতা হয়েছে। চলছেও আপনাদেরই অনুগ্রহে। আসলে সুবর্ণলতা তো আপনাদেরই। আমি নিমিত্ত মাত্র।

হ্যাঁ। সে তো বটেই।

আমার কিন্তু আর একটা আবদার আছে ভাই। টিউবওয়েলটা যেন বাইশ পাইপের হয়। মেয়েগুলো অত দূর দূর থেকে আসে, ওদের জলটুকু যদি হাইজেনিক না হয়... লোকাল লোকেরও তো পানীয় জলের ভাল একটা সোর্স হবে।

কিন্তু... আঠারো পাইপের বেশি তো এখন কোথাও দেওয়া হচ্ছে না। শ্যামলের কণ্ঠে ফের শ্লেষ, আপনারও তো ভাল ফান্ড আছে, সেখান থেকে কিছু ঢালুন না। বাইশ কেন, তা হলে চল্লিশ পাইপও হয়ে যায়।

এবারও চটল না দিব্যজ্যোতি। হেসেই বলল, সে তো দেওয়াই যায়। তবে ওই টাকা ক'টা হাতে থাকলে আপনাদের সুবর্ণলতায় আরও কতগুলো মেয়েকে প্রোভাইড করা যায়, সেটাও ভাবুন। প্লাস, ডাইভারসিফিকেশনের কাজটা তো প্রায় থেমেই আছে। বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য বজায় রেখে সুবর্ণলতা সফ্‌ট টয় বানাবে, মুখোশ তৈরি করবে... জুট নিয়েও একটা প্ল্যান ভাবা হচ্ছিল...

ভাল তো। এগিয়ে যান। শ্যামল কবজিতে ঢাউস টর্চ মেরে সময় দেখল, আমরা তো আছিই। আপনার পাশে পাশেই আছি।

ঘাড়ের ওপরেই আছি! বলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দিব্যজ্যোতি। হাসতে হাসতেই বলল, আমার কমেন্ট কিন্তু সিরিয়াসলি ধরবেন না ভাই। পাগল-ছাগল মানুষ, উলটোপালটা বলে ফেলি...। আসুন না কাল-পরশুর মধ্যে একদিন। আমার দুই ছাত্র এসেছে... খুব প্রমিসিং স্কাল্‌পটার। এখানকার কুমোরপাড়ার শিল্পীদের নিয়ে দিন তিনেকের একটা ওয়ার্কশপ করাব ভাবছি। এলে ছেলে দুটোর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়ে যাবে।

দোখ। পারলে যাব।

শ্যামলকে পেরিয়ে কয়েক পা যেতে না-যেতেই ফের মাথায় একটা ছোট্ট চক্কর! মুহূর্তের জন্য দিব্যজ্যোতির মনে হল পা দুটোও যেন টলে গেল। কী হচ্ছেটা কী? প্রেশার টেশারে ধরল নাকি? বছর পনেরো আগে স্পন্ডিলোসিস হয়েছিল, ভুগিয়েছিল বেশ কিছুদিন, ব্যায়াম ট্যায়াম করে চাপা দিয়েছিল তখনকার মতো। ইদানীং শরীরচর্চা হয় না নিয়মিত, রোগটা কি আবার ফিরে এল! নাহ্, কাল থেকে ঘাড় গলা মাথার কসরতটা চালু করতে হবে।

ধীর লয়ে মন্দিরপাড়ার পাঁচ-ছ'খানা পাকাবাড়িকে পিছনে ফেলে, বাস রাস্তার ওপারে, সুবর্ণলতায় এসে পৌঁছোল দিব্যজ্যোতি। স্বর্ণলতায় ছাওয়া কাঠের সুদৃশ্য ফটক ঠেলে পা রাখল প্রাঙ্গণে। দরজাটা ধরে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুবৎ। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

সুবর্ণলতার রূপটি ভারী স্নিগ্ধ। ঢোকার মুখেই মাথা ঝুঁকিয়ে দুই দ্বাররক্ষিণী। রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া। বিশাল কম্পাউন্ডকে ঘিরে থাকা উঁচু পাঁচিলের ভেতরপানে সার সার সবুজ পাহারাদার। কদম শিমুল পলাশ বকুল ছাতিম কাঁঠালিচাঁপার পাশে নিম আম জাম শ্যাওড়া শিরীষ হিজলের দল। আছে মহুয়া। আছে জারুল। আছে মুচকুন্দ, আছে নাগকেশর। ফটকের একদম সামনেটাতে ঘাসের নরম গালিচা, তাকে বেড় দিয়ে ফুলের বাগান। মরশুমি ফুল, বারোমেসে ফুল, কিছুই সেখানে অচ্ছুৎ নয়। বেল জুঁই কামিনী গন্ধরাজের সৌরভে ম-ম করে গ্রীষ্ম বর্ষা, শীত হেমন্তে ডালিয়া গাঁদা চন্দ্রমল্লিকার শোভায় চোখ জুড়িয়ে যায়। সযত্ন নির্মিত রাঙা মাটির পথ সদর থেকে চলে গেছে অন্দরে, ঘুরে এসে ফের ফটকেই মিশেছে। পথের ধারে খানবারো কুঁড়েঘর, অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো। ঘরগুলো অবশ্য নিখাদ মাটির নয়। ভিত খোঁড়া, ইটের গাঁথনি, সিমেন্টের প্রলেপ, ছাদ ঢালাই, সবই হয়েছিল। দৃশ্যমান চালটুকুই শুধু খড়ের। দেওয়ালের রংও মাটি বলেই ভ্রম হয়। মধ্যিখানে অফিস, বাঁ দিকের ঘরগুলোতে কাজ করে মেয়েরা, ডান দিকে থাকার জায়গা। অতিথিদের। দিব্যজ্যোতির। আর কল্পনা-সুখেনের। পিছনে

চওড়া চাতাল, কুয়োতলা, মালি চৌকিদারদের আস্তানা, হাঁস-মুরগির মিনি খামার, সবজিখেত। পুকুরটির বাহার আছে। গোল নয়, চৌকো নয়, কাটা হয়েছে নদীর ছাঁদে। আঁকাবাঁকাভাবে। নীল হলুদ লাল কমলা শাপলা ফোটে জলে। ওপারের সবজিখেতে যেতে একখানা বাঁশের সাঁকো পেরোতে হয়। সব মিলিয়ে সুবর্ণলতা সত্যিই যেন তুলির টানে আঁকা ছবি। দিব্যজ্যোতির নিজের হাতে ফুটিয়ে তোলা একমাত্র ল্যান্ডস্কেপ।

লাল মাটির পথ ধরে দাওয়ারূপী বারান্দায় উঠে দিব্যজ্যোতি দেখল, গেস্টরুমে অনুপল আর সাগ্নিক দাবায় মগ্ন। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁকছোঁক শব্দ আসছে, সম্ভবত রাতে কোনও নতুন পদ বানাচ্ছে কল্পনা।

নিজের খাটে গিয়ে শুলেই বুঝি দিব্যজ্যোতির ভাল লাগত একটু। তবু অনুপলদের ঘরেই ঢুকল সে। যৌবনের সান্নিধ্য তার ক্লান্তি হরণ করে নেয়।

হালকা গলায় দিব্যজ্যোতি বলল, ভরসন্ধেবেলা তোরা বুড়োদের মতো দাবা নিয়ে বসেছিস! ছ্যা ছ্যা।

খেলা থেমেছে। সাগ্নিক একগাল হাসল, না দিব্যদা, জাস্ট টাইম পাস্। আপনি আমাদের ফেলে হাওয়া হয়ে গেলেন...

কপচাস না। দিব্যজ্যোতি বেতের চেয়ার টেনে বসল, যা একখানা ভাতঘুম দিচ্ছিলি, বাপস্। পাল্লা দিয়ে দু'জনের নাক ডাকছিল।

অনুপল দাবার গুটিগুলো গুছিয়ে রাখছে বাক্সয়। ঘাড় দুলিয়ে বলল, হুম, দুপুরের খাওয়াটা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল।

কাল সুবর্ণলতার পুকুরের মাছ খাওয়াব। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বসে যাব ছিপ নিয়ে।

যদি মাছ না ওঠে?

উঠবে, উঠবে। সুখেন দারুণ চার বানায়। দিব্যজ্যোতি বেঁটে টেবিলটায় পা তুলে দিল, তারপর বল... ঘুম থেকে উঠে করলিটা কী?

আপনার বাগানেই চরে বেড়াচ্ছিলাম।

জঙ্গল বল। সাগ্নিক অনুপলকে শুধরে দিল, গাছে গাছে খুদে অরণ্য।

দিব্যজ্যোতি চোখ তেরচা করল, বড় গাছ ক'টা আছে গুনেছিস?

টোটাল এরিয়ায়? গুনে শেষ করা যাবে?

এমন কিছু তো বেশি নয়। সামনে পেছনে মিলিয়ে সিক্সটি নাইন।

কাউন্ট করে লাগিয়েছেন?

ইয়েস মাই বয়েজ। আমার পহেলা গার্লফ্রেন্ড উনসত্তর বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। তার স্মৃতিটা ধরে রেখেছি।

অনুপল আর সাগ্নিক চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে। দিব্যজ্যোতি হো হো হেসে উঠল, ওরে গাড়ল, ছেলেদের পয়লা গার্লফ্রেন্ড কে হয়? ঠাকুমা, অর দিদিমা। ঠাকুমা তো আমার জন্মের আগেই ফুটুস। সো... ইট ওয়াজ মাই দিদিমা। সুবর্ণলতা গুহরায়। বুড়ি আম খেতে খুব ভালবাসত, তাই আমগাছই আছে চোদ্দোখানা। অল ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি। হিমসাগর, ক্ষীরসাপাতি, বেগমফুলি, ল্যাংড়া, ফজলি, মধুকুলকুলি...

কথার মাঝেই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসেছে কল্পনা। শ্যামলা রং, আঁটোসাঁটো চেহারা, মুখচোখ সুশ্রী হলেও কেমন যেন রসকষহীন। উদ্ধত যৌবনে এক ধরনের রুক্ষতা আছে। চাঁছাছোলা গলায় দিব্যজ্যোতিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন চা খাবে, মামা?

এদের দিয়েছিস?

তিনবার। আলুপকোড়া ভেজেছিলাম। ফিনিশ। তুমি এত দেরি করলে?

মকবুলের ওখানে গিয়েছিলাম।

আমার কথা মিলেছে? সরস্বতীর কেস?

হুম। তাই তো দেখছি। দিব্যজ্যোতি মাথা নাড়ল, তবে কাজটা তুলে দিয়ে যাবে।

দিলেই ভাল।... চা বসাব?

থাক। তুই বরং আমাদের গ্লাস বোতল দিয়ে যা।... আমার ঘরে গিয়ে ব্যাগটা খোল, দুটো হুইস্কি আছে...

এক্ষুনি টানতে বসে যাবে?

বেশি গার্জেনি ফলাস না তো। যা। সঙ্গে পেঁয়াজ শশা কুচিয়ে দিবি। সুখেন দুপুরে ক'টা কুচো মাছ তুলেছিল না?

রাতের জন্য ভেজেছি।

দিয়ে দে এখন।... রাতে কী মেনু?

তোমার জামাই একটা মোরগা কেটেছে। ভাত আর মোরগার ঝোল। আর স্যালাড।

ফাইন।... ও-ঘর থেকে আমার সিগারেট দেশলাইটাও নিয়ে আসিস।

কল্পনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

তার গমন ভঙ্গিটি দেখে অনুপল ফিকফিক হাসছে, আপনার সুবর্ণলতার কর্ত্রীটি কিন্তু বেশ জাঁদরেল। মিলিটারি টাইপ।

সেইজন্যই তো ওকে এখানে আনা। এইসব প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে কড়া ধাতের লোক দরকার। আর জানিসই তো, কড়া হওয়া আমার নেচারে নেই...। দিব্যজ্যোতি চেয়ারের কাঁধে হাত ছড়িয়ে দিল, কল্পনা আমাদের বাড়িতে কাজ করত। খুব ছোটবেলা থেকে মা'র সঙ্গে আসত কাজে। ইন ফ্যাক্ট, ওর মা-ই ছিল আমাদের হাউসমেড। মেয়েটাকে স্কুলে ভরতিও করে দিয়েছিলাম, ক্লাস সিক্সের বেশি এগোতে পারেনি। তারপর বড় হল... বিয়েটিয়ে দিয়ে দিলাম। বরটা বোকার বেহদ্দ। দুটোকেই যুতে দিয়েছি এখানে। কল্পনাই সুখেনকেও খাটায়।

অনুপল চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, এখানকার হিসেবপত্র, হ্যানাত্যানা, সব ও সামলাতে পারে?

আরে না। আমিই দেখি। হিসেবপত্রর জন্য একটা আলাদা লোকও আছে। সপ্তাহে দু'দিন করে এসে খাতা বিল ভাউচার লিখেটিখে যায়। কল্পনা দেবী আছেন তর্জন-গর্জনের জন্য। বলতে পারিস, আমার ডাকসাইটে সুপারভাইজার। ওর ভয়ে লোকাল বাচ্চাকাচ্চারাও ফল চুরি করতে সাহস পায় না। আমি গাঁয়ে এসে আম-জামটা বিলোই বলে মহারানির কী রাগ!

সাগ্নিক খাট থেকে নেমে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখছে বাইরেটা। ঘরের আলো জানলা পেরিয়ে খানিক গিয়েই দীপ্তি

হারিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাগ্নিক বলল, আপনার কম্পাউন্ডটা কিন্তু বড্ড অন্ধকার। ভেতরে সার্চ লাইট গোছের কিছু লাগাতে পারেন।

মাথাটা একটু যেন ঝিমঝিম করছে আবার। উপেক্ষা করে দিব্যজ্যোতি হাসল, এফেক্টটা ভাল হবে না। আমার কনসেপ্টটাই মার খেয়ে যাবে। তোদের মনে আছে, ক্লাসে আমি একটা কথা বারবার বলতাম? ডার্কনেস হ্যাজ ইটস ওউন বিউটি। সেই সৌন্দর্যটা আলোর সৌন্দর্যের চেয়ে কিছু কম নয়। ...সত্যি বলতে কী, আলোর চেয়ে অন্ধকারই মানুষের কল্পনাকে বেশি স্টিমিউলেট করে। রাত্তিরবেলা বাইরে বেরিয়ে দেখিস... বাতাসের শব্দ, পাতা পড়ার আওয়াজ, রাতচরা পাখির ডাক, নেভি-ব্লু স্কাই উইথ লাখ লাখ তারা এবং চারপাশটাকে ভাল করে দেখতে না-পাওয়া... সব ক'টার কম্বিনেশনে কেমন এক পিকিউলিয়ার অনুভূতি তৈরি হয়। মাঝখানে একটা ধ্যাবড়া আলো দিলে সব যাবে ভোগে। এখানে ইলেকট্রিসিটি আনারই আমার ইচ্ছে ছিল না। নেহাত মেয়েগুলো কাজকর্ম করে, আলো পাখা থাকলে ওদের একটু সুবিধে হয়...

কল্পনা ট্রেতে মাছ ভাজা, শসা, পেঁয়াজ নিয়ে ঢুকল। পিছন পিছন সুখেন, হাতে পানীয়র সরঞ্জাম। হুইস্কির বোতল, গ্লাস, জলের জগ নামাল টেবিলে। বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, আমি ঢেলে ঢেলে দেব, মামাবাবু?

কল্পনা ভারিক্কি গলায় বলল, আমি এদিকটা দেখছি। তুমি যাও, ভাতটা ফুটে গেছে, নামিয়ে ফেলো।

পাজামা শার্ট পরা খয়াটে চেহারার লোকটা চলে যাচ্ছিল, ঘুরে এল আবার। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বার করে দিব্যজ্যোতির হাতে দিয়ে বলল, মাত্র পাঁচটা আছে। এনে দেব আর?

দু'-এক সেকেন্ড চোখ কুঁচকে ভাবল দিব্যজ্যোতি। তারপর বলল, নাহ্। রাতে আর তোকে বেরোতে হবে না। চালিয়ে নেব।

কল্পনা নিপুণ হাতে বোতলের ছিপি খুলে ফেলেছে, মেপে মেপে

ঢালছে গ্লাসে। আবার মুখ বন্ধ করতে করতে বলল, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, মামা।

দিব্যজ্যোতি ঠোঁটে সিগারেট চাপল, কী?

সুবর্ণলতায় এবার একটা ফোন নিলে হত না?

কী হবে ফোন দিয়ে? কলকাতায় কার সঙ্গে তুই গপপো করবি?

আমার দরকার নেই। তোমার জন্যই বলছি। খবরাখবর নিতে পারবে।

দুর পাগল, খবর নিতে তো আমি নিজেই চলে আসছি।

না, বাইরেও তো যাও। এই তো, পুজোর পর দিল্লি গেছিলে...

দু'-চার সপ্তাহ আমি খোঁজ না-নিলে সুবর্ণলতা মরে যাবে না রে ভাই!

তবু... কত কিছু বলার থাকে...

কিচ্ছু বলার নেই। ভাগ তো। জানিস না, আমি ফোন-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। নেহাত বাড়িতে একটা রাখতে হয় তাই... আমি মোবাইল পর্যন্ত নিইনি। হবে না ফোন। ফোট।

হ্যাট হ্যাট করছ কেন? কল্পনা চোখ পিটপিট করল, এবার কিন্তু যাওয়ার সময়ে মাল বেশি পাবে না, আগে থাকতে বলে রাখলাম। তোমার দু'খানা নকশি কাঁথার এখনও অর্ধেক দশা... পটও পাবে তুমি বড়জোর...

দুপুরে তো একবার কথা হল, না কী? এক কথা বারবার না বললে সুখ হয় না?

দিব্যজ্যোতির গলা হঠাৎই চড়ে গেছে। আহত মুখে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কল্পনা, তারপর বেরিয়ে গেল গাল ফুলিয়ে।

অনুপল বলে উঠল, হঠাৎ রেগে গেলেন কেন, দিব্যদা?

ধুত, কানের কাছে ট্যাকট্যাক ট্যাকট্যাক... ভাল্লাগে না। দিব্যজ্যোতি সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল। নিজের মনে বলল, শরীরেও আজ ঠিক জুত নেই...

কী হল?

কীরকম একটা অস্বস্তি... বোধহয় গ্যাসট্যাস... মাথাটাও কেমন করছে...

তা হলে আবার সিগারেট ধরালেন কেন?... মাঝে তো নেশাটা বেশ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রাখ তো, আমি ঠিক আছি। দিব্যজ্যোতি সোজা হয়ে বসল,— নে, গ্লাস তোল। লেট্‌স সেলিব্রেট দ্য ইভনিং।

একসঙ্গে তিনটে পানপাত্র উঠল শূন্যে, উল্লাস।

সাগ্নিক গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল, কাল তা হলে আমাদের কী কী প্রোগ্রাম?

সকালে মাছ ধরা। দুপুরে কুমোরপাড়া। দিব্যজ্যোতি বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢালল গলায়।— তোমরা ওদের হাতের কাজ ভাল করে দেখে নেবে। আমি জানি, দে আর গুড, যথেষ্ট সূক্ষ্মতাবোধ আছে। স্টিল, তোমরাই যখন ওয়ার্কশপটা চালাবে, তখন সামনাসামনি ওদের সঙ্গে আলোচনা খুব জরুরি।... বাই দ্য বাই, বলে রাখছি, ওয়ার্কশপটা হবে তিন দিনের। এবং এর জন্য তোমরা যৎকিঞ্চিৎ সম্মানদক্ষিণা পাবে।

টাকাপয়সা আবার আনছেন কেন দিব্যদা? আপনার একটা ভাল কাজে জয়েন করতে পারছি... প্লাস, তিন দিন চুটিয়ে হইহই করব...

বাকতাল্লা ছাড়ো। তারপর তো কলকাতায় গিয়ে খিস্তি মারবে, দিব্যদা ছাত্রদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাটিয়ে নিল! দিব্যজ্যোতি হা হা হেসে উঠল। চোখ টিপে বলল, ফোকটে করলে আন্তরিকতা থাকে না রে, আমি জানি।

অনুপল আর সাগ্নিকও হেসে ফেলেছে। অনুপল গ্লাসে আর একটু জল মেশাতে মেশাতে বলল, একটা ব্যাপার আমাদের কিন্তু খুব স্ট্রেঞ্জ লাগে, দিব্যদা। আপনি এখানে... এত জায়গা থাকতে এই সোনামাটিতে এসে প্রতিষ্ঠান খুললেন কেন?

মাথার ঝিমঝিম ভাবটা বাড়ছে কি? দিব্যজ্যোতি ঘাড় ঝাঁকিয়ে নিজেকে খানিকটা স্থিত করার চেষ্টা করল। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল, বলতে পারিস এটা একটা চান্স ফ্যাক্টর। সুবর্ণলতার প্রোজেক্টটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই গভর্নমেন্টের দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে ছিলাম। এখানে ঘুরছি, সেখানে ঘুরছি, একে ধরছি, তাকে ধরছি... সরকারি

লোকজন তো, কেউ গা-ই করে না। হঠাৎই উড়ো খবর পেলাম, হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে নাকি একটা এন জি ও-র জন্য খানিকটা জমি অ্যালট করা আছে, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত নেয়নি। ব্যস, আমার কপাল খুলে গেল।... প্রথমে এত ইন্টিরিয়ারে দেখে একটু মন খুঁতখুঁত ছিল। তারপর ভেবে দেখলাম, কলকাতা থেকে কী আর এমন দূর? বাগনান তো ট্রেনেই আসা যায়, সেখান থেকে বাসে মিনিট চল্লিশ। আর আমি তো যাতায়াত করব গাড়িতে, ম্যাক্সিমাম দু'ঘণ্টা। তা ছাড়া সত্যিকারের কাজ করতে হলে তো এরকম...

দিব্যজ্যোতি থেমে গেল আচমকা। তার কি কথা জড়িয়ে যাচ্ছে? জিভটা আলগা আলগা লাগে কেন? নেশা হয়ে গেল? প্রথম পেগ ফুরোনোর আগেই?

অসম্ভব। হতেই পারে না। ঢক করে গ্লাসের তরলটুকু গলায় ঢেলে দিল দিব্যজ্যোতি। চেয়ারে মাথা রেখে জোর করে কথা আনল গলায়, তোরা হয়তো বলবি, হঠাৎ মাথায় সুবর্ণলতার ভূত চাপলই বা কেন?... বহুকাল ধরেই একটা সংকটে ভুগছিলাম রে। ইনার ক্রাইসিস। মেন্টাল ক্রাইসিস। আত্মিক সংকট। খালি মনে হত, কী করছি? কী-ই করছি? এই যে জীবনটা পেয়েছি, এর মানে কী? উদ্দেশ্য কী? শুধু ছবি এঁকে আর কলেজে ক'টা ক্লাস নিয়ে লাইফটা কাটিয়ে দেওয়া? পয়সা আসছে এসব করে, কিন্তু মনের খিদেটা মিটছে কোথায়! ভেতরের সমস্ত এক্সপ্রেশনগুলো কোথায় যাচ্ছে? কারা কিনছে? দিব্যজ্যোতি সিংহ কি আস্তে আস্তে গোটা কতক মাথামোটা বড়লোকের বাড়ির দেওয়ালে শো পিস হয়ে যাচ্ছে না? আমি কি এটাই চেয়েছিলাম? টাকা কামাব, খাবদাব, বেড়াব, ফুর্তি করব...? বুকে একটা সাইরেন বাজত সারাক্ষণ। বিলিভ মি। কে যেন বলত, আর নয়, আর নয়, শুধু নিজের জন্য বাঁচা এবার থামাও দিব্যজ্যোতি। মানুষের জন্য বাঁচো। মানুষের জন্য করো কিছু। আমিও ভেবে দেখলাম...

নাহ্, জিভটা কিছুতেই আর বাগে থাকছে না, উলটেপালটে যাচ্ছে। আবার শিরায় সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে যাওয়ার অনুভূতি।

দিব্যজ্যোতি একটা হেঁচকি তুলল, অ্যাই, আমায় শসার প্লেটটা বাড়িয়ে দে তো।

সাগ্নিক সঙ্গে সঙ্গে ডিশ বাড়িয়ে ধরেছে। দিব্যজ্যোতি হাত রাখল প্লেটে। কিন্তু শসা তুলল না। তুলতে পারল না। খামচাচ্ছে শসাগুলোকে, আমার কীসের পিছুটান, বল? বউ ভেগে গেছে। নো ছেলেপুলে। আছে শুধু মা, সেও থাকে নিজের মেজাজে। আমি আর কেন টাকার পেছনে ছুটব? তখনই দিদিমার কথা মনে পড়ল। দিদিমা খুব বলত, আমাদের দেশের মেয়েরা বড় অসহায় রে, পারলে তাদের জন্য কিছু করিস। ওখান থেকেই সুবর্ণলতার আইডিয়াটা মাথায় এল। ভাবলাম, যদি কিছু করার স্বপ্ন দেখতেই হয়, বড় মাপের স্বপ্নই দেখি। শুধু মেয়েরা কেন, গাঁয়ের আর পাঁচটা গরিব মানুষদের নিয়ে... কামার, কুমোর, তাঁতি... সব্বাইকে নিয়ে এখানে একটা শিল্পগ্রাম...

দিব্যজ্যোতির ঘাড় ঝুপ করে হেলে গেল। জিভ আর নড়াচড়া করছে না। পেচ্ছাপ পাচ্ছে হঠাৎ, অথচ ওঠার ক্ষমতা নেই। যাহ্, বেরিয়েই গেল।

প্রাণপণ চেষ্টায় চোখের পাতা দুটো ঈষৎ ফাঁক করতে পারল দিব্যজ্যোতি। অনুপল আর সাগ্নিককে খুঁজছে। মুখ দুটো একদম সামনে এগিয়ে এসেছে যেন। কিন্তু অসম্ভব ঝাপসা। কেউ কি হাত রাখল গায়ে? ডাকছে কি কেউ?

অস্পষ্ট মুখ দুটো মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ফুটে উঠল এক অসীম ক্যানভাস। তুলির টান পড়ছে ক্যানভাসে। ভারমিলিয়ান রেড, গ্যাম্পোজ ইয়েলো, ক্যাডমিয়াম অরেঞ্জ, ক্রিমসন, স্কারলেট, পার্পল, মভ, আলট্রামেরিন ইন্ডিগো...!

বর্ণময় ক্যানভাসে সূর্যাস্ত হচ্ছে আবার। ধীরে ধীরে অন্ধকার। সব অন্ধকার।

দুই

কী হল পৃথাদি, দৌড়োচ্ছ কেন? মুখেচোখে একটু জলও তো ছেটালে না!

সময় নেই রে। আমার ময়নারানি আজ ডুব মেরেছেন। টুকুসের স্কুল বাস চলে এলে কেলেঙ্কারি হবে।

ক'টায় আসে বাস?

সাড়ে চারটে... চারটে পঁয়ত্রিশ...। কবজিতে চোখ ফেলে পৃথা ফের ছটফট করে উঠল, লাস্ট বেলটা যে কেন আজ দেরিতে পড়ল!

বলতে বলতে পৃথা ঝড়ের গতিতে স্টাফরুমের বাইরে। প্রায় লাফাতে লাফাতে রাস্তায়। উফ্, শুক্রবারের সেভেনথ পিরিয়ডটা যেন এক বিভীষিকা। টিফিনের আগে পরপর তিনটে ক্লাস, টিফিনের পর আবার তিনটে, শেষ পিরিয়ডে আর শরীর চলে? তাও বাংলা-ইংরেজি-ইতিহাস-ভূগোল হলে একটা কথা ছিল। চেয়ারে বসে খানিক বকবক করে চল্লিশটা মিনিট তবু কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু অঙ্ক বড় কঠিন ঠাঁই। সেই চক হাতে উঠে দাঁড়াতেই হবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করতেই হবে, সঙ্গে গলার অনন্ত ব্যায়াম। নতুন হেডমিস্ট্রেসের আক্কেলেরও বলিহারি, পৃথার এই শেষ ক্লাসটা এবার বেছে বেছে কিনা ইলেভেনকেই দিতে হল? ধাড়ি ধাড়ি মেয়েগুলো পর্যন্ত এই শেষবেলায় ক্লান্তিতে ঢুলতে থাকে, গজাল মেরে মেরে তাদের মাথায় এখন বাইনোমিয়াল থিয়োরেম ঢোকানো যে কী পরিশ্রমের কাজ! নাহ্, অমিতাদির প্র্যাকটিকাল সেন্স একেবারে জিরো।

সরু গলি পেরিয়ে, স্টেট ব্যাঙ্কটা টপকে, পৃথা হাঁপাতে হাঁপাতে বাস স্টপে এল। কপাল ভাল, দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই আজ সন্তোষপুর মিনি। যথারীতি বসার জায়গা নেই, দাঁড়িয়েছে ড্রাইভারের পিছনটায়। ঘড়ি দেখে এবার স্বস্তি পেল একটু। চারটে চোদ্দো। যাদবপুর মোড়ে জ্যামে না-আটকালে মনে হয় ঠিকঠাক পৌঁছে যাবে।

ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করল পৃথা। রুমালটাও।

কনডাক্টরকে টাকাটা এগিয়ে দিয়ে রুমালে মুখ মুছছে। ফাল্গুনের গোড়াতেই বেশ গরম পড়ে গেল, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ঝলসাবে নির্ঘাত। কণাদ বলছিল, এবার শোওয়ার ঘরে একটা এ.সি লাগাবে। কিনে ফেলতে পারলে মন্দ হয় না। জীবনে অনেক সুখই তো পেল পৃথা, এখন নয় একটু আরাম করুক!

মিনিবাস থেমে থেমে এগোচ্ছে। যাদবপুর থানা পেরোল। চারটে বাইশ। পৃথার টেনশনটা ফিরছিল আবার। টুকুসদের স্কুল বাস দু'-চার মিনিট দেরিও তো করতে পারে। করেও তো। পরশুই তো প্রায় পৌনে পাঁচটায় এল। আজ যদি তাড়াতাড়ি নামিয়েও দিয়ে যায়... একদিন কি আর টুকুস একা একা ফিরতে পারবে না? গেছেও তো দু'-চারবার। ময়নার কামাই তো আর নতুন কিছু নয়। তবু... ভয় লাগে পৃথার। যা রিকশা চলে রাস্তায়, আর টুকুসটাও যা ভেবলুর মতো হাঁ করে হাঁটে! কিছু একটা দেখল, তো ওমনি দাঁড়িয়ে গেল! গাড়ি রিকশা কিছুই তো বাবু খেয়াল করে না।.. মেন রোডের ওপর ফ্ল্যাট কিনলে কি ভাল হত? স্কুল বাস নামিয়ে দিত দরজায়!... ধ্যাত, বড় রাস্তা মানে তো আরও বেশি বিপন্নতা। হুট করে বাইরে বেরিয়ে গেলেই সামনে বাস লরি ট্যাক্সি অটো...! তার চেয়ে বাবা এটাই ঠিক আছে। মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে হয় বটে, কিন্তু হট্টগোল নেই, ঝামেলা নেই, পাড়াটাও বেশ নিরিবিলি...

ব্যাগে কি মোবাইল বাজছে? পৃথা সচকিত হল। হ্যাঁ, তারই তো সুরঝংকার। স্কুল থেকে বেরোনোর সময়ে কি অন করেছিল ফোনটা? নাকি টিফিনে কণাদের সঙ্গে কথা বলার পর আর অফ করা হয়নি?

ব্যাগ খুলে খুদে দূরভাষ যন্ত্রটিকে হাতে নিল পৃথা। ঝলক দেখল নাম্বারটা। ল্যান্ডলাইন। অচেনা। কে?

পৃথা কানে ফোন চাপল, হ্যালো?

ওপারে এক মহিলাকণ্ঠ। কিন্তু শোনা যাচ্ছে না স্পষ্ট। শব্দগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে। বার কয়েক হ্যালো হ্যালো করে পৃথা হাল ছেড়ে দিল। সামান্য গলা উঠিয়ে বলল, আমি বাসে আছি। খুব ডিসটার্বেন্স হচ্ছে, আপনি আধ ঘণ্টা পরে করুন।

মোবাইল ব্যাগে রাখার আগে আর একবার নম্বরটা পড়ল পৃথা। উহুঁ, চেনা নয়। ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের মেয়েগুলো নয় তো? সারাক্ষণ যারা লোন গছানোর জন্য মুখিয়ে থাকে? নাকি রং নাম্বার?

সুকান্ত সেতুতে উঠে বাস গতি বাড়িয়েছে। পৃথা সামনের রডটাকে চেপে ধরল শক্ত করে। দুপুর থেকেই কোমরের ব্যাথাটা শুরু হয়েছিল, এখন বাড়ছে ক্রমশ। ঝনঝন করছে। কোমরের আর দোষ কী, সারাদিন খাড়া দাঁড়িয়ে ক্লাস নেওয়া...! বয়সও তো হচ্ছে! নয় নয় করেও চুয়াল্লিশে পৌঁছোল। এইসব ব্যথাট্যাথা উপসর্গগুলো এখন ভোগাতেই থাকবে। স্কুলে শিপ্রাদি সেদিন ক্যালসিয়াম খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিল। হাড়গোড়গুলো নাকি মজবুত থাকে। তার আগে একবার ডাক্তার দেখিয়ে নিলে হয়। কিন্তু সময় কোথায়? সময় কোথায়? এই তো, দিনভর স্কুল, সংসার, বর, ছেলে... যাকে বলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দশা।

ছেলের কথা মাথায় ফিরতেই আবার উদ্‌বেগ। টুকুস যদি ফ্ল্যাটে পৌঁছেও যায়, ঢুকতে তো পারবে না! বুদ্ধি করে দোতলায় শীলাদের ফ্ল্যাটে চলে যেতে পারে। শীলাকে বলাও আছে। কিন্তু টুকুস কি যাবে? আগের দিন তো সিঁড়িতেই ঘাড় ঝুলিয়ে চুপটি করে বসে ছিল টুকুস। কলিংবেলে হাত যায় না, দরজা ধাক্কা দিয়েছিল, শীলারা নাকি শুনতে পায়নি! বেচারা। কবে যে লম্বা হবে!

বাস থেকে নেমে অবশ্য ভাবনা উৎকণ্ঠার ত্বরিত অবসান। পৃথা মোড় থেকেই দেখতে পেল টুকুস আগে আগে হাঁটছে। হেলেদুলে। এবং মোটেই রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে নয়, মোটামুটি ধার ঘেঁষে।

বড় বড় পা ফেলে পৃথা ধরল ছেলেকে, কী রে, এই নামলি বুঝি?

মাকে দেখে খুশি হল কি টুকুস? বোঝা গেল না। সাড়ে আট বছরের ছেলে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, নাহ্। অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ মানে কতক্ষণ?

হবে ফাইভ মিনিটস।

পাঁচ মিনিটে মাত্র এইটুকু এলি?

তুমি তো বলো, রাস্তা দিয়ে ধীরেসুস্থে হাঁটবি!

ছেলের বাচনভঙ্গিতে এবার হেসে ফেলল পৃথা। তারপর শুরু হয়েছে তার একের পর এক জেরা। টুকুস আজ স্কুলে কী করল, টিফিন ঠিকঠাক খেয়েছে কিনা, কারও সঙ্গে মারপিট করেনি তো, কী কী হোমওয়ার্ক আছে...। টুকুসের এইসব রোজকার খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ না জানলে পৃথার যেন তৃপ্তি হয় না। ছেলে ছেলে করাটা তার প্রায় বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। একটু বেশি বয়সের সন্তান বলে কি? হবেও বা।

কথায় কথায় বাড়ি এসে গেছে। তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল পৃথা। ছেলেকে ইউনিফর্ম ছাড়াল, ঘষামাজা করল, নিজেও মুখ হাত ধুয়ে তরতাজা হয়ে নিল খানিকটা। তারপর ঢুকেছে রান্নাঘরে। নুডলস সেদ্ধ বসিয়ে ফ্রিজ খুলে দুধ বার করছে। এই এক ঝঞ্ঝাট, টুকুসকে দুধ খাওয়াতে এখন প্রাণ বেরোবে। ভাবতে ভাবতে রাতের রান্নাটাও ছকে ফেলল মনে মনে। ডিমের ডালনা তো করাই আছে, সঙ্গে ডাল আর একটা ভাজা করে নিলেই যথেষ্ট। কর্তাদের খাওয়ার কোনও প্যাখনা নেই, যা থাকে তাই সোনামুখ করে খেয়ে নেয়।

আবার মোবাইলে ঝংকার। ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসে। গ্যাসের আঁচ কমিয়ে পৃথা এগোচ্ছিল, তার আগেই টুকুস তুলে নিয়ে টিপেছে বোতাম। একটা দুটো কথা বলে পৃথাকে দিয়ে গেল ফোন, একটা দিদা।

কে দিদী? কোন দিদা?

জানি না। নাম বলেনি।

গ্লাসে টুকুসের দুধ ঢালতে ঢালতে বাক্যালাপ শুরু করেছিল পৃথা, ওপারের মহিলাটির পরিচয় জানামাত্র প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে গেছে।

দিব্যর মা!

গলা কাঁপছে দিব্যর মা'র, তোমাকে আমি খানিক আগেও একবার ফোন করেছিলাম।

কী করে যে স্বর স্বাভাবিক রাখল, পৃথা নিজেও জানে না। রাগ বিস্ময় বিরক্তি, কিছুই না-ফুটিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি তখন স্কুল থেকে ফিরছিলাম।... কেমন আছেন?

ওই একরকম। এই বয়সে আর থাকা না-থাকা। তুমি কেমন আছ?

ভাল। বলেই পৃথার মুহূর্তের জন্য মনে হল, দিব্যর মা'র কুশলপ্রশ্নটা একেবারেই অর্থহীন। নিশ্চয়ই উনি আশা করেননি, তাঁর প্রাক্তন পুত্রবধূ বলবে সে এখন ভাল নেই? গলা শান্ত রেখেই জিজ্ঞেস করল, আপনি আমার নাম্বার পেলেন কোত্থেকে?

তোমার মাকে আজ ফোন করেছিলাম।

ও।... হঠাৎ...?

তুমি হয়তো শুনেছ, দিব্য খুব অসুস্থ?

খবরটা পৃথার স্নায়ুতে কোনও আলোড়ন তুলল না। সহজভাবেই বলল, না, জানতাম না। কী হয়েছে?

সেরিব্রাল অ্যাটাক। হেমারেজ হয়নি, তবে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে ব্রেনের অনেকগুলো সেল ড্যামেজ হয়েছে। অবস্থা এখনও খুব ভাল নয়। দিব্যর মা একটুক্ষণ থেমে রইলেন, যেন অপেক্ষা করলেন পৃথার প্রতিক্রিয়ার। পৃথা নিশ্চুপ দেখে ফের তাঁর কণ্ঠ ফুটেছে, কাল বেস্পতিবারের আগের বেস্পতিবার দিব্য সোনামাটি গিয়েছিল। ওখানে যে আশ্রম খুলেছে, সেখানেই... সন্ধেবেলা হঠাৎই...। সঙ্গে দুই ছাত্র ছিল। আর কল্পনা, কল্পনার বর। তারা সব্বাই মিলে ধরাধরি করে আগে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, পরদিনই কলকাতায় এনে গ্রিন ভিউতে ভরতি করেছে। ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে সবে কাল বেডে দিল।

পৃথা অস্ফুটে বলল, ও।

ডান দিকটায় এখনও তেমন সাড় নেই। কথাও চলে গিয়েছিল, এখন বলছে একটু একটু। তাও জড়িয়ে জড়িয়ে।

পৃথা আবারও বলল, ও।

কাল তোমার খুব নাম করছিল। দিব্যর মা গলার ধরাধরা ভাবটাকে সামলালেন, হাত-মুখ নেড়ে জানতে চাইছিল তুমি খবরটা পেয়েছ কিনা।

এ সংবাদেও পৃথা তেমন উদ্‌বেলিত হল না। তবে শরীর শক্ত হয়ে গেছে সহসা। এসব সমাচার তাকে শোনানোর কী অর্থ? দিব্যজ্যোতির সম্পর্কে পৃথার কণামাত্র আগ্রহ নেই, থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়,

থাকা উচিতও নয়। এগারো বছর আগে যার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলেছিল পৃথা, কিংবা বলা যায় ছিঁড়তে বাধ্য হয়েছিল, আজ সে বেঁচে রইল, না মরে গেল, তাতে পৃথার কী যায় আসে?

... কিন্তু সত্যিই কি দিব্য তার নাম করছে? এও কি দিব্যর অভিনয়?... কিন্তু ওরকম অসুস্থ অবস্থায় কোনও পাষণ্ডও কি অভিনয় করতে পারে? অবশ্য পাষণ্ড বললেও দিব্যজ্যোতি সিংহকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়। দিব্যজ্যোতির মতো পাপাচারী পৃথা জীবনে আর একটাও দেখেনি।

পৃথার নীরবতায় দিব্যর মা কি কোনও আশ্বাস খুঁজে পেলেন? গলা উঠেছে সামান্য, তোমায় একটা অনুরোধ করব পৃথা। রাখবে?

বলুন?

তোমাকে বলার আমার মুখ নেই। অনুরোধ করা উচিতও নয়। তুমি বিয়ে-থা করে শান্তিতে ঘর-সংসার করছ। তবু... যদি একবার আসো... দিব্যর সামনে একবার দাঁড়াও...

আমিই-ই। পৃথার গলা বিস্ময়ে চড়ে গেল। এতটাই উচ্চগ্রামে, যে টুকুস পর্যন্ত ছুটে এসেছে টিভি ছেড়ে। চোখ পিটপিট করে দেখছে মাকে। তাড়াতাড়ি তার হাতে দুধের গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে পৃথা স্বর নামাল, আমি গিয়ে কী করব?

তা নয়... আসলে দিব্য বোধহয় তোমায় একবার দেখতে চাইছে... এখনও তো জীবনসংশয়টা রয়ে গেছে... কী হবে কিছু বলা যাচ্ছে না...

দিব্যর মা এবার স্পষ্টতই ভেঙে পড়েছেন। নাক টানছেন জোরে জোরে। একেই বুঝি বলে পুত্রস্নেহ! দুর্যোধনের উরুভঙ্গে গান্ধারীও কি ভেঙে পড়েনি!

পৃথা স্বর অচঞ্চল রাখল, দেখি।

মোবাইল অফ করে পৃথা ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। এ কী আজব আবদার রে বাবা? যদি-বা সত্যিই দিব্য এখন পৃথা পৃথা করে, তো পৃথার কী? মরণকালে তার হরিনামের সাধ জেগেছে বলে পৃথাকে গিয়ে খঞ্জনি বাজাতে হবে? নিশ্চয়ই দিব্যর চেলা-চামুণ্ডারা নার্সিংহোমে মজুত আছে, তাদের কাছে মশলাদার খোরাক হতে যাবে পৃথা! অসম্ভব।

এক সময়ে অনেক নির্বুদ্ধিতা হয়েছে, এই বয়সে আর নতুন করে বোকা সাজার কোনও মানে হয় না।

দিব্যর মা'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নুডলসের দফারফা। গলে প্রায় পাঁক। তাড়াতাড়ি ছানচা দিয়ে ছেঁকে তুলে নুডলগুলো স্টিলের ট্রে-তে ছড়ানোর চেষ্টা করল পৃথা। হচ্ছে না, জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই মণ্ড দিয়ে চাউমিন বানালে কে গিলবে? টুকুস না কণাদ?

চড়াং করে মাথা গরম হয়ে গেল পৃথার। রাগটা গিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে নিজের মা'র ওপর।

হ্যালো, মা? তোমার সেন্সটা কবে হবে বলো তো?

কেন রে? কী করলাম?

দুম করে দিব্যর মাকে আমার নাম্বার দিয়ে দিলে! একবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলে না?

না, শোন খুকু... ব্যাপারটা হয়েছে কী...

আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। যদি বা দিলে... সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

তুই তখন স্কুলে, তাই তোকে বিরক্ত করিনি। রাত্তিরেই তোকে ফোন করতাম।... মীরাদি এমনভাবে বলছিলেন, মুখের ওপর না করে দেব? কী বলব? মেয়ের ফোন নাম্বার আমি জানি না?... তা ছাড়া তোর আর দিব্যর মধ্যে যাই হোক, আমার সঙ্গে মীরাদির তো কখনও অসদ্ভাব হয়নি!

উফ্, তুমি এমন এক একটা অকোয়ার্ড সিচুয়েশনে ফেলো না মা! জানো, কেন ফোন নাম্বার চেয়েছিলেন?

না-জানার কী আছে! গৌরীর স্বরে খুব একটা তাপ-উত্তাপ নেই, তোকে একবার নার্সিংহোমে যেতে বলেছে, তাই তো?

ও, তুমি জানো। পৃথা থ, তার পরেও তুমি... হরিবল্! তোমার কি বলে দেওয়া উচিত ছিল না, পৃথাকে আর এসবের মধ্যে টানাটানি করবেন না?

ব্যাপকতামি করিস না, খুকু। মীরাদি কী এমন অন্যায় কথা বলেছেন?

একটা মরোমরো মানুষকে দু'মিনিটের জন্য দেখতে গেলে তোর গায়ে কী এমন ফোসকা পড়বে?

হুঁহ্, মানুষ না আরও কিছু।

সে তুমি যা খুশি বলতে পারো। তবে একটা কথা তো অস্বীকার করতে পারবে না, সে এক সময়ে তোমার স্বামী ছিল। তার সঙ্গে নয় নয় করেও দশ বছর ঘর করেছ। তোমার সঙ্গে ডিভোর্সের পর সে আর বিয়েও করেনি। একটা একা মানুষ...। গৌরী যেন আরও কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন, যাক গে, তোমার ইচ্ছে হলে যাবে, না হলে যাবে না। আমার ওপর মেজাজ দেখানোর তো কোনও কারণ দেখি না।

বলেই গৌরী ফোন রেখে দিয়েছেন। উপযুক্ত কোনও জবাব দেওয়ার সুযোগ না পেয়ে অসহায় ক্ষোভে ছটফট করতে থাকল পৃথা। মা-টা যে কী! কণাদের সঙ্গে তার বিয়েটা ভালভাবে মেনে নিয়েছে বটে, টুকুসের ওপরেও খুব টান, তবে দিব্যজ্যোতির প্রতি মায়া এখনও ঘুচল না। মেয়ের মুখ থেকে জামাইয়ের অনাচারের অনুপুঙ্খ কাহিনি শোনা সত্ত্বেও। দিব্যজ্যোতির সাফাইগুলোকেই এখনও মা বিশ্বাস করে বসে আছে। বিবাহবিচ্ছেদের পর কোনও পুরুষ আর বিয়ে না-করলে সে একেবারে নিষ্কলুষ! হয় তাকে দুঃখী মানুষ ভাবা হবে, নয়তো সাধুসন্ত গোছের কিছু একটা। কী যে সব প্রিমিটিভ ধারণা!

পৃথা পায়ে পায়ে সোফায় এসে বসল। মেঝেয় পা ছড়িয়ে কার্টুন চ্যানেল দেখছে টুকুস, টিভির একদম সামনেটায় গিয়ে। অত কাছ থেকে টিভি দেখার জন্য অন্য দিন ছেলেকে বকে পৃথা, এখন কিছুই বলল না। টুকুসের দুধের গ্লাস প্রায় ভরতিই পড়ে, সেদিকে নজরই গেল না যেন। গাঁক গাঁক করে টম অ্যান্ড জেরি চলছে পরদায়, ইঁদুর-বেড়াল খেলার উচ্চকিত ধ্বনিতে অন্য সময়ে কানে তালা লেগে যায়, আজ যেন শুনতেই পাচ্ছে না। বাক্ দৃষ্টি শ্রবণের ইন্দ্রিয়গুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। অথবা অসাড়।

আপন মনে দু'দিকে মাথা নাড়ল পৃথা। কী মানুষ! ভাবমূর্তি নির্মাণের কী অসীম ক্ষমতা!

দিব্যজ্যোতির সঙ্গে তার সম্পর্কটা তখন শেষ পর্যায়ে। সে তখন মনস্থির করেই ফেলেছে, পচে যাওয়া সুতোটাকে এবার ছিঁড়েই ফেলবে, চলে এসেছে বাপের বাড়ি, মা'র কাছে উগরে দিয়েছে মাসতুতো বোনদের সঙ্গে দিব্যজ্যোতির অবৈধ কামকেলির উপাখ্যান...। দু'-চার দিন পর হঠাৎ এক সন্ধেবেলা দিব্যজ্যোতি এসে উপস্থিত।

বাবা সেদিন বাড়ি ছিল না। মা'র তো কোনও কালেই স্থানকালপাত্র জ্ঞান নেই, পৃথার সামনেই হাউমাউ করে উঠল, এসব কী শুনছি, দিব্য? তুমি নাকি রুনি ঝুনির সঙ্গে...?

দিব্যজ্যোতি পলকে পাংশু। একটুক্ষণ সময় নিয়ে বলল, দেখুন মা, আপনাকে কয়েকটা কথা বলি। পৃথা সত্যি বলছে, কি মিথ্যে বলছে, সে প্রসঙ্গে আমি যাবই না। তবে পরিস্থিতিটা তো বুঝতে পারছেন, আমার আর পৃথার সম্পর্কটা তলানিতে এসে ঠেকেছে। পৃথা আমায় আর সহ্যই করতে পারছে না। আমি দাবি করব না, আমি ধোওয়া তুলসীপাতা। নিশ্চয়ই আমার অনেক দোষ আছে। খামতি আছে। নইলে এক সময়ে আমায় ভালবেসে বিয়ে করেও পৃথা আজ সরে যেতে চায় কেন?... তবে এই যে বদনামগুলো পৃথা ছড়াচ্ছে... আমি পুরুষমানুষ, তায় আঁকাজোকা করি... উচ্ছৃঙ্খল বলে আমাদের খানিকটা দুর্নামও আছে। সুতরাং আমার গায়ে কেউ কালি ছিটোলে কিছু যায় আসে না। ঝেড়ে ফেলব।... কিন্তু রুনি ঝুনির কথা ভাবুন। তারা তাদের মতো করে লাইফে সেট্‌ল্ করছে... এখন এইসব কলঙ্ক যদি রটে, তাদের কত ক্ষতি হতে পারে বলুন তো?

কী নিপুণ বাক্যজাল বিছিয়ে অর্ধসত্যের আবরণে নিজেকে আড়াল করে ফেলল দিব্যজ্যোতি। মা মোটেই বোকা হাবা নয়, তবু এমন ধরনের কথার ফাঁদে আচ্ছা ঘাঘু লোকও তো বেকুব বনে যায়। আমতা আমতা করে মা বলল, কিন্তু খুকু যে... নিজের চোখে...?

থাক না মা ওসব কথা। চোখ কতটুকু দেখে? দেখে তো মানুষের মন। আপনার মেয়ের মন যদি বলে আমি চরিত্রহীন, সে-ধারণা তো আমি বদলাতে পারব না। তার চেয়ে বরং কোনও সিন ক্রিয়েট না-করে

আলাদা হয়ে যাওয়াই তো ভাল। বিশ্বাস করুন, আমি পৃথার শত্রু নই। আমি চাই, পৃথা পৃথার মতো করে সুখী হোক।

তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রস্থান।

দৃশ্যটা মনে পড়লেই পৃথার গা যেন রি-রি করে ওঠে। প্রায় বারো বছর পরেও।

কেউ কি ভাবতে পারবে, কী কুৎসিত চেহারায় মানুষটাকে দেখেছে পৃথা? দিনের পর দিন? মাসের পর মাস? একটা দিনের স্মৃতি তো পচা ঘায়ের মতো দগদগ করছে।

তখন সবে চাকরিতে জয়েন করেছে পৃথা। সেদিন কী কারণে যেন ছুটি হয়ে গেল স্কুল, দুপুর দুপুর পৃথা বাড়ি ফিরে এসেছিল। দিব্যর মা অফিসে, দিব্য কলেজে, বাড়ি ফাঁকা থাকারই কথা। নিজের চাবিতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে থমকে গেল পৃথা। দিব্যর স্টুডিয়োয় কার গলা শোনা যাচ্ছে না? নারীকণ্ঠ!

নিছকই কৌতূহলের বশে স্টুডিয়োর দরজায় গিয়ে পৃথার পা গেঁথে গেছে মাটিতে। চোখের পলক পড়ছে না। ডিভানে যে ত্রিমাত্রিক ছবিটা দেখছে, তা কি সত্যি?

রুনি ডিভানে শায়িত! দিব্যর ছোটমাসির বড় মেয়ে রুনি! গাইঘাটা থেকে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে আসা রুনি! ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলনিবাসিনী রুনি!... রুনির বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে দিব্য! দু'জনের কারও অঙ্গে এক কণা সুতোও নেই!

রুনি চোখ বুজে কী যেন প্রলাপ বকে চলেছে একটানা। দিব্যর হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে রুনির নগ্ন দেহে। হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠছে রুনি, পরক্ষণে হাসছে খিলখিল।

দৃশ্যটায় একটা তীব্র মাদকতা ছিল। আবার প্রচণ্ড উত্তাপও। পৃথার চোখ দুটো যেন ঝলসে গেল। প্রায় টলতে টলতে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। স্টুডিয়ো থেকে ভেসে আসা হাসি আর উল্লাসধ্বনি, মাঝে মাঝে যৌনগন্ধী আওয়াজ, তার কানকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল।

চৈত্রের প্রখর দুপুরে, দরজা-জানালা বন্ধ আধো অন্ধকার ঘরে

কতক্ষণ নিঃসাড়ে পড়ে ছিল পৃথা? পৃথা জানে না। শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছিল, রুনি বাথরুমে গেল, বেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে, চায়ের জল চড়াচ্ছে। দিব্য কি তখনই ঢুকেছিল শোওয়ার ঘরে? নাকি আর একটু পর? বিছানায় পৃথাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে, আরে, তুমি কখন এলে?

কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না পৃথার। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, অনেকক্ষণ।

হঠাৎ? দুপুরবেলায়?

এবার ঝাঁঝ এসে গেল গলায়, বোধহয় তোমাদের লীলাখেলা দেখাটা আমার কপালে ছিল, তাই।

আশ্চর্য, দিব্যর কোনও ভাবান্তর নেই। নাকি ছিল? অতিমানবিক ক্ষমতায় মনের ভাব গোপন রাখতে পেরেছিল দিব্য? ড্রয়ার থেকে নতুন সিগারেটের প্যাকেট বার করল একটা। সেলোফেনের মোড়ক ছাড়াতে ছাড়াতে পৃথার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সহজ স্বরে বলল, ইমোশনের মাথায় এরকম হয়েই যায়। এগুলোকে বেশি পাত্তা দিতে নেই। স্টুডিয়োর দরজাটা তোমার ভেজিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

দিব্যর সুললিত বাক্যরাজির মাঝে কখন বুঝি দরজায় রুনি। তাকে দেখে দিব্য বলে উঠল, কী রে, তুই অমন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

আআআমি... যাই দিব্যদা।

তাড়া কীসের? বোস না। তোর বউদিকেও এক কাপ চা দিস।

এর পরেও আরও আট আটটা বছর এই মানুষটার সঙ্গে বাস করেছিল পৃথা! কী করে যে ছিল? কেন ছিল? এখন ভাবতে গেলে পৃথা কোনও উত্তরই খুঁজে পায় না। কণাদ টেনে বার না-করলে সে বুঝি অনন্তকাল থেকে যেত চেতলার ওই বাড়িটায়। কত কী যে নিঃশব্দে সহ্য করে গেছে। কত কিছু জেনেও প্রতিবাদ করেনি। রুনি, রুনির পরে ঝুনি...। ছাত্রীটাত্রিদের সঙ্গেও কি আর ফস্টিনস্টি চলত না? পারমিতা বলে মেয়েটা, যে দিব্যকে দেখলে গলে গলে পড়ত, তাকেও কি দিব্য ছেড়ে কথা বলেছে? তবু পৃথা পড়ে ছিল কোন কুহক মায়ায়? কীসের আশায়?

শরীরের টানও তো ছিল না। চৈত্রের সেই দুপুরের পর থেকে দিব্যজ্যোতি বিছানায় এলে কেমন যেন সিঁটিয়ে যেত পৃথা, আপনাআপনি কাঠ হয়ে যেত শরীর। তা হলে?

টিভিতে ইঁদুর-বেড়ালের কাহিনি শেষ। টুকুস এসে ঠেলছে পৃথাকে, মা? ও মা?

পৃথা সন্তোষপুরের ফ্ল্যাটে ফিরল, কী?

আমার সাম্‌সগুলো নিয়ে আসব?

তোমার দুধ শেষ হয়েছে?

কখন। গ্লাসটা দ্যাখো।

পৃথার ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ফুটে উঠল। টুকুসটা ঠিক বুঝেছে মা'র একটা কিছু হয়েছে, মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে মা'র। দু'হাত ছড়িয়ে পৃথা ডাকল, আয়, কাছে আয়।

টুকুস লজ্জা লজ্জা মুখে গা মোচড়াল, কেন?

আমার সোনা বাচ্চাটাকে একটু আদর করি।

ছেলেকে খানিক চটকে অঙ্কের খাতা-বই আনতে বলল পৃথা। ইস, টুকুসটার তো বিকেলে দুধ ছাড়া কিছু খাওয়া হল না, নিজেরও পেট চুঁইচুঁই করছে, সেই কখন দু'খানা রুটি খেয়েছিল, উঠে চিঁড়েটিড়ে কিছু ভাজবে নাকি? কিংবা টোস্ট ওমলেট? টুকুস ওমলেট দেখলে নাক সিঁটকোয়, ওকে পোচ করে দেওয়া যেতে পারে। দিব্যরও ডিমের পোচ ভীষণ প্রিয় ছিল। হঠাৎ দিব্যজ্যোতির সেরিব্রাল হল কেন? প্রেশারটেশারে ধরেছিল নাকি? মদের মাত্রা কি খুব বাড়িয়েছিল ইদানীং? সোনামাটি গিয়ে কি দেদার বেলেল্লাপনা করত? সোনামাটিতে দিব্যর কাজকর্ম নিয়ে বছর দুয়েক আগে বেশ একটা বড়সড় আর্টিকেল বেরিয়েছিল কাগজে। মেয়েদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প গড়েছে দিব্য, ওইসব মেয়েদের নিয়ে কি সোনামাটিতে ফুর্তিফার্তা করত? দিব্যজ্যোতি সিংহর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো শহরের মেয়েতে অরুচি ধরেছিল, মুখবদলের জন্য গ্রামে ছুটছিল তাই!

কিন্তু পৃথাকে দেখার সাধ জাগল কেন? কণাদকে ফোনে জানাবে

খবরটা? কী প্রতিক্রিয়া হবে কণাদের? দিব্যর জেগে ওঠা নতুন বাসনাটায় নিশ্চয়ই খুব আহ্লাদিত হবে না?

তবু বলতে তো হবে। বলা উচিত।

পৃথা হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা তুলল সেন্টার টেবিল থেকে। কী ভেবে রেখেও দিল।

তিন

তোয়ালেতে মাথা মুছছিল কণাদ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিনই তার একবার স্নান করা চাই-ই চাই। পৃথা হাসিঠাট্টা করে মাঝে মাঝে। বলে, বাতিক। তবু অভ্যেসটা কণাদ বদলাতে পারেনি। চায়ওনি বদলাতে। এই স্নানটুকুতে যে স্বস্তিটা মেলে, তাতেই বুঝি একটা ইট-কাঠ-সিমেন্ট-ইস্পাতের খাঁচা পরিপূর্ণ গৃহ হয়ে ওঠে। নিজস্ব ঘরে ফেরার অনুভূতি জাগে যেন।

লাগোয়া ছোট্ট ব্যালকনিতে ভিজে তোয়ালে মেলে দিয়ে কণাদ শোওয়ার ঘরে এল। হালকা একখানা হাফপাঞ্জাবি চড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে ঘাড় হেলিয়ে দেখল, পৃথা টেবিলে খাবারদাবার সাজিয়ে ফেলেছে।

কণাদ গলা তুলল, আজ রুটি, না ভাত?

পৃথার উত্তর উড়ে এল, রুটির ঝামেলায় কে যাবে, ভাতই করছি।

গুড। আমার মনটাও আজ ভাত ভাত করছিল। ক'দিন ধরে চোরা অম্বল হচ্ছে...

নিশ্চয়ই অফিসে উলটোপালটা খাচ্ছ?

না দিদিমণি। আমাদের সংবাদপত্রের অফিসে তো শুধু মুড়ি চলে। নারকোল আর কাঁচালঙ্কা সহযোগে। মজা করার সুরে বলল কণাদ, আজ অবশ্য দুটো শিঙাড়া খেয়ে ফেলেছি।

তা হলে আর অম্বলের দোষ কী!

হুম। চিরুনি রেখে কণাদ ডাইনিং টেবিলে এসে বলল। এই ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে টুকুস স্বেচ্ছায় আলাদা ঘরে শুচ্ছে। ঘরখানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কণাদ আলগাভাবে বলল, সাহেব ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

আর কতক্ষণ জেগে থাকবে? সওয়া এগারোটা তো বাজে।

আজ একটু দেরি হয়ে গেল, না? সানডের কভার স্টোরির ইলাস্ট্রেশনটা শেখরবাবুর পছন্দ হল না, আবার পুরোটা বদলানো...

পৃথা প্লেটে ভাত দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল, দ্যাখো, আর দেব?

লাগলে নিয়ে নেব। তুমি শুরু করো না।

মাথা নামিয়ে খাওয়ায় মন দিল কণাদ। গরম ডাল দিয়ে ভাত মাখছে, হঠাৎই পৃথা বলে উঠল, আজ দিব্যজ্যোতির মা ফোন করেছিলেন।

কণাদ চমকে গেল। থেমে গেছে হাত, চোখ তুলেছে।

দিব্যজ্যোতি সিংহ খুব অসুস্থ।

জানি তো। গ্রিন ভিউতে আছে।

জানতে? জানো? আমাকে বলোনি তো?

কণাদ ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করল। অপ্রতিভ মুখে বলল, আমি তো ভেবেছিলাম তুমিও... কোন একটা কাগজেই তো বেরিয়েছিল... ছোট করে... রোববার। আমাদের কাগজে নয় অবশ্য।

পৃথার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে, রবিবার তো বাড়িতে এক গুচ্ছ কাগজ আসে। ক'টা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি?... যখন দেখলে, তখনই তো আমায় বলা উচিত ছিল।

কণাদ সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিতে পারল না। পৃথা ভুল বলেনি, তাকে ডেকে খবরটা দেখানোই তো স্বাভাবিক ছিল। তখন মনে হল, পৃথা যদি খবরটা দেখে যেচে কিছু বলে, তখনই আলোচনা করা যাবে প্রসঙ্গটা? কেনই বা সে ধরে নিয়েছিল ওই সংবাদ পৃথার চোখে পড়বেই? কোন যুক্তিতে তার ধারণা জন্মাল, দিব্যদা গুরুতর অসুস্থ জানা সত্ত্বেও মুখে কুলুপ এঁটে আছে পৃথা?

কণাদ এক ঢোক জল খেল। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল, উচিত ছিল বটে। সরি।

পৃথা যেন একটু নরম হয়েছে। একটুক্ষণ স্থির চোখে কণাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, দিব্যর মা একটা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছেন। কী করি বলো তো?

কী ঝামেলা?

একবার তাঁর ছেলের কাছে যেতে বলছিলেন।

কণাদ এবার বেশ অবাক, তুমি গিয়ে কী করবে?

আমিও তো ওঁকে তাই বললাম। আমি গিয়ে কী করব! ...তবু এমনভাবে অনুরোধ করছিলেন... আমার মরোমরো ছেলেটাকে একবার দেখে যাও...

মরোমরো কেন? দিব্যদা তো এখন বেটার। বলেই কণাদ বুঝতে পারল বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। অপ্রস্তুতভাবে বলল, আমাদের আর্টরুমের নব্যেন্দু আজ বলছিল। ও বোধহয় কাল গিয়েছিল নার্সিংহোমে।...

ও।

কণাদ টের পেল, পৃথা তার সাফাই গাওয়াটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। হয়তো বুঝেই ফেলেছে, তাদের আর্টরুমে নিয়মিত কথা হয় দিব্যদাকে নিয়ে। মাথা নামিয়ে আহারে ফের মনোযোগী হওয়ার ভান করে বলল, তা মাসিমা যখন বলছেন, একবার ঘুরেই এসো না।

তুত্, আমার একদম ইচ্ছে করছে না। ওই লোকটার মুখ আবার দেখতে হবে ভাবলেই আমার কেমন গা কিশকিশ করে।

লোকটা তো এখন আর লোকটা নেই, পৃথা। দিব্যদা তো এখন জড়ভরত।

হতে পারে। কিন্তু ওকে দেখলেই আমার পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে যাবে। একটা নোংরা লোক...

তুমি দিব্যদাকে এখনও এত ঘেন্না করো?

সারাজীবন করব। তুমি যদি দশ বছর ওর সঙ্গে থাকতে, তা হলে তুমিও করতে।

কণাদ হেসে ফেলল, ভাগ্যিস আমি দিব্যদার বউ হইনি, ছাত্র ছিলাম!

ইয়ারকি মেরো না। আমার বিরক্ত লাগছে। পৃথা কটমট তাকাল, সবচেয়ে খারাপ লাগছে কী জানো? দিব্যর মা... যিনি ছেলেকে হাড়েমজ্জায় চেনেন... ছেলের নেচার বদলাতে পারেননি বলে আমার কাছে সহস্রবার কপাল চাপড়েছেন... উনিই এক সময়ে বলেছিলেন, তুমি পালাও, দিব্যর সঙ্গে আর কিছুদিন থাকলে তুমি পাগল হয়ে যাবে... তিনিই আজ আমায় সাধছেন।

একটা কথা বলব, পৃথা? কণাদ না-বলে পারল না, মাসিমা অত্যন্ত সেনসেটিভ মহিলা। সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। তোমার অসম্মানগুলো উনি খুব রেলিশ করেছেন, এ অপবাদ তুমি নিশ্চয়ই ওঁকে দিতে পারবে না।

দিইনি তো। বলেছি কখনও, উনি ছেলের অন্যায়কে সাপোর্ট করেছেন?

তা হলে?

কী তা হলে?

বলি কী... উনি যখন সব বুঝেশুনেই ডাকছেন, তোমার একবার ঘুরে আসা উচিত।

পরামর্শটা পৃথার যেন পছন্দ হল না। মাথা নামিয়ে ভাত খুঁটছে, ছোট ছোট গ্রাস তুলছে মুখে, সময় নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। আড়চোখে পৃথাকে দেখছিল কণাদ। দোটানায় পড়ে গেল কি? কী আশা করছিল? কণাদ তার না-যাওয়ার ইচ্ছেটাকে সমর্থন করবে? প্রায় এগারো বছর একসঙ্গে ঘর করার পরেও কণাদকে কি চেনেনি পৃথা?

হঠাৎই কণাদের মনে হল, পৃথার এই দোলাচল, এই অপ্রসন্নতা, কোনওটাই যেন পুরোপুরি অকৃত্রিম নয়। যদি দিব্যদাকে দেখতে না-যাওয়ার ইচ্ছেটা এতই প্রবল হত, মাসিমাকেই তো সরাসরি বলে দিতে পারত। মাসিমার কাছে ভাল বা মন্দ, কোনও কিছু সাজারই তো আর দায় নেই পৃথার! যদি তিনি প্রাক্তন পুত্রবধূকে নিষ্ঠুরও ভাবেন, তাতেই বা পৃথার কী যায় আসে? স্বামী হিসেবে দিব্যদা যেরকম প্রবঞ্চক ছিল, তাতে তো আর প্রতি পৃথার সমবেদনা না-জাগাটাই স্বাভাবিক। মাসিমা

আহত হলেও নিশ্চয়ই বুঝতেন পৃথার মনোভাবটা। নয় কী?

আরও একটা কথা মনে হচ্ছিল কণাদের। প্রায় এক যুগ দিব্যদার সঙ্গে পৃথার কোনও সংস্পর্শ নেই, এখনও কি তার ওপর এতখানি রাগ ঘেন্না থাকা সম্ভব? সময় কি তৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা, দুটোকেই খইয়ে দেয় না? পৃথা যদি একা থাকত, তা হলে হয়তো স্মৃতিভারে পীড়িত হলেও হতে পারত। নিঃসঙ্গতা প্রেমকে বাড়িয়ে দেয়। অপ্রেমকেও। কিন্তু পৃথা তো দিব্যি ঘরসংসার করছে, ছেলে ছেলে করে পাগল থাকে সারাক্ষণ! শূন্যতাবিহীন হৃদয়ে বিরাগ টিরাগে তো পলি পড়ে যাওয়ার কথা!

নাহ্, নারীচিত্ত অতি অনিত্য, এর তল পাওয়া কণাদের কম্মো নয়। ওস্তাদ ডুবুরি লাগবে।

একটু যেন গা-বাঁচানো চিন্তা। তবু এভাবেই ভাবনাটাতে সাময়িক বিরতি টানল কণাদ। ভাতে ডিমের ঝোল ঢেলে বলল, যাক গে, কাল কী হবে?

পৃথার দৃষ্টি উঠেছে।

যেমন বাজারে যাই তেমনই যাব? নাকি তোমার ময়নারানি আসে কি না দেখে নিয়ে...?

পৃথা বুঝি স্বচ্ছন্দ হল একটু। সামান্য ভেবে নিয়ে বলল, মনে হয় না আসবে। ময়না তো এক দিনের জন্য ডুব মারে না। আমি বরং সকালে উঠে ফ্রিজারে যে মাছটা আছে, রেঁধে ফেলব।

একটু মুরগি এনে রাখতে পারি।

বেশ তো, এনো। কাল শনিবার... হাফ ডে... আমি এসে করে ফেলব।

আমিও করতে পারি। আমার তো বারোটায় বেরোনো। যদি বলো তো চিকেনের একটা নতুন প্রিপারেশান ট্রাই করি।

তোমার মশলাগুলো বড্ড ছ্যাকরা ছ্যাকরা থাকে। ভাল করে কষাও না।

এটা একদম অন্য রকম রান্না। নো কষাকষি বিজনেস। শুধু নুন তেল মশলা দিয়ে দমে বসিয়ে দাও, ব্যস। মাখতেও হয় না।

পৃথা ঠোঁট উলটোল, কী জানি সে কী পদের হবে!

আহা, দ্যাখোই না...

যা খুশি করো। ঝালটা দিয়ো না, টুকুস মুখে তুলতে পারবে না।

কণাদ ঠাট্টার সুরে বলল, আমি কিছু রাঁধতে চাইলে তুমি এত ফ্যাকড়া তোলো কেন বলো তো? রান্নাঘর হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে?

পৃথার খাওয়া শেষ। থালা বাটি তুলে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কন্ট্রোলটা পুরোপুরিই নাও না। আমাকে আর তা হলে ময়নার পেছনে ট্যাকট্যাক করতে হয় না।

রক্ষে করো। কণাদ হেসে উঠল, তোমার ময়নারানির কন্ট্রোল আমি নিতে পারব না।

পৃথাও হেসে ফেলেছে। এঁটো বাসন সিঙ্কে রেখে এসে অবশিষ্ট খাবার ঢোকাল ফ্রিজে। কণাদও উঠল। বেসিনে গিয়ে হাত-মুখ ধুল। তারপর একখানা ঢেকুর তুলে ঢুকেছে টুকুসের ঘরে।

রাতবাতি জ্বলছে। তাদের ঘরের মতো নীলাভ আলো নয়, কম পাওয়ারের সাধারণ বাল্‌ব। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে পাছে টুকুস ভয়টয় পায়, তাই এ-ঘরটা বেশি অন্ধকার হতে দেয় না পৃথা। সিঙ্গল বেড খাটে যথারীতি টেরাবেঁকা হয়ে ঘুমোচ্ছে টুকুস। বালিশ কোথায়, টুকুসের মাথাই বা কোথায়! চরকি খেতে খেতে ধারেও সরে এসেছে অনেকটা। পাঁজাকোলা করে ছেলেকে তুলল কণাদ, শুইয়ে দিল ঠিক করে, পাশবালিশ দিয়ে আটকে দিল খাটের কিনারা। বেশ ভারী হয়ে গেছে টুকুস, তুলতে হাঁপ ধরে যায়, বিছানার কোণটাতে বসে জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। হালকা আলো মাখা ঘরখানাকে নিরীক্ষণ করছে। ফ্ল্যাটটা কেনার সময়ে আমার আলাদা ঘর চাই, আমার আলাদা ঘর চাই বলে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছিল টুকুস। অগত্যা পৃথাকেও রাজি হতে হল। ঘরটা পৃথা সাজিয়েওছে চমৎকার। ছেলের জামা-কাপড়ের জন্য দেওয়ালজোড়া রঙিন ওয়ার্ড্রোব, খেলনা রাখার কাচের আলমারি, পড়ার টেবিল, বইয়ের র‍্যাক, জানলায় মানানসই পরদা...। ঘরটায় ভারী যত্ন পৃথার, একটুও অগোছালো হতে দেয় না।

শুধু এ-ঘর কেন, দু'কামরার এই ফ্ল্যাটে কোথাও কি এলোমেলো ভাব

আছে? পৃথা তা হতেই দেবে না। যেমন ঘুরে ঘুরে বাছাই আসবাব কিনেছে, শো-পিস সংগ্রহ করেছে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও পৃথার তেমনই প্রাণঢালা উৎসাহ। সারাক্ষণ এটা ঝাড়ছে, ওটা পরিষ্কার করছে...। একটা জিনিস এদিক ওদিক হলেই কণাদ আর টুকুস বকুনি খাচ্ছে এন্তার। কেন আমার দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দু'ইঞ্চি সরল। কে আমার দুর্গামূর্তিতে হাত দিয়েছে! পেন্টিংটা যে বেঁকে আছে, কেউ তাকিয়েও দেখে না! ওই ধমকধামকগুলোই যেন বলে দেয়, সুস্থ একটা সংসার পেয়ে মনটা ভরে গেছে পৃথার।

এই পরিপূর্ণতার মধ্যেও কি অতীত এসে হানা দেয়? না হলে দিব্যদার ওপর এখনও পৃথার এত রাগ কেন? কণাদের ভালবাসা কি এখনও পৃথার জ্বালাটা জুড়োতে পারেনি?

ধুস্, আবার সেই হাবিজাবি চিন্তা! কণাদ উঠে বসার জায়গায় এল। টিভি চালিয়ে দিয়েছে। অন হতেই পরদায় কার্টুন। রিমোট টিপে কণাদ বাংলা চ্যানেলে গেল। একটা অচেনা মেয়ে পুরনো দিনের গান গাইছে, শুনতে মন্দ লাগে না। গানের মাঝেই রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে টুং-টাং আওয়াজ। বাসনকোসনগুলো বোধহয় মেজে রাখছে পৃথা। এর পর চলবে রান্নাঘর সাফাই। স্ল্যাব, তাক, সব ঝকঝকে না-করলে পৃথার ঘুমই আসবে না। দিব্যদার সংসারে পৃথা এতটা নিটিপিটি ছিল না, বরং সবেতেই কেমন যেন আলগা আলগা ভাব, কণাদ দেখেছে। আনমনাও থাকত সারাক্ষণ। প্রথম দিন তো কণাদের চায়ে চিনির বদলে নুন দিয়ে ফেলেছিল। তখন কণাদ আর্ট কলেজের ফাইনাল ইয়ারে। কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যাপারে কী একটা যেন কথা বলতে দিব্যদার বাড়িতে গিয়েছিল সে আর চন্দন। নুন-চা খেয়ে চন্দনের মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, কণাদের অবস্থাও তথৈবচ।

দেখে দিব্যদার কী হাসি, একে কী বলে জানিস তো? আগুনে দীক্ষা নেওয়া। নোনতা চা দিয়ে তোদের বউদির সঙ্গে পরিচয়টা হল... মনে হচ্ছে এই পরিচয়টা বহুকাল টিকবে।

প্রায় দৈববাণী যেন! অন্তত কণাদের ক্ষেত্রে। কীভাবে যে সেই

পৃথাবউদির সঙ্গে সম্পর্কটা পরে বদলে গেল! আর্ট কলেজ ছাড়ার পর বছর দু'-তিন তো দিব্যদার সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না। তখন অন্নচিন্তা চমৎকারা, আঁকার টিউশনি ফিউশনি জুটিয়ে কোনওক্রমে কলকাতায় টিকে আছে কণাদ। আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিকল্পনা করছে কীভাবে সবাই মিলে একটা এগজিবিশন করে কলকাতাকে কাঁপিয়ে দেওয়া যায়। গাঁটের কড়ি খসে খসুক, কুছ পরোয়া নেই।

ওই প্রদর্শনীর সূত্রেই সুতোটা জুড়ল আবার। অ্যাকাডেমির সাউথ গ্যালারিতে চার বন্ধুর ছবি আর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। দিব্যদাকে কলেজে না পেয়ে চেতলার বাড়িটায় গিয়েছিল কণাদ। বেল বাজাচ্ছে, বেল বাজাচ্ছে, কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে, তখনই পৃথা দরজা খুলল। পৃথাই। তার মুখ অসম্ভব ফুলে আছে, দু'চোখ করমচার মতো লাল।

কণাদ থতমত মুখে বলল, স্যারের কাছে এসেছিলাম।

ও।

স্যার বাড়ি নেই?

না তো।

এই কার্ডটা স্যারকে দেওয়ার ছিল। আমাদের এগজিবিশন... একুশ তারিখে ওপেনিং... সাত দিন চলবে। স্যারকে বলবেন যেন অবশ্যই আসেন।

হুঁ।

আপনিও যাবেন কিন্তু।

উঁ?

আপনি গেলে আমাদের খুব ভাল লাগবে।

হুঁ।

আপনার কি শরীর খারাপ?

উঁ?

আপনার মুখচোখ যেন কেমন লাগছে! আজ স্কুলে যাননি?

হ্যাঁ। গেছিলাম তো।

পৃথা যেন অনেক দূরে কোথাও চলে যাচ্ছিল বারবার। যাচ্ছে, ফিরছে, যাচ্ছে, ফিরছে...। পরে কণাদ শুনেছে, দিব্যদা নাকি সেদিনই ঘোষণা করেছিল রুনির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা তাঁর পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

সেই বিশেষ দিনটাতেই কি পৃথার প্রতি কণাদের মুগ্ধতার জন্ম? নাকি আরও পরে? যখন দিব্যদার বাড়িতে আবার যাতায়াত শুরু হল? পৃথা যে কেন তাকেই বেছে নিয়েছিল দুঃখের ঝাঁপি উজাড় করার জন্য? ওই ফোঁটা ফোঁটা দুঃখই বা কবে দানা দানা মুক্তো হয়ে গেল? বয়সের তফাত, স্যারের বউ, কোনও সংস্কারই আর মাথায় রইল না। এমনকী স্যার থেকে দিব্যদা হয়ে যাওয়া প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের ওপর অন্ধ শ্রদ্ধাভক্তিটাও ক্রমশ উবে গেল।

কণাদ বলত, কেন পড়ে আছ, পৃথা?

পৃথা বলত, কী করব? কোথায় যাব?

বাবা-মা'র কাছে চলে যাও।

উহুঁ, তা হয় না। নিজে জেদ করে বিয়ে করেছিলাম...

সো? ভুল তো তোমার হতেই পারে।... তা ছাড়া তোমার একটা চাকরিও আছে...

আমার ভয় করে, কণাদ। ভরসা পাই না।

কীসের ভয়? কাকে ভয়?

জানি না। তোমাদের দিব্যদা এমন একটা পাহাড়ের মতো মানুষ, তার ছায়া থেকে সরে গেছি ভাবলেই আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে।

তার মানে দিব্যদার ওপর তোমার এখনও উইকনেস আছে?

উইকনেস? এত কিছু দেখার পরেও? পৃথা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাত, না। বিশ্বাস করো, না। তবু...

ওই তবুটুকুর পাঁচিল ডিঙোতে কতবার যে হোঁচট খেয়েছে পৃথা! ধাক্কা মেরে মেরে, ধাক্কা মেরে মেরে, এক জীবন থেকে তাকে অন্য জীবনে প্রবেশ করানো যে কী কঠিন কাজ ছিল! ওই তবুরই এক ক্ষীণ ভগ্নাংশ কি এখনও রয়ে গেছে পৃথার হৃদয়ে? আত্মগ্লানি হয়ে?

অসন্তোষের রূপ ধরে যা ঠিকরে বেরোচ্ছে এখন?

কিন্তু দিব্যদার মা'র ব্যাপারটা কী? মাসিমা আবার পৃথাকে ডাকাডাকি শুরু করলেন কেন? হঠাৎ পৃথাকে দেখে দিব্যদার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, না-ভেবে নিশ্চয়ই ডাকেননি? দিব্যদাই কি তবে পৃথার দর্শনের অভিলাষী? পৃথা কি তা জানে? নাকি জানে না?

পৃথা পাশে এসে বসেছে। টিভিটাকে দেখিয়ে বলল, কী ছাতার মাথা একটা ইন্টারভিউ দেখছ?

তাই তো, গান তো শেষ হয়ে গেছে। কণাদ হেসে বলল, আহা, ইন্টারভিউটাও তো চলছিল লোকজনকে দেখানোর জন্যই, না কি?

তুমি মোটেই এসব প্রোগ্রাম লাইক করো না।... কিছু একটা ভাবছ, তাই তো?

হুঁ। রিমোটটা পৃথাকে বাড়িয়ে দিয়ে সোফায় পিঠ ঠেকাল কণাদ, দিব্যদার কথাই মনে পড়ছিল।

কী কথা?

কী মানুষ, তার কী হাল! এত লাইভলি, এত ফুল অফ ফোর্স, তার কিনা সেরিব্রাল? আর কি নরমাল লাইফে ফিরতে পারবে?

তোমার খুব মায়া হচ্ছে মনে হয়?

হওয়ারই তো কথা। আমি তো দিব্যদার সঙ্গে ঘর করিনি। বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল কণাদ।

পৃথা টিভি অফ্ করে দিল। সরু চোখে বলল, আমায় টিজ করছ?

না গো।... আসলে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা তো অন্য রকম ছিল। অ্যাজ এ মাস্টারমশাই, হি ওয়াজ নিয়ার পারফেক্ট। আমরা তো ওর ক্লাসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতাম।

জানি। শয়তানদের একটা মেসমেরাইজিং পাওয়ার থাকে।

ওফ্, তুমি না...! কণাদ মুখভঙ্গি করল, আমাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশত... মনে হত বন্ধু। ভেরি নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার। কে কোথায় কার সঙ্গে প্রেম করছে, কিংবা কারও স্ক্যান্ডাল, কীভাবে আর্টিস্টদের ছবির দাম চড়ানো হয়... কোনও কিছুতেই দিব্যদার রাখঢাক ছিল না।

তোমাদের সঙ্গে বয়সের ডিফারেন্সই বা কী ছিল? বড় জোর আট-দশ বছর।

তা কেন? জুনিয়ার ছেলেমেয়েগুলোও তো বলে...

সবটাই ওর অ্যাক্টিং।... আমার সঙ্গে মিউচুয়াল সেপারেশনটা হয়ে যাওয়ার পর ও নাকি কলেজে গিয়ে হাউহাউ করে কেঁদেছিল। রানিদি আমায় বলেছে। কান্নায় নাকি ভিড় জমে গিয়েছিল স্টাফরুমে। অথচ মিউচুয়াল সেপারেশনের প্রস্তাবটা কিন্তু ওরই দেওয়া!... দিব্যর ওই কান্নাটাও যেমন নাটক, স্টুডেন্টদের কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ানোটাও সেরকমই নাটক।

আই ডাউট। অ্যাট হার্ট, দিব্যদা কিন্তু খুব প্যাঁচোয়া নয়।... আমাদের ব্যাপারটাই ধরো না। দিব্যদা কি বোঝেনি আমাদের মধ্যে একটা রিলেশান গড়ে উঠছে? কতদিন তো ঠাট্টা করে আমায় জিজ্ঞেস করেছে, তুই এ-ঘরে এসেছিস, না ও-ঘরে।

সে তো আমাকেও বলত। যাও না, ঘরে কেন গোঁজ হয়ে বসে আছ, কণাদের সঙ্গে গিয়ে অ্যাকাডেমিতে নাটক ফাটক দেখে এসো, মনটা ফ্রেশ হবে।

কণাদ চোখের কোণ দিয়ে তাকাল, তা হলে?

তা হলে আবার কী! ওটা ছিল ওর ইঁদুর-বেড়াল খেলা। ধরেই নিয়েছিল ওকে ছেড়ে আমি কস্মিনকালে বেরুতে পারব না, তাই সুতো ছেড়ে ছেড়ে দেখত আমার যন্ত্রণাটা বাড়ছে, না কমছে। তুমিও একটু নার্ভাস ফিল করতে... সেটাও বেশ এনজয় করত। রিমোট কন্ট্রোলে পুতুল নাচানোর আনন্দ!

তুমি কিন্তু দিব্যদাকে বড় ন্যারো অ্যাঙ্গল থেকে দেখেছ, পৃথা। হতে পারে দিব্যদার দোষের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, তোমার সঙ্গে যে আচরণটা করেছে...

আচরণ নয়, বলো নির্যাতন। পৃথা আটকে দিল কথাটা, মানসিক অত্যাচার। হাসিমুখে আমার সঙ্গে কথা বলছে, ওদিকে নিজের যা-খা নোংরামো করার সবই করে যাচ্ছে। ধরা পড়লেও বিকার নেই, কাঁধ

ঝাঁকিয়ে বলছে, ছাড়ো না, কেন ওসব বাইরের ব্যাপারগুলোকে পাত্তা দাও! আমি যেরকম, সেভাবেই আমায় অ্যাকসেপ্ট করতে পারো না?

হ্যাঁ, ওটা অত্যাচার। অত্যাচারই। আমি তো না বলছি না। জানি তো, কাম রিপুটা দিব্যদার একটু বেশিই ছিল। কিন্তু তার জন্য দিব্যদার অন্য গুণগুলো...

থামো। ওই এক রিপুর ঠেলাতেই আমার জীবন...। পৃথা ছোট একটা হাই তুলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শুতে যাবে তো এবার?

হুঁ। যাই।

পৃথা চলে যাওয়ার পরেও কণাদ বসে রইল কিছুক্ষণ। বসেই আছে। পৃথা যা বলল তা পুরোটা কি মানা যায়? শুধু অভিনয় দিয়ে কি একটা মানুষ নিজের চারপাশে অমন জ্যোতির্বলয় তৈরি করতে পারে? মাত্র সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বছর বয়সে টুসকি বাজিয়ে চাকরি ছেড়ে দিল, কোন সে গণ্ডগ্রামে গিয়ে বড় একটা কাজ করছে, জুনিয়ার আর্টিস্টদের প্রোমোট করার জন্য হরবখত গলা ফাটায়, যে-কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মিছিলে সবার আগে... সবই কি দিখাওয়া? দিব্যদার খুব বেশি কাছে ছিল বলেই বোধহয় পৃথা সেভাবে পড়তে পারেনি দিব্যদাকে। ক্যামেরা একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে পড়লে যা হয় আর কী। বিশাল ক্লোজআপে শরীরের রোমগুলোই প্রকট হয়, সৌন্দর্যটা নয়। রোমকূপগুলো নিশ্চয়ই সত্যি, কিন্তু পুরো সত্যি কি?

কণাদের মনে পড়ল, বছর তিনেক আগে একটা গ্যালারিতে দিব্যদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল কণাদ, দিব্যদাই এগিয়ে এল। পুরনো চেনা ভঙ্গিতে কাঁধে চাপড় মেরে বলল, হাই ইয়াং ম্যান, আছিস কেমন? পৃথা? বাচ্চাটা কত বড় হল? কী যেন নাম রেখেছিস তোরা?

দিব্যজ্যোতি সিংহের ওই আচরণ কি শুধুই অভিনয়? নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু? খুব সাধারণ মাপের মানুষ কি অত সহজ স্বরে কথা বলতে পারে? অন্তত কণাদ তো পারত না। সেদিন দিব্যদার সামনে কেমন যেন ছোট লেগেছিল নিজেকে। বাড়ি এসে পৃথাকে

সাক্ষাৎকারটার কথা বলতে পারেনি। না পারাটাই যেন আরও বেশি ক্ষুদ্র করে দিয়েছিল নিজেকে।

আলো পাখা বন্ধ করে ঘরে এল কণাদ। পাঞ্জাবিটা ছাড়ছে। খালি গায়ে শোওয়াটাই তার বেশি আরামের।

আচমকাই পৃথার গলা, হঠাৎ তুমি দিব্যর গুণ আবিষ্কার করা শুরু করলে কেন বলো তো?

কণাদ ঘুরে তাকাল। আড়াআড়ি চোখ ঢেকে শুয়ে আছে পৃথা। ঘুমোয়নি!

কণাদ জবাব দেওয়ার আগেই পৃথা ফের বলল, তোমার কি দিব্যকে নিয়ে কোনও কমপ্লেক্স আছে?

নাহ্। না তো! কণাদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তোমার এরকম কেন মনে হল?

এমনিই। পৃথা পাশ ফিরল, আলোটা নিবিয়ে দাও।

চার

পাঁচতলার এই ঘরটায় সকালবেলা জানলাগুলো সব খোলাই থাকে। শুধু সকালটুকুই। এই সময়টায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখতে বলে দিব্যজ্যোতি। সাগরসবুজ মোটা মোটা পরদাও সরিয়ে দেওয়া হয় দুপাশে। দিব্যি টাটকা আলো বাতাস খেলে ঘরে।

আজও, দিব্যজ্যোতির বাসনামতোই, ঘরে এখন এক টুকরো রোদ্দুর। দক্ষিণের জানলা গলে খুব বেশি এগোয়নি, কোনওমতে গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছে অন্দরে। মেঝেতেই থাকবে কিছুক্ষণ, তারপর কাঁচা হলুদ রং পিছু হটবে ক্রমশ।

রোদ্দুরটা দিব্যজ্যোতিকে চুম্বকের মতো টানছিল। নাকি রংটা? কারও ছবির কথা মনে পড়ছে কি? টার্নার? কনস্টেবল? সোরা? রংটাকে ছুঁয়ে দেখতে বড় সাধ জাগছিল দিব্যজ্যোতির। কিন্তু ওই রোদ তার বিছানা

পর্যন্ত আসে কই, খানিক তফাতে থমকে যায় যে রোজ। যেন দিব্যজ্যোতিকে দেখতে পেয়েই তার গতি রুদ্ধ হল, এবার সে এক পা এক পা করে পিছোবে। দিব্যজ্যোতিকে একবার স্পর্শ করতেও কেন যে তার এত অনীহা?

রাতের নার্স মীনা সামনে এসেছে। শ্যামলা রং, ছোটখাটো রোগাসোগা চেহারা, খয়াটে মুখ, সিঁথিতে সিঁদুর জবজব করছে। সাদা ধবধবে পোশাক আর শুভ্র মস্তকাবরণীর সঙ্গে সিঁদুরটা বড্ড বেমানান। চোখে লাগে।

দিব্যজ্যোতির ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। কেন যে এত সিঁদুর মাখে মেয়েটা? মনে হয় যেন ওই লালের পরিমাণের ওপরই নির্ভর করে আছে তার জীবনের সব সুখ শান্তি নিরাপত্তা! কী যে হাস্যকর সংস্কার!

দিব্যজ্যোতির ভাল না-লাগায় অবশ্য মীনার কিছু যায় আসে না। অবলীলায় রোদটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে সে। কেজো সুরে বলল, কী হল, ব্রেকফাস্ট হবে না আজ?

ভুরুর ভাঁজ বাড়ল দিব্যজ্যোতির। তীব্র স্নায়বিক ঝাঁকুনিতে সাময়িকভাবে হারানো বাক্‌শক্তি ফিরে এলেও তার মুখ এখনও অল্প বেঁকে আছে, শব্দ উচ্চারণ পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলল, সরো তো, সামনে থেকে সরো।

কেন স্যার? কী হল?

আহা, সরো না। চলে যাবে যে।

থতমত খেয়ে দু'পা হটে গেল মীনা। ঘাড় ঘুরিয়ে জানলা দেখতে দেখতে বলল, কে চলে যাবে? কী চলে যাবে?

রোদ্দুর।

ও, তাই বলুন। আমি ভাবলাম, কী না কী!

মীনা হেসে ফেলল। টানা সাত দিন রাতডিউটি করে দিব্যজ্যোতিকে মোটামুটি চিনে ফেলেছে সে। লোকটা খুব একটা হেঁজিপেজি নয়, রীতিমতো সমীহ করে কথা বলে ডাক্তারবাবুরা। পেশেন্ট হিসেবে নির্ঝঞ্ঝাট, খাওয়াদাওয়া নিয়ে তেমন ঝামেলা নেই, অকারণে ডাকাডাকি

করে না, তবু একটু খ্যাপাটে ধরনের। কড়া সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়ানো সত্ত্বেও ঠিক জেগে যায় কাকভোরে, কখন জানলার পরদা আর কাচ সরবে তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বেড থেকে বাড়িঘর ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, তবু তাকিয়ে থাকা চাই। জিজ্ঞেস করলে বলে, অন্ধকারের পাতলা হওয়াটা দেখতে নাকি বেশ লাগে। আপন মনে গান গেয়েও ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, জড়ানো গলায়। গানের তালে তালে অদ্ভুতভাবে দোলায় বাঁ হাতখানা। মনের জোর আছে খুব। বাঁ কাত ফিরে একা একাই উঠে বসতে চেষ্টা করে বিছানায়, ধরতে দেয় না, মানা করে। এক-এক সময়ে ভীষণ উদাস, কী যেন ভাবছে। দু'-চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মীনাকেও যেন দেখতে পায় না তখন। আবার কখনও বা যেচে রঙ্গরসিকতা করছে টুকটাক। কিংবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানছে মীনার পরিবারের কথা। এমন পেশেন্টের সঙ্গে তো হালকা সুরে কথা বলাই যায়।

ভুরু নাচিয়ে মীনা জিজ্ঞেস করল, কী আছে বলুন তো ওই রোদ্দুরটায়?

নাথিং। এভিরিথিং।... তুমি বুঝবে না।

কী করে বুঝব? আমি তো আপনার মতো আর্টিস্ট নই। মীনা প্রেশার মাপার যন্ত্রখানা বিছানায় রাখল, একবার হাতটা দিন তো। ব্রেকফাস্টের আগে পালস প্রেশারটা একবার দেখে নিই।

মূর্তিমান রসভঙ্গ! দিব্যজ্যোতি বেজার মুখে বলল, বারেবারে এত মাপামাপির কী দরকার?

বা রে, দেখতে হবে না প্রেশার স্টেডি হল কি না! নইলে বাড়ি যেতে পারবেন না যে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়েই বা হবেটা কী? এখানে কী এমন খারাপ আছি?

আহা, বাড়ি না গেলে ছবি আঁকবেন কী করে?

এবার দিব্যজ্যোতি হেসে ফেলেছে। হাসতে হাসতে সচল বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল, দ্যাখো।

কবজি টিপে নাড়ির গতি মাপছে মীনা। তিরিশ সেকেন্ড হতে না-হতেই ছেড়ে দিল হাত, পেশাদারি ক্ষিপ্রতায় ফেট্টি জড়াচ্ছে দিব্যজ্যোতির বাহুতে। কানে স্টেথো গুঁজল, ফসফস পাম্প করছে রবার বালব।

দিব্যজ্যোতির আবার একবার মনে হল, মীনার সিঁথির লালটা বড্ড বেশি চড়া। ক্যাটক্যাট করছে। চোখ বুজে ফেলল দিব্যজ্যোতি। বোজা চোখেই টের পেল মীনার কাজ শেষ, যন্ত্র গোছাচ্ছে।

চোখের পাতা অল্প ফাঁক করে দিব্যজ্যোতি প্রশ্ন করল, কেমন দেখলে?

মন্দ কী।

কত? প্রেশার?

বলার নিয়ম নেই। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করবেন।

দিব্যজ্যোতি অবহেলাভরে বলল, দুর, ডাক্তার কী বলবে? আমি জানি কেমন আছি।

কেমন?

ডান সাইডের বখেড়াটা বাদ দিলে একদম ফিট। শরীর ফরির কিস্যু নয়, মনটাই আসল, বুঝলে। মন চাঙা, তো শরীর ভি চাঙ্গা।... তুমি স্টিফেন হকিংয়ের নাম শুনেছ?

না।

তোমার জি কে খুব পুওর। হকিং একজন সায়েন্টিস্ট। ভেরি ভেরি ফেমাস। তার গোটা শরীরটাই অসুখে পঙ্গু হয়ে গেছে। ঘাড় হেলেই থাকে, লোয়ার পোরশন গন, স্পিচ নেই... কিন্তু তার মধ্যেই বিয়ে করেছে। বাচ্চাও হয়েছে। দিব্যজ্যোতি বাঁ চোখ টিপল, কী বুঝলে?

এই ধরনের রসিকতাও লোকটার মুখে আটকায় না। মীনা অতি কষ্টে হাসি চেপে বলল, আপনি কিন্তু আজকে একটু বেশি কথা বলছেন স্যার।

আমার কি কথা বলা বারণ?

তা নয়। স্ট্রেন তো হচ্ছে।

হোক। মুখের মাসলের এক্সারসাইজটা এখন খুব দরকার।... দাও,

ব্রেকফাস্টটাও দাও। পরের এক্সারসাইজটাও শুরু করি।

মীনা উঠে খাবারের ট্রলি ঠেলে নিয়ে এল বিছানার পাশে। চাবি ঘুরিয়ে উঁচু করল খাটের মাথার দিকটা। বাঁ হাতের চেটোয় ভর দিয়ে দিব্যজ্যোতিও উঠল একটু, ঘষটে ঘষটে। বুকের কাছে টেনে আনা টেবিল থেকে নিজেই চামচ দিয়ে খাবার তুলছে মুখে। অনভ্যস্ত হাত কাঁপছে মৃদু মৃদু, বেঁকে থাকা মুখে চামচ ঢোকাতে গিয়ে খানিকটা পরিজ গড়িয়ে পড়ল কষ বেয়ে। মীনা তাড়াতাড়ি মুছে দিতে যাচ্ছিল, চামচ নেড়ে তাকে বারণ করল দিব্যজ্যোতি। নিজেই ন্যাপকিনে মুছছে সযত্নে। আয়াস করে টোস্ট খেল, ধীরে ধীরে নুনবিহীন ডিমসেদ্ধও। চিবোতে এখনও বেশ কষ্ট, তবু দিব্যজ্যোতি ছাড়ার পাত্র নয়। আহার পর্ব যখন শেষ হল, দিব্যজ্যোতি কুলকুল ঘামছে।

খাবারের ট্রে সরিয়ে নিয়ে মীনা জিজ্ঞেস করল, এবার এ.সি-টা একটু চালিয়ে দিই?

শ্রান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছিল দিব্যজ্যোতির। বালিশে মাথা রেখে বলল, হুঁ।

প্রাতরাশের পর ঘণ্টাখানেক ঘুম, তারপর ডাক্তার। শারীর চিকিৎসা। স্নান। তারপর খবরের কাগজটা একটু উলটেপালটে দেখা। দ্বিপ্রাহরিক আহারের আগে পর্যন্ত মোটামুটি এই রুটিনেই চলে দিব্যজ্যোতি।

আজ খবরের কাগজে চোখ রেখে একটু ঢুলুনি মতন এসে গিয়েছিল, ঘোর ছিঁড়ল চেনা গলার ডাকে। কল্পনা।

আধশোওয়া দিব্যজ্যোতি অবাক হয়ে বলল, তুই!

প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে একখানা টিফিন কেরিয়ার বার করে টেবিলে রাখল কল্পনা। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে বলল, কাল রাতে এসেছি।

ফের সব ছেড়েছুড়ে চলে এলি?

সোনামাটিতে একদম মন টিকছে না গো, মামা। সারাক্ষণ বুকটা কেমন উথালপাথাল করে। তুমি হাসপাতালে পড়ে আছ ভাবলে আমার দেহটা কেমন ঠান্ডা হয়ে আসে গো।

দিব্যজ্যোতি অপ্রসন্ন মুখে বলল, যত্ত সব ঢঙের কথা। আমি কি ফুটপাথে আছি? নাকি এখানে আমার দেখাশোনার লোকের অভাব পড়েছে?

জানি, জানি। এখন আমার সেবা তোমার না-হলেও চলবে। ভ্রূকুটি হেনে টুল টেনে বসল কল্পনা। একই রকম খরখরে গলায় বলল, কিন্তু আমার যে মন মানে না, মামা।

ফিরছিস কবে?

যাব গো, যাব। তুমি আগে বাড়ি এসো, খানিক থিতু হও... আমিও দিদাকে হাতে হাতে একটু সামলে দিই...

দিনের নার্স ববিতা বাইরে গেছিল, এইমাত্র ফিরেছে ঘরে। টিফিন কেরিয়ারে চোখ যেতেই হাঁ হাঁ করে উঠল, এ কী, বাইরের খাবার এনেছেন কেন?

সমবয়সি রোগা, লম্বা, ফ্যাকাশে মুখ মেয়েটাকে সরু চোখে একবার জরিপ করল কল্পনা। গলায় আলাদা গাম্ভীর্য এনে বলল, বাইরের খাবার কেন হবে? মামার জন্য আমি নিজের হাতে বানিয়েছি।

কিন্তু আমাদের কিচেনের ফুড ছাড়া আমরা অ্যালাও করি না। নিউট্রিশনের একটা মাপ আছে... তা ছাড়া ওঁকে সল্টফ্রি ডায়েট খেতে হয়...

জানি। নুন কম দিয়েই রেঁধেছি। রোগীর পথ্যে এত এত মশলাও ঢালিনি।

তবু... আমাদের নিয়ম নেই। সামান্যতম নুন থাকলেও সে রান্না আমি ওঁকে দিতে পারব না। আমার চাকরি চলে যাবে।

এ কী অন্যায় কথা! তোমাদের ওই ট্যালটেলে রান্নাই মামাকে গিলতে হবে?

উনি তো আর হোটেল রেস্টুরেন্টে আসেননি, হাসপাতাল নার্সিংহোমের খাবার এরকমই হয়।

একেবারে কাঠে কাঠে পড়েছে। ববিতাও কল্পনার চেয়ে কিছু কম খরখরি নয়। কাজকর্মে দিব্যি দড়, তবে মাধুর্যের বড় অভাব। ভিজিটিং আওয়ারে দিব্যজ্যোতির ঘরে ভিড়ভাট্টা একটু হয়ই, কিন্তু গুঞ্জন সামান্য

মাত্রা ছাড়ালেই মেয়েটা এসে যা রুক্ষ গলায় শাসন করে সবাইকে। রীতিমতো রাগী দিদিমণি রাগী দিদিমণি ভাব।

কল্পনা-ববিতা কোন্দল চরমে ওঠার আগেই দিব্যজ্যোতি হাল ধরল। গলা ঈষৎ উচ্চগ্রামে উঠিয়ে বলল, বেশ তো, আইনে যদি বাধা থাকে তো দিয়ো না। ও খাবার ফেরত নিয়ে যাবে।

কল্পনা ফোঁস করে উঠল, এটা কিন্তু এদের বাড়াবাড়ি, মামা। আমরা কি আমাদের আপনজনদের ভালমন্দ বুঝি না?

চুপ কর। বাচাল কোথাকার।

বাঁকা চোখে কল্পনাকে একবার দেখে নিয়ে বিজয়িনীর দর্পে ফের বেরিয়ে গেল ববিতা। কল্পনাও কিন্তু মিয়োয়নি, নাকের পাটা ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা বিধবা, তাই না মামা?

উহুঁ। বিয়ে হয়নি।

তাই বলো। কল্পনার মুখ হাসিতে ভরে গেল, হবেও না। যা চোপা।

দিব্যজ্যোতি হেসে ফেলল, তা হলে তো তোরও বিয়ে হওয়া উচিত ছিল না।

আচমকাই দু'চোখের মণি স্থির হয়ে গেল কল্পনার। বুঝি বা জ্বলেও উঠল সামান্য। এক দৃষ্টিতে দেখছে দিব্যজ্যোতিকে।

দৃষ্টিটাকে দিব্যজ্যোতি আমলই দিল না। ভাবলেশহীন স্বরে বলল, ড্যাবড্যাব করে দেখছিস কী? ঠিকই বলেছি। সুখেনের মতো ঠান্ডা ছেলে পেয়েছিস বলে বর্তে গেলি, অন্য কেউ হলে ঘেঁটি রে তোকে বের করে দিত।

কল্পনা আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিল। নখ খুঁটছে।

দিব্যজ্যোতি আবার বলল, যাক গে। সুবর্ণলতার কী খবর!

কল্পনা মৃদু স্বরে বলল, চলছে। তোমার জামাইকে সব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি।

ঠিক কাজ করিসনি। ও বেচারা নরমসরম মানুষ... মেয়েগুলোকে দিয়ে কাজকর্ম কি তোলাতে পারবে?

কল্পনা জবাব দিল না। চুপ করে আছে।

আমিনা কাজে আসছে?

তিন দিন এসেছিল। তুলে দিয়ে গেছে কাজ।

পেমেন্ট ক্লিয়ার করে দিয়েছিস?

হুঁ।

মালগুলো তো এবার ডেসপ্যাচ করতে হয়। আগের ফিনিশড প্রোডাক্টগুলোও তো পড়ে আছে।

কীভাবে কী করতে হবে বলে দাও।

থাক। তোর বিদ্যের দৌড় আমি জানি। নিজের নামের বানান লিখতে গিয়ে কলম ভেঙে ফেলিস। দিব্যজ্যোতি বাঁ চোখ কুঁচকে ভাবল কী যেন। তারপর বলল, এবার ফেরার সময়ে আমার গাড়িটা নিয়ে যাস। ড্রাইভারের বন্দোবস্ত করে দেব। সমস্ত মাল গাড়িতে তুলে, সুখেনকে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিবি। দেখি আমি ফিরে কত-দূর কী করতে পারি।

তুমি কী করে করবে?

অক্ষম হয়ে গেলাম ভাবছিস? ওরে মেয়ে, ইচ্ছে থাকলে বিছানায় শুয়ে শুয়েও অনেক কিছু করা যায়। তা ছাড়া চিরকাল আমি এরকম পঙ্গু থাকব নাকি? এই তো, দ্যাখ না, ডান হাতটা আগে নাড়াতেই পারছিলাম না, এখন একটু একটু মুঠো হচ্ছে। পায়েও জোর আসছে। কথাও কত পরিষ্কার হয়ে গেছে বল। বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে?

কল্পনা দু'দিকে মাথা নাড়ল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, তোমার জন্য আমি ডাকাতে কালীবাড়িতে মানত করেছি, মামা।

পাঁঠা টাটা মানত করিস না। ওটা আমাকে খাওয়াস। সতীলক্ষ্মীর পুণ্য হবে।

নিজের রসিকতায় নিজেই জোরে হেসে উঠল দিব্যজ্যোতি। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিরি রকম বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখমণ্ডল। এত বীভৎস, যে কল্পনাও শিউরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি দিব্যজ্যোতির কাঁধে হাত রেখে বলল, হাসতে হবে না। থামো। থামো।

দিব্যজ্যোতি কি তার ক্ষণিকের অসুন্দরতাটাকে টের পেল? প্রত্যক্ষ করল কি কল্পনার চোখে? ম্রিয়মাণ যেন হঠাৎ। আবার বুঝি ঝিমুনি নামছে মস্তিষ্কে। মিনিট খানেক পর বিড়বিড় করে বলল, সুবর্ণলতার কাজে আমি কোনও ঢিলেমি পড়তে দেব না।

কিছু বলছ!

হ্যাঁ। সুবর্ণলতাকে চলতেই হবে।

থামবে কেন? আমি তো আছি।

হুম। চোখের কোণ দিয়ে কল্পনাকে দেখল দিব্যজ্যোতি, একটা কথা ভাবছিলাম। ফোনটা এবার নিয়েই ফ্যাল।

কল্পনা এক পল থেমে থেকে বলল, তাড়া কীসের? তুমি আগে সুস্থ হও।

না। নিয়েই ফ্যাল। কোথায় কী দরখাস্ত জমা করতে হবে জানিস তো?

তোমার জামাই জানে।

শ্যামলবাবু আর এসেছিল সুবর্ণলতায়?

হ্যাঁ। তোমার শরীরের কথা জানতে। ওখানে অনেকেই তোমার খোঁজখবর করে যাচ্ছে। সুবর্ণলতার মেয়েরাও তো তোমার নাম করছে সারাক্ষণ।

দিব্যজ্যোতির হাসি এবার অনেক প্রশান্ত। আবার বিড়বিড় করে বলল, ওরা সবাই চাইছে বলেই বোধহয় বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

ববিতা ফের ঢুকেছে ঘরে। কল্পনাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘড়ি দেখছে বারবার। লক্ষ করে দিব্যজ্যোতি বলল, সময় হয়ে গেছে, এবার তুই রওনা দে।

কল্পনা উঠল। টিফিন কেরিয়ার প্লাস্টিক ব্যাগে পুরছে।

দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞেস করল, কী এনেছিলি রে?

মাগুরমাছের পাতলা ঝোল, চিকেন স্টু, আর একটুখানি আলুপোস্ত। ববিতার দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করল কল্পনা, তোমার তো কপালে নেই, দিদাই খাক।

সেই ভাল। মাকেই একটু যত্নআত্তি কর। দু'সপ্তাহ ধরে বেচারার যা টেনশন যাচ্ছে।

যেতে গিয়েও ঘুরে এসেছে কল্পনা। বলল, তোমায় একটা খবর দিতে ভুলে যাচ্ছিলাম। রুনিমাসি আসছে কলকাতায়।

হঠাৎ!

হঠাৎ কেন হবে, তোমায় দেখতে আসছে। তার বোন বোধহয় খবর দিয়েছে। দিদাও বলে থাকতে পারে। দিদাকে তো কাল রাতেও টেলিফোন করেছিল।

কবে?

বোধহয় সামনের হপ্তায়।

ও।... তুই যা।

কল্পনা বেরিয়ে যেতেই ববিতার প্রশ্ন ধেয়ে এল, মহিলা কি আপনার নিজের ভাগনি?

দিব্যজ্যোতির দৃষ্টি তেরচা হল, কেন বলো তো?

দেখে কিন্তু মনে হয় না।

দিব্যজ্যোতি ছোট একটা শ্বাস ফেলল, দেখে যাকে যা মনে হয়, তার সবটাই কি ঠিক?

ভিজিটিং আওয়ারে দিব্যজ্যোতির ঘরে লোক সমাগম আজ কিছুটা কম। মরণাপন্ন রোগী ক্রমশ আরোগ্যের দিকে গেলে দর্শনার্থীর সংখ্যা তো কমেই আসে। তবু নয় নয় করেও এল বেশ কয়েকজন। সাগ্নিক, পূরবী, দীপাঞ্জন, দিব্যজ্যোতির খুড়তুতো ভাই, ভাইয়ের বউ...। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দু'জন পুরনো রাজনৈতিক সঙ্গীও এসে হাজির। দু'জনেই পার্টির বেশ হোমরাচোমরা। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের নাকি আসি আসি করেও আসা হচ্ছিল না। ইদানীং রাজনীতির সঙ্গে দিব্যজ্যোতির তেমন প্রত্যক্ষ সংস্রব নেই বটে, তবে এককালে এদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহু মিটিং-মিছিলে থেকেছে সে। পুরনো সেইসব দিনের কথাই আসছিল ঘুরেফিরে। স্মৃতি রোমন্থন। আধ ঘণ্টা বকর বকর করে বিদায় নিল দুই

কমরেড। সঙ্গে ভাই ভ্রাতৃবধূ। সাগ্নিকয়াও উঠব উঠব করছে।

দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করল, আপনাকে ঠিক কবে ছাড়ছে দিব্যদা?

ডাক্তার তো বলছে, পরশু। নইলে তার পরের দিন।

পূরবী বলল, তাড়াতাড়ি ফিট হয়ে যান, দিব্যদা। আপনাকে এভাবে বিছানায় দেখতে একটুও ভাল লাগছে না।

দিব্যজ্যোতি হেসে বলল, দ্যাখো না, বড়জোর এক দু' মাস। তার পরই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব।

এত সোজা নয়, দিব্যদা। সাগ্নিকের স্বর হালকা, বাড়ি গিয়ে নো বেগড়বাই। দু'বেলা ফিজিওথেরাপিতে যেন কামাই না পড়ে।

জ্ঞান দিস না। জানি কী করতে হবে। ফিজিওথেরাপি যেমন চলার চলবে, তবে আমি একটু খাড়া হতে পারলেই... ডিসেম্বরে আমার এগজিবিশন, ছবি আঁকার আগে একটা মেন্টাল প্রিপারেশন লাগবে তো। নিজেকে সারাক্ষণ ক্রিপল ভাবলে চলবে?

কিন্তু এখনও তো আপনার... রাইট সাইড...

সে তো এখন। অস্থ। এই মুহূর্তে। দ্যাখ না তোরা, এসে যাবে... জোর এসে যাবে।

দীপাঞ্জন আর পূরবীর মুখে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়। দীপাঞ্জন অস্ফুটে বলল, এই জন্যই আপনি গ্রেট, দিব্যদা। আপনার সামনে এলে আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটাও কত বেড়ে যায়।

গ্যাসট্যাস দেওয়া থামা তো। নিজের ওপর আস্থা হারালে বেঁচে থাকা যায় নাকি? বলেই দিব্যজ্যোতি সাগ্নিককে ধরেছে, তা হ্যাঁরে, গোলে হরিবোল হয়ে সুবর্ণলতার ওয়ার্কশপটা তো ভোগে গেল। কিছু করবি? নাকি করবি না?

না না, অবশ্যই হবে। আপনি সুবর্ণলতায় যাওয়ার মতো অবস্থায় এলেই...

আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? ডেট ফিক্স করে বল, সোনামাটিতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, গাড়ি তো আছেই, নিয়ে চলে যা।

যাব। অনুপল ব্যাটা হায়দরাবাদ গেছে, ফিরুক।

সময় নষ্ট করিস না। প্লিজ। ওখানকার কুমোরদের তোরা একটু গাইড করলে...

দিব্যজ্যোতি থেমে গেল সহসা। চোখ পড়েছে দরজায়। পৃথা। পরনে তুঁতে রং সিল্কের শাড়ি কাঁধে বাদামি ভ্যানিটি ব্যাগ, কপালে ছোট্ট লাল টিপ। একটু যেন ভারী হয়েছে পৃথা, চেহারায় গিন্নি গিন্নি গোছের ভরভরন্ত ভাব।

পলকের জন্য থমকেছিল দিব্যজ্যোতি, ক্ষণপরেই বাঁ হাত তুলে ডাকছে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো।

পৃথা পায়ে পায়ে ভেতরে এল। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আড়ষ্ট গলায় বলল, কেমন আছ এখন?

যা ছিলাম তার তুলনায় ফার্স্ট ক্লাস। কণাদ এল না?

ওর তো অফিস... আসবে... পরে...

তুমি কি স্কুল থেকে? ডাইরেক্ট?

পৃথা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না, অস্পষ্টভাবে হাসল।

দিব্যজ্যোতি সাগ্নিকদের বলল, একে তোরা নিশ্চয়ই চিনতে পারছিস না?

পূরবী ইতস্তত করে বলল, বোধহয় পারছি। আপনার ক্যাবিনেটে ওঁর একটা...

হ্যাঁ, ওরই ছবি। আমার প্রাক্তন স্ত্রী। পৃথা। পৃথা বসু। ওর বরকে বোধহয় তোরা চিনবি না... নাকি চিনিস... কণাদ, আমার একেবারে প্রথম দিকের ছাত্র। নিউজপেপারে আছে এখন। বলেই দিব্যজ্যোতির চোখ পৃথায়, আমাদের যেন কতদিন ডিভোর্স হয়েছে? এগারো বছর? নাকি আর একটু বেশি?

উত্তরের জন্য অবশ্য অপেক্ষায় নেই দিব্যজ্যোতি। প্রায় একই রকম অনায়াস স্বরে সাগ্নিকদের নাম পরিচয় জানাল পৃথাকে। বলল, সোনামাটিতে আমার সেরিব্রাল ইনফার্কশনটার সময়ে এই সাগ্নিক ছিল সঙ্গে। আর অনুপল। ওরাই যা করার ঝটপট করেছে, বুঝলে।

পৃথার মুখ দিয়ে একটাই শুধু ধ্বনি বেরোল, ও।

দিব্যজ্যোতি সাগ্নিকদের বলল, অ্যাই, তোরা এবার কাট তো। পৃথার সঙ্গে কত যুগ পর দেখা হল, একটু শান্তিতে গল্প করতে দে। তোরা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকলে ও তো কথাই বলতে পারবে না।

দীপাঞ্জন, সাগ্নিক আর পূরবী প্রায় দুদ্দাড়িয়ে দৌড় মারল। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠেছে, আশ্চর্য, তোমার নেচার একটুও বদলাল না!

নেচার তো মানুষের বদলায় না পৃথা। যা বদলায়, সেটা হল অভ্যেস।

সেই একই রকম কথার প্যাঁচ। পৃথা গুমগুম স্বরে বলল, জানি এরকম সিচুয়েশনে পড়তে হবে। তাই আসতে চাইনি।

তবু এসেছ তো! দিব্যজ্যোতি হাসল, মুখটা বেঁকেই রইল হাসিতে। বলল, তোমার সমস্যা কী জানো পৃথা? তুমি যেটা চাও, সেটা করো না। আর যেটা করো...

থাক। আমায় নিয়ে গবেষণা না-করলেও চলবে।... হঠাৎ ডাকাডাকি কেন?

দিব্যজ্যোতি হাসিটা মুখে ধরেই আছে, জীবনের প্রায় প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছিলাম তো... হঠাৎ ইচ্ছে হচ্ছিল তোমায় একবার দেখি। জানি, তুমি আছ কেমন!

পৃথা কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক। তারপর বলল, দেখা তো হয়েছে, এবার যাই?

কিন্তু জানা যে হল না। দিব্যজ্যোতির হাসি আর একটু চওড়া হল, তুমি সুখী হয়েছ তো পৃথা?

পৃথা গম্ভীর গলায় বলল, ঠিকই আছি।

সে তো থাকবেই। আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি সুখী হয়েছ, কি না?

কেন হব না? আমার এখন কীসের অভাব? আমার কণাদ আছে, টুকুস আছে... তারা আমায় ভালবাসে, চোখে হারায়... দিব্যি সংসার করছি...

আমি কিন্তু এত কিছু জানতে চাইনি, পৃথা। আমি শুধু...

তোমাকে বলব কেন? পৃথা দুম করে রেগে গেল, তুমি জানতে

চাওয়ার কে? কী রাইট আছে? বলেই হঠাৎ চড়ে যাওয়া মেজাজটা দ্রুত সামলে নিয়েছে, থাক না ওসব কথা। তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।

হাত বাড়িয়ে দিব্যজ্যোতিকে একবার ছুঁল পৃথা। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দিব্যজ্যোতি সেদিকে তাকালই না। চোখ বুজল।

পাঁচ

স্কট লেনের পার্টি অফিসে বসে প্রুফ দেখছিলেন অজিতেশ। একটা প্রস্তাবের খসড়া, অজিতেশেরই বানানো। বিমা আর ব্যাঙ্ক শিল্পে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ কতটা যুক্তিযুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি শেষ পর্যন্ত বিদেশি পুঁজি লগ্নিতে সম্মতি জানায় তখন কী-ই-বা ভূমিকা হবে পার্টির— মোটামুটি এটাই খসড়ার প্রতিপাদ্য বিষয়। পরশু রাজ্য কমিটির মিটিংয়ে প্রস্তাবটা পাস হয়ে গেলে মার্চের শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সেটা পেশ করা হবে। কিন্তু টাইপে এত ভুল করেছে ধীমান! শোধরাতে শোধরাতে অজিতেশের যে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল!

চায়ের কেটলি হাতে ঢুকল নকুল। টেবিলে ঠকঠক দু'খানা মাটির ভাঁড় রেখে বলল, আপনাদের বিল কিন্তু একশো টাকা পেরিয়ে গেছে জেঠু।

অজিতেশ কাগজের তাড়া থেকে মুখ তুললেন। চশমা খুলে রাখলেন টেবিলে। চোখ রগড়াচ্ছেন। টেবিলের অপর প্রান্তে চিন্ময়। একটা ঢাউস বই খুলে পাতা উলটোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কাগজ গুঁজে যাচ্ছে পাতায়। অজিতেশ ফের চশমা পরে নিয়ে বললেন, কী হে, নকুলের ওয়ার্নিং বেল শুনতে পেলে?

বছর পঞ্চাশের চিন্ময় একটা ভাঁড় তুলে চুমুক দিল, ছাড়ুন তো দাদা! ওকে তো বলাই আছে আড়াইশো না হলে পেমেন্ট দেব না।

নকুল গোঁজ মুখে বলল, গোটা পঞ্চাশেকও যদি দিতেন...

অজিতেশ বললেন, আমি দিয়ে দেব টাকাটা? তুমি না হয় আমার পরে শোধ করে দিয়ো!

দিতেই পারেন। তবে মাসখানেকের আগে কিছু পাবেন না।

অজিতেশ মুখ টিপে হাসলেন একটু। ভালমতোই জানেন, মাসখানেক কেন, কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। চিন্ময়ের ভাঁড়ার সর্বদাই শূন্য। পার্টি ভাঙতে ভাঙতে অণু-পরমাণুর দশায় চলে এলে বোধহয় এরকমই হয়। সারা রাজ্যে তাঁদের সদস্য সংখ্যা এখন চারশোও হবে কিনা সন্দেহ, ফান্ড আসবে কোত্থেকে? প্রায় প্রতি মাসেই পেনশনের টাকা থেকে এরকম দুশো-তিনশো তাঁর গচ্চা যাচ্ছে।

টাকাটা দিতে অজিতেশের আপত্তি নেই। তবে পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে বুকটা চিনচিন করে ওঠে। সেই আটাত্তর উনআশি সালে, পার্টি যখন রাজ্যে প্রায় মুছে যাওয়ার দশা, তখনও ঠিক এতটা খারাপ অবস্থা ছিল না। ভোটে হেরে গেছে নেতারা, তবু অফিসের ঠাটঠমক ভালই বজায় ছিল। মুখ শুকনো করে বসে আছে সবাই, কিন্তু চা মুড়ি শিঙাড়া এসে যাচ্ছে। আর এখন পঞ্চাশ-একশো টাকার জন্য হাপিত্যেশ করতে হয়।

অবশ্য সেই পার্টি আর অজিতেশের এই পার্টি এক নয়। পার্টি লাইন বদলে কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়ল, আর অজিতেশ পার্টি ছাড়লেন। একদা যারা ডাঙ্গের প্রতিটি বাণীকেই অমৃতসমান মনে করত, তারা ডাঙ্গের লেজুড় হওয়ার অপরাধে অজিতেশকেই পার্টি থেকে বের করে দিল। ডাঙ্গে আর তাঁর কন্যার রাজনীতিতেও থিতু হতে পারলেন না অজিতেশ, চোখা চোখা প্রশ্ন তোলার অভিযোগে সেই ছাদটাও গেল। এখন নতুন পার্টিতে... নতুনই বা কোথায়, নয় নয় করে পনেরো বছর হয়ে গেল... কোনওক্রমে টিকে থাকা। এখানে আর কিছু না হোক, নিজের মতটুকু তো জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারেন। তিয়াত্তর বছর বয়সে এটুকুই বা কম কী!

নকুলকে টাকাটা দিয়ে আবার কাজে মনোযোগী হলেন অজিতেশ। এক হাতে খচখচ কলম চালাচ্ছেন, অন্য হাতে চায়ের ভাঁড়। বড়জোর

মিনিট পনেরো, আঙুলের সঙ্গে সঙ্গে চোখও এবার বিদ্রোহ শুরু করেছে। চশমা নামিয়ে চোখের মণি দুটো টিপলেন আস্তে আস্তে। সম্প্রতি শিখেছেন ব্যায়ামটা। কাজ হয়, টনটনানি কমে একটু।

চিন্ময় আড়ে আড়ে দেখছিল অজিতেশকে। জিজ্ঞেস করল, থকে গেলেন নাকি, অজিতদা?

একটু।

আর ক'পাতা বাকি?

তিনটে শিট।

আজ তা হলে ছেড়ে দিন। কাল দুপুর দুপুর এসে দেখে দেবেন, ধীমান সন্ধেবেলা কারেকশন টারেকশন করে প্রিন্টআউট বের করে নেবে।

ম্যাটারটা আজই দিয়ে দিতে পারলে ভাল হত না? ফাইনাল প্রিন্ট বের করার আগে কাল আর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারতাম। নইলে ধীমানের যা কাজের ছিরি, কত ভুল যে থেকে যাবে!

না না, ধীমান যথেষ্ট সিরিয়াস, দেখে বুঝেই করবে।

ঘোড়ার মাথা করবে। তোমাদের, আজকালকার ছেলেদের, আমার চেনা আছে। মুখে ফটর ফটর করবে, সভাসমিতিতে জ্বালাময়ী ভাষণ দেবে, অথচ আসল কাজের বেলায় ঢুঢু। কিছু মনে কোরো না চিন্ময়, ধীমান আজ নেতা হয়েছে বটে, আমাদের যৌবনকালে পার্টি কিন্তু ধীমানদের দিয়ে মাইকটেস্টিংয়ের বেশি কিছু করাত না। এ-কথা আমি ধীমানকেও সামনাসামনিই বলি।

সত্তরোর্ধ্ব অজিতেশের চোখে পঞ্চাশোর্ধ্ব আজকালকার ছেলে চিন্ময় হোহো হাসছে, আপনার যৌবনকালের কথা ভুলে যান, অজিতদা। ধীমানকে যতই হেলাফেলা করুন, ও যে ক্রাউডপুলার এটা তো মানবেন। যে-ক'টা লোক আমাদের মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সে তো ওই ধীমানের জন্যই। এর পর পার্টির কী হবে, ভাবুন তো! আমাদের পিছনটা তো ফাঁকা। নো পরের জেনারেশন।

এটা তো তোমাদের ত্রুটি। পরের প্রজন্মকে তোমরা কনভিন্স করতে পারছ না।

কেন মনকে চোখ ঠারছেন, দাদা? এখন কোথায় ক'টা ক্যাডার আদর্শের টানে আসে? সিপিএমই বলুন, কি কংগ্রেস, তৃণমূল, যেখানে যত ইয়াং ছেলে গিয়ে পিলপিল করে ভিড়ছে, তারা মার্কসবাদ বোঝে, না গাঁধীবাদ? কিস্যু না। বুঝে তাদের ঘেঁচুটা হবে। তারা পার্টিতে আসছে কিছু এক্সপেক্টেশন নিয়ে। সেটা চাকরি হতে পারে, ক্ষমতা হতে পারে. কিংবা কোনও না-কোনওভাবে রুটিরুজির একটা সিকিওরড বন্দোবস্ত...

আশায় বাঁচে চাষা। কটা ছেলে পার্টি করে চাকরি-বাকরি পাচ্ছে, অ্যাঁ?

দেবে কোত্থেকে? চাকরি আছে নাকি? চিন্ময় চেয়ারে হেলান দিল, তবে আশাটা তো দিতে পারছে। আশা সাপ্লাই করার ক্ষমতাটুকু তো পার্টিগুলোর আছে। সে জায়গায় আমরা? স্টেটে ফ্রন্টের পোঁ ধরে নেই, সেন্ট্রালে আমাদের মাইক্রোস্কোপেও দেখা যাচ্ছে না, এস-ইউ-সি, টেস-ইউ-সি'র মতো লড়কে লেঙ্গে করে মাস বেস তৈরি করতে পারি না, শক্তিশালী বিরোধীপক্ষও নই... এখনকার ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছে আসবে কেন?

তা হলে আর কী, পার্টি তুলে দাও। কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সুতো তো বাঁধাই আছে, সবাই মিলে সেখানেই ভিড়ে যাক।

চিন্ময় ধূর্তের মতো হাসল, ধুত, তা হয় নাকি! বড় দলে গিয়ে চুনোপুঁটি হয়ে থাকার চেয়ে নিজেদের ছোট দলে বড়সড় থাম হয়ে থাকা অনেক বেশি সম্মানের। এখনও ইলেকশনের আগে কংগ্রেসের চাঁইরা দস্তুরমতো খাতির করে আমাদের ডাকে, পরামর্শ টরামর্শ চায়... ওদের দলে মিশে গেলে থোড়াই আমাদের পুঁছবে!

অজিতেশ ঝুম হয়ে গেলেন। চিন্ময় ভুল বলেনি। এরকম একটা যুক্তি তাঁর অবচেতনেও কি খেলা করে বেড়ায় না? বেটার টু রেইন ইন হেল, দ্যান টু সার্ভ ইন হেভেন...! তা ছাড়া সেই কোন বাহান্ন-তিপান্ন সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি করছেন তিনি, এক ধরনের নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে এখন আদর্শগত পার্থক্য যতই কমে আসুক, ওদের ওই ঢিলেঢালা সংস্কৃতিতে তিনি কখনও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবেন না। তিনি তো আর গিরগিটি নন যে, যেমন খুশি

রং বদলে ফেলবেন! তার চেয়ে এই ভাল, গায়ে একটা মার্ক্সবাদী গন্ধ নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া।

আর ক'টা দিনই বা? পাঁচ বছর? সাত বছর? কি দশ?

চিন্ময় হাত বাড়িয়েছে, দিন, কাগজগুলো তুলে রাখি।

দু'-চার সেকেন্ড তবু চোখ কুঁচকে ভাবলেন অজিতেশ। বললেন, না হে, আমরা ব্যাকডেটেড লোক তো, কাজ হাফফিনিশড্ রেখে যেতে মনটা খুঁতখুঁত করছে।

বেশ, তবে দেখুন আস্তে আস্তে।

হাতের কাজ শেষ হতে হতে প্রায় পৌনে সাতটা। তারও মিনিট দশেক পর কাঁধের ঝোলাটি গুছিয়ে প্রাচীন বাড়িটার স্যাঁতসেঁতে ঘরখানা ছেড়ে বেরোলেন অজিতেশ। একতলার দু'খানা ঘর নিয়ে তাঁদের অফিস। কলকাতা জেলা কমিটির, রাজ্য কমিটিরও। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একটা দপ্তর ছিল এখানে। দল ভাঙাভাঙির পরেও ঘর দুটোকে কোনওক্রমে কবজায় রাখতে পেরেছিলেন অজিতেশরা। নামমাত্র ভাড়া, মাসে তিরিশ টাকা। বাড়িওয়ালাও ঝামেলাবাজ নয়, কলকাতা শহরে তার আরও বাড়ি আছে, অজিতেশদের উৎখাত করার জন্য তার আদৌ কোনও ব্যস্ততা নেই। বোধহয় টের পেয়ে গেছে, এরা নিজেরাই ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে। লাভ হয়েছে চিন্ময়ের। সে পার্টির একমাত্র হোলটাইমার, বিয়ে-থা করেনি, পার্টির অফিসই তার ঘরসংসার।

চিন্ময়ও বেরিয়েছে অজিতেশের সঙ্গে। কলেজ স্ট্রিটে তার একটা নিজস্ব আড্ডা আছে, যাবে সেখানে। খানিক দূর পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন অজিতেশ। বাসটাসে খুব একটা চড়েন না পুরনো কলকাতার গন্ধমাখা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে তাঁর বেশ লাগে। ধবধবে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা রোগা লম্বা শরীর ঈষৎ ঝুঁকিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে চলেছেন তিনি, ফাল্গুনের হাওয়ায় উড়ছে তাঁর শুভ্র কেশ। সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়ে এসে দাঁড়ালেন মিষ্টির দোকানের সামনে, গোটা পাঁচেক রসগোল্লা কিনলেন। বয়সের কারণে খাওয়া দাওয়ায় অনেক বাঁধাবাঁধি এসে গেছে,

কিন্তু এই মিষ্টির আসক্তিটুকু ছাড়তে পারেননি। রাতে খাওয়ার পাতে একটা রসগোল্লা তাঁর চাইই চাই।

মোড় থেকে অজিতেশের বাড়ি মাত্র কয়েক পা। ভাগের বাড়ি। একতলার সামনের দিকটা অজিতেশের। প্রায় রাস্তার গায়েই দরজা। অজিতেশ ঢুকে দেখলেন টিভি চলছে বসার ঘরে, গৌরী খবর শুনছেন। এক কাঁড়ি খবরের চ্যানেল হয়েছে ইদানীং, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব চ্যানেলেরই খবর শোনেন গৌরী। নেশা।

রসগোল্লার ভাঁড় খাবার টেবিলে রেখে শোওয়ার ঘরে গেলেন অজিতেশ। পাঞ্জাবি খুলে ব্র্যাকেটে ঝোলাতে গিয়ে হঠাৎই চোখ পড়ল মেঝেয়। বড় কালো বাক্সখানা শোভা পাচ্ছে ঘরের মধ্যিখানে। অজিতেশ প্রশ্ন ছুড়লেন, কী গো, হারমোনিয়ামটা বাইরে কেন?

টিভি বন্ধ করে গৌরী এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। হেসে বললেন, ঝাড়াঝুড়ি করছিলাম। টেনে বের করতে গিয়ে কোমর বেঁকে গেছে, আর ঢোকাতে পারিনি।

অনেকটা পথ হেঁটে অজিতেশের চিত্ত এখন বেশ প্রফুল্ল। হালকা গলায় বললেন, ঢোকানোর দরকার কী? বহুকাল পর বেরিয়েছে যখন, আজ একটু গানটান হোক না।

তুত্, আমার কি আর দম আছে? বছরে এগারো মাস হাঁপাচ্ছি...। তোমার শখ হয় তো তুমিই বসে যাও।

আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক। গীতিকার, সুরকার। গায়ক-গায়িকা তো তোমরা।

ছিলাম। সবটাই পাস্ট টেন্স। তোমারও। আমারও।

হুম। কতকাল যে আর নতুন গানটান আসে না! একটু যেন আনমনা দেখাল অজিতেশকে, সব কিছুই কেমন চেঞ্জ হয়ে গেল! একসময়ে গান ছিল ওয়েপন, ভাবতাম গান দিয়েই সমাজটাকে বদলে ফেলব। কী বোকা যে ছিলাম!

আসল কাজটা তো করেছিলে। গৌরীর চোখেমুখে যুবতীর কৌতুক, মাঠেঘাটে গান শেখানোর ছলে আমাকে গেঁথে ফেলতে তো ভুল হয়নি।

তোমার মনে আছে?

মেমরি লস করার মতো দশা তো এখনও হয়নি।... দাও, বাক্সটা ঢুকিয়ে দাও। আমি চা করে আনছি।

বাক্সটাকে ঠেলে খাটের তলায় পাঠিয়ে বিছানায় বসলেন অজিতেশ। অনেক কাল পর নিজেরই লেখা একটি গণ-সংগীতের সুর ভাঁজছেন। দু'-এক কলি গেয়ে উঠেও থেমে গেলেন। আবার ভার হয়ে আসছে বুক। কত উত্তাল সময় যে পার হয়ে এসেছেন! গণনাট্য সংঘের রাজ্যশাখার গানের দিকটা তো তিনি একাই সামলেছিলেন বেশ কয়েক বছর। কত কাজ তখন, কত কাজ! একটার পর একটা ইস্যুতে পার্টি ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাস্তায়, মিটিংয়ে রক্ত গরম করা নতুন নতুন গান চাইছে...। সুভাষদাকে দিয়ে তখন গান লিখিয়ে নিচ্ছেন অজিতেশ, দীনেশদা কবিতায় সুর করছেন...। অজিতেশ নিজেও বসে পড়ছেন কলম নিয়ে। তেলেঙ্গানা, তেভাগা, শরণার্থী সমস্যা, শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক আন্দোলন, ট্রাম-বাসের ভাড়া বাড়ানো নিয়ে লড়াই, ফুড মুভমেন্ট... পার্টি আড়াআড়ি ভেঙে গেছে, তবু কাজে কামাই নেই। দিনগুলোকে তখন কত ছোট মনে হত। এই আসছে, এই চলে যাচ্ছে! স্কুলের চাকরিটা বজায় রেখেও কী করে যে সামাল দিয়েছেন অজিতেশ! ভাগ্যিস গৌরী ছিল পাশে পাশে! পথেও। ঘরেও। সংসার করার কণামাত্র ঝক্কি তাঁকে বইতে দেয়নি গৌরী। খুকু যে কীভাবে বড় হল, স্কুল কলেজ পাশ করল, অজিতেশ টেরও পেলেন না।

সেই ব্যস্ত অজিতেশ এখন প্রায় স্থবির। শরীরে না হলেও মনে তো বটেই। কত বছর যে আর গান আসে না। লেখার তাগিদই অনুভব করেন না কোনও। কী একটা যেন শুকিয়ে গেছে ভেতরে! কী-ই যে!

গৌরী কাপ প্লেট হাতে ঘরে এসেছেন। অজিতেশের হাতে চা-টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আবার মীরাদি ফোন করেছিল।

ঝপ করে নামটা ঠিক ঠাহর করতে পারল না মগজ। অজিতেশ ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছেন।

গৌরী বসলেন পাশে। বললেন, দিব্য কাল নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়েছে।

এবার মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। অজিতেশ আলগাভাবে বললেন, তো?

তো আবার কী? জাস্ট খবরটা শুনলাম, তাই তোমায় জানাচ্ছি।

আমি জেনে কী করব? সে বেঁচে থাকলেই বা কী? মরে গেলেই বা কী?

ছি, ওভাবে বলতে নেই। বেচারা প্রায় মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এল...

বেচারা বেচারা কোরো না তো। দিব্যর ওপর আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই।

তোমার সব এক্সপ্রেশনই বড় চড়া চড়া বাপু। হয় নীচের সা, নয় ওপরের সা, মাঝে যেন আর কিচ্ছু নেই। গৌরী লঘু স্বরে বলল, এখনও এত খেপে থাকার কী আছে? যাকে নিয়ে বিবাদ, সেই খুকু পর্যন্ত গিয়ে দেখে এল...

গেছিল নাকি!

হ্যাঁ। কবে যেন? এই বোধহয় তিন-চার দিন...

আমায় বলোনি তো!

আমিই তো আজ জানলাম। দিব্যর নিউজটা দেওয়ার জন্য ফোন করেছিলাম, তখনই বলল।

ভাল। মা দিব্য দিব্য করে উচাটন, মেয়ে অত অপমানের পরেও তাকে দেখতে যাচ্ছে... তোমরা পারোও বটে।

না-পারার কী আছে? মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন কেউ পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসে না।

ওসব রুল মানুষের বেলায় খাটে। বাট দিব্য ইজ নট এ হিউম্যান বিয়িং। ওকে তুমি হায়না বলতে পারো, নেকড়ে বলতে পারো, টিকটিকি গিরগিটি যা-খুশি বলতে পারো, কিন্তু মানুষ বোলো না।

অজিতেশের ফরসা মুখখানা লাল হয়ে গেছে চকিত উত্তেজনায়। গৌরী অবাক স্বরে বললেন, তোমার এখনও দিব্যর ওপর এত রাগ? কেন?

না, রেপ নয়। আই সিম্‌পলি হেট হিম।

কেন? তোমার মেয়েকে কষ্ট দিয়েছে বলে?... মানছি, দিব্যর চরিত্রে অনেক গন্ডগোল ছিল। অনাচারও সে কম করেনি। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলো তো, তোমার মেয়েও কি একশো ভাগ ধোওয়া তুলসীপাতা ছিল? দিব্যর বউ থাকা অবস্থাতেই দিব্যর ছাত্রর সঙ্গে...। কণাদ আজ আমাদের জামাই। সে ভাল ছেলে। তাকে আমরা খুব পছন্দও করি।... তবে ওই সময়ে ওদের রিলেশন তৈরি হওয়াটাকে কি ন্যায় কাজ বলা যায়?

আমি দিব্য আর খুকুর মধ্যে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্টেড নই। কেটে কেটে বললেন অজিতেশ, খুকুকে জিজ্ঞেস করে দেখো, কখনও জানতে চেয়েছি কিনা। তুমি বলে গেছ, আমি শুনে গেছি, ব্যস। তবে হ্যাঁ, খুকুর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। কিন্তু আমি ওকে ঘেন্না করি অন্য কারণে। ওর মতো লোভী আর রুথ্‌লেসলি অ্যাম্বিশাস আমি জীবনে আর দুটো দেখিনি।

বুঝেছি। গৌরী ফিক করে হাসলেন, দিব্য তোমার পিছু পিছু পার্টি ছাড়তে রাজি হয়নি তো, তাই এত চক্ষুশূল।

তুমি আমাকে এত মিন ভাবলে? এতকাল দেখার পরেও? অজিতেশ রীতিমতো আহত, কত কমরেডই তো রয়ে গেছে পুরনো পার্টিতে, তাদের কারও সম্পর্কে আমি এমন কমেন্ট করি? কখনও করেছি?

গৌরী থতমত খেয়েছেন। বিড়বিড় করে বললেন, তা হলে আর কী কারণ থাকতে পারে?

থাক। আর ভাবতেও ভাল লাগে না।

তবু শুনি?

তোমরা দিব্যকে চেনোই না। তাকে তোমরা তো দেখেছ ঘরের মধ্যে। অ্যাজ জামাই।

তার আগেও দেখেছি। এ-বাড়িতে তো প্রায় প্রতিদিনই আসত। তোমার মেয়ের সঙ্গে তখন প্রেমপর্ব চলছে...। গৌরীর গলায় যেন সামান্য উপহাস, ভাব তোমার সঙ্গেও কিছু কম ছিল না। খুকুকে কলেজ থেকে তুলে নিয়ে এসে খুকুর থেকেও খুকুর বাবার সঙ্গে তার বেশি

আড্ডা জমত। তুমি তাকে নিয়ে এখানে যাচ্ছ, সেখানে যাচ্ছ...

ওটাও তোমার ঘরে বসেই দেখা, গৌরী। ওপর ওপর আলগা আলগা।

তুমিই বুঝি একমাত্র ভেতর থেকে দেখেছিলে? দিব্যর অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত!

ব্যঙ্গটা বিঁধল অজিতেশকে। তবে উত্তেজিত হলেন না। চোখ থেকে খুলেছেন চশমা। মুখের ভাপে আবছা হল চশমার কাচ, পরনের গেঞ্জি দিয়ে ঘসে ঘসে মুছলেন বাষ্প। দু'দিকে মাথা দুলিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, নাহ্, আমিও তখন কিছুই দেখতে পাইনি। তা হলে হয়তো আত্মীয়তার সূত্রে জড়াতে দ্বিধা করতাম।... ঠিকই বলেছ, আমিও ওর কম অ্যাডমায়রার ছিলাম না। কী চমৎকার প্রাণবন্ত ছেলে, পার্টির হয়ে কার্টুন আঁকছে, পোস্টার বানাচ্ছে, উদাত্ত গলায় গান গাইতে পারে ভাল না-লেগে উপায় আছে? তখনও কি বুঝেছি, চারপাশের প্রত্যেকটি মানুষকে ও কীভাবে ইউটিলাইজ করছে, এক্সপ্লয়েট করছে...! কত জোগাড়যন্ত্র করে, সেন্ট্রাল কমিটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওর মস্কো যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। আমায় তখন কী তেলটাই না মেরেছে! সলিল চৌধুরীর পরে আমার মতো আর একটাও প্রতিভা নাকি গণনাট্য সংঘ পায়নি! আমার মতো নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী নাকি গোটা দেশে বিরল! আমার মতো র‍্যাশনাল থিঙ্কার নাকি দেখাই যায় না!... আশ্চর্য, বারবার শুনতে শুনতে আমিও ছাগলটাকে কুকুর ভাবতে শুরু করেছিলাম। কী শাহেনশা ছেলে, এক বছরের স্কলারশিপ নিয়ে গিয়ে পাক্কা তিনটে বছর কাটিয়ে এল!

তা এতে দোষের কী আছে? গৌরী চোখ ঘোরালেন, মস্কো থেকে টাকা জমিয়ে সে ফ্রান্স ইতালিতে দু'-এক বছর থেকে আসতেই পারে।

অবশ্যই পারে।... তবে যেটা তুমি জানো না সেটা জেনে রাখো, কন্টিনেন্ট যাওয়াই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্যারিসে যাওয়ার জন্য আগে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের স্কলারশিপের চেষ্টা করেছিল, পায়নি। তখনই ও পার্টির রুটটা ধরে। এবং আমার চ্যানেলটাকেই ইউজ করে।

ওমা! এসব আজগুবি ধারণা তোমার কোত্থেকে হল?

না গো, আজগুবি নয়। দিজ আর ফ্যাক্টস্। আমায় বীরেনদা বলেছিলেন। খুকুর সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাওয়ার সাত-আট বছর পর। আমি আর বীরেনদা তখন এক পার্টিতে নেই, দিব্যও বীরেনদার পার্টিতেই, তবু বলেছিলেন। খামোখা মিছে কথা বীরেনদা বলবেন কেন? এবং শুনলে অবাক হবে, আমি দিব্যজ্যোতি সিংহকে একদিন সরাসরি জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য। সে আমাকে হাসতে হাসতে বলে দিল, কিছু অ্যাচিভ করতে গেলে কাউকে না-কাউকে তো ধরতেই হয়। আর আমি তো আপনাকে ঠকাইনি, ফিরে এসে আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি। আপনার কি মনে হয় না, এটা একটা ফেয়ার ডিল?

যাহ্, দিব্য নিশ্চয়ই ওটা মজা করে বলেছিল। তোমার সঙ্গে তো ওর এরকম হাসিমশকরা চলতই।

জানতাম এরকমই কিছু বলবে। তাই তোমাকেও জানাইনি। খেয়াল করে দ্যাখো, শেষের দিকটায় আমি ওর সঙ্গে কথা বলতাম না। দিব্য এলেই কোনও না-কোনও অছিলায় বেরিয়ে যেতাম বাড়ি থেকে। ভাবতে পারি না, আমাকেই সিঁড়ি করে... ওফ্, কী অপমান!

আহা, ওভাবে দেখছ কেন? হবু জামাই তো শ্বশুরের কাছ থেকে একটু-আধটু ফেভার নিতেই পারে।

তার জন্য আমায় সরাসরি অনুরোধ করলেই তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা তো ও করেনি। আমাকে মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়েছে, ফাঁপিয়েছে। ওই বীরেনদাকেই ও পরে বলেছে, আমার মতো বোদা লোকগুলোর জন্যই নাকি গণনাট্য আস্তে আস্তে মরে গেল। আমি বেরিয়ে যাওয়ায় দল নাকি একটা ইউজলেস এলিমেন্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে।

বীরেনদা এটা নির্ঘাত বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন। তোমাকে তাতানোর জন্য। দিব্য এরকম বলতে পারে আমি বিশ্বাসই করি না।

এটাই তো তোমাদের দিব্যর সাকসেস। আমার থেকেও তুমি তাকেই

বেশি বিশ্বাস করবে। আরও একটা কথা শুনবে? বীরেনদা একটা দৈববাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, বীরেনদার পার্টিকেও যতটা দরকার ছিল, ও নিংড়ে নিয়েছে। এবার বড় নাওয়ে খুঁটি বাঁধবে। দু'বছরের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। দিব্যি কায়দা করে ও সরে গেল বড় শরিকের কাছে। এত তো খবর শোনো, কাগজ পড়ো, নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, গত পাঁচ সাত বছর ধরে কাদের সঙ্গে ওর ছবি বেরোচ্ছে? সেই সব নেতাবন্ধুরাও দিব্যি খুব পুলকিত, দ্যাখো কত বড় এক আর্টিস্টকে আমরা দলে পেয়েছি! আমাদের ফেভারে দিব্যজ্যোতির মতো আর্টিস্ট ইলেকশন ক্যাম্পেন করছে, যে-কোনও ইস্যুতে আমাদের হয়ে কথা বলছে ...! আসলে তো ও সেখানেও নেই। গোটাটাই ফক্কিকারি। ধান্দাবাজি। মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কেমন বিশাল একটা জমি বাগিয়ে নিল হাওড়ায়।

গৌরী বললেন, সে তো মানুষের ভালর জন্যই। গ্রামের মেয়েদের উন্নয়ন টুন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে...

ওটা তো বাইরের শো। আদতে করে কী জানো? গাঁয়ের মেয়েবউদের দিয়ে কম পয়সায় দেখনদারি সব জিনিস বানায়, আর চড়া দামে সেগুলো বেচে। কলকাতায় ওর কাস্টমার কম। ওর মাল বেশির ভাগই যায় দিল্লি বম্বে বাঙ্গালোর...। লন্ডন নিউ ইয়র্কেও পাঠাচ্ছে। স্রেফ মুনাফাদারি বিজনেস। লোককে বলে বেড়ায়, লাভের প্রতিটি পাইপয়সা নাকি ওর প্রতিষ্ঠানকে বড় করার জন্যই...! হুঁহ্, আমি বিশ্বাস করি না।

গৌরী আর কোনও বাদানুবাদে গেলেন না। খালি কাপ প্লেট নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে। অজিতেশও উঠে এলেন বসার ঘরে। বুকটা সামান্য হালকা হালকা লাগছে। কত দিনের জমা ক্ষোভ যে উগরে দিতে পারলেন আজ! ক্ষোভ? নাকি যন্ত্রণা?

সাবেকি বেতের সোফায় বসে খবরের কাগজখানা উলটোলেন আর একবার। বাইরে সান্ধ্য কোলাহল, কান পেতে শুনলেন একটু। রিকশার টুংটাং, গাড়ির হর্ন, মানুষের গুঞ্জন মিলেমিশে এক বিচিত্র ঐকতান তৈরি হচ্ছে। পাশের বাড়িতে প্রেশার কুকারের সিটি বেজে উঠল, ওই তীব্র

ধ্বনিও যেন মিশে গেল অর্কেস্ট্রায়। ইস, এইসব জ্যান্ত আওয়াজকে ধরেবেঁধে যদি একটা কম্পোজিশন তৈরি করা যেত!

কাল্পনিক তালবাদ্যের ঝংকারে খানিকক্ষণ বুঁদ হয়ে রইলেন অজিতেশ। সংবিৎ ফিরল গৌরীর ডাকে, কী গো, এবার খাবে তো?

কটা বাজে?

পৌনে ন'টা।

এক সময়ে রাত্তির সাড়ে এগারোটা-বারোটার আগে খেতে বসার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না অজিতেশ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সময়টা কেমন এগিয়ে এল। নাকি ব্যস্ততা কমে আসায়? উদাস গলায় বললেন, রুটি হয়ে গেছে?

এই তো বানালাম।

লাগাও তবে।

তিনখানা ঘর আর বাথরুম রান্নাঘরের মাঝে ফালি জায়গাটুকুতে ছোট খাবার টেবিল। মুখোমুখি বসেছেন স্বামী-স্ত্রী। ক্যাসারোল খুলে রুটি বার করতে করতে অজিতেশ বললেন, হ্যাঁগো, টুকুসের পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে না?

হ্যাঁ। সামনের মঙ্গলবার অবদি চলবে।

কেমন দিচ্ছে?

ওইটুকু ছেলের আবার ভাল-খারাপ দেওয়া!

কিন্তু তোমার মেয়ের কাছে তো সেটা খুব বিরাট ব্যাপার।

খুকুর তো টেনশন করাটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

স্বাভাবিক। এক সময়ে নার্ভের ওপর তো কম ধকল যায়নি।

হুঁ।

আর কোনও কথা নেই, চুপচাপ খাচ্ছেন স্বামী-স্ত্রী। অতি সামান্য আয়োজন। রুটি আর আলু পনিরের সবজি। এবং একটি মিষ্টি। রাতের আহার হালকাই পছন্দ করেন অজিতেশ। ডিম মাংস খাওয়া অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন, পনির টনিরই এখন তাঁর প্রিয় আইটেম। তা ছাড়া সাধ্যেরও তো একটা ব্যাপার আছে। বাড়িভাড়া লাগে না ঠিকই, কিন্তু

স্কুলমাস্টারের পেনশনে খুব বেশি বড়মানুষি করা যায় কি? বুড়ো বয়সে অসুখ বিসুখের জন্যও তো কিছু না-কিছু সঞ্চয় রাখতে হয়।

টেবিলে জল নিতে ভুলে গিয়েছিলেন গৌরী। উঠে রান্নাঘর থেকে জগটা নিয়ে এলেন। বসে আলগোছে গলায় জল ঢাললেন একটু। হঠাৎই বলে উঠেছেন, তোমায় একটা প্রশ্ন করব? রাগ করবে না তো?

কী?

আচ্ছা এমন নয় তো, দিব্য তোমাকে মই করে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে, আর তুমি একটা অনেক বড় জায়গা থেকে গুটোতে গুটোতে ক্রমশ লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছ... সেই জন্যই তোমার দিব্যর ওপর এত রাগ?

অজিতেশ স্থির হয়ে গেলেন। সাতচল্লিশ বছরের পুরনো স্ত্রীর মুখ থেকেও এই কথা তাঁকে শুনতে হল! এটাও কি তাঁর প্রাপ্য ছিল? হয়তো!

ছয়

সবজিখেতের দিকে তাকিয়ে থাকলে পেট ভরবে, ম্যাডাম? স্যুপ যে জুড়িয়ে গেল।

রোহিণী শার্সি থেকে চোখ ফেরাল। কাগজের গ্লাসটা নিল সোহমের হাত থেকে। ঠোঁট ছুঁইয়েই নাক কুঁচকেছে, টেস্টলেস্।

সোহম কৌতুকস্বরে বলল, আমার তো দারুণ লাগছে। গুড সাবস্টিটিউট অফ টি।

চায়ের বিকল্প এই সিন্থেটিক টোম্যাটোর জল? ছি।... দ্যাখো না, আর একবার চা পাও কিনা।

এত ঘনঘন চা খেয়ো না, ম্যাডাম। সোনার অঙ্গে কালি পড়ে যাবে।

রসিকতাটা রোহিণীর গা-সওয়া। হসপিটালে সারাক্ষণই এরকম মন্তব্য করে সোহম। যদিও সে নিজে রোহিণীর চেয়ে বেশি চা খায়।

অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরোলে তো বড় একখানা মগ নিয়ে বসে পড়ে। এবং তার গায়ের রং রোহিণীর মতো টকটকে না হলেও কম ফরসা নয়। আগে আগে রোহিণী ফরফর করে বলত, ডাক্তার হয়ে এসব উদ্ভট কথা বলতে তোমার জিভে আটকায় না? আজকাল হাসে, বুঝি-বা সূক্ষ্ম স্তুতিটুকু উপভোগ করে।

ভ্রূকুটি হেনে রোহিণী বলল, ফাজলামি রাখো। যাও, একটা চা-ওয়ালা খুঁজে বের করো।

রাজধানী এক্সপ্রেস ভালই গতি নিয়েছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সোহম টলে গেল সামান্য। টু টায়ারের ওপরের বার্থ খামচে সামলাল নিজেকে। এগোচ্ছে প্যাসেজ ধরে।

রোহিণী দু'-তিনটে চুমুক দিয়ে সিটের নীচে নামিয়ে রাখল গ্লাসখানা। দৃষ্টি ফের ট্রেনের বাইরে। শ্যাওলা সবুজ কাচের ওপারে সন্ধে এখনও পুরোপুরি নামেনি, দিনশেষের আলোয় ওপারের পৃথিবীটাকে কেমন বিষণ্ণ বিষণ্ণ দেখায়। যেন দ্রুত অপস্রিয়মাণ গাছপালা মাঠঘাট বাড়িঘরে দুঃখের একটা পাতলা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ।

বিষাদটা রোহিণীর মধ্যেও চারিয়ে যাচ্ছিল। কেন যে সে চলেছে কলকাতায়? দিব্যদার মতো এক প্রবল পুরুষ পড়ে আছে বিছানায়, প্রায় পঙ্গু হয়ে, এ দৃশ্য দেখাও তো যেচে কষ্ট পাওয়া। তবে কি কষ্টের দিকে ধেয়ে যাওয়াটাই তার নিয়তি?

সোহম ফিরেছে। ধপাস করে বসে পড়ল পাশে। বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, সরি ম্যাডাম। এখন চা কফি কিচ্ছু নেই, সোজা ডিনার।

সে কী? রাজধানীতে চা পাওয়া যাবে না?

তোমার ইচ্ছেমতো সময়ে পাবে না। প্যান্ট্রি-কার যখন বানাবে, তখনই...

কোনও মানে হয়!

এই জন্যই তো বলেছিলাম, ট্রেন ফেন ছাড়ো, চলো ফ্লাইট পাকড়াই। আকাশে ইটস ওনলি আ ম্যাটার অফ টু আওয়ারস্।

আমার অত পয়সা নেই।

আজকাল তো প্লেনে সস্তার টিকিটও মেলে। চাইলে আমার ট্রাভেল এজেন্টকে লেলিয়ে দিতাম। সোহম চোখ নাচাল, এত কিপটেমি করো কেন, অ্যাঁ? হসপিটাল তো মাইনে তোমায় কম দেয় না!

আমার মাইনেটুকুই সম্বল, স্যার। ফ্ল্যাটের লোন শোধ করতে হচ্ছে, মা'র ট্রিটমেন্টের জন্য একটা স্টেডি খরচা আছে...। আমি তো তোমার মতো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি না, দিনে তিনটে-চারটে করে পেটও কাটি না।

কামাচ্ছি বলে জেলাস? সোহম কামরা কাঁপিয়ে হেসে উঠল। পরক্ষণে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করছে, ওপেন অফার তো দেওয়াই আছে, ম্যাডাম। চলো, জয়েন্ট ভেনচার হো যায়ে। আমি গাইনি, তুমি পেডিয়াট্রিশিয়ান, মোস্ট আইডিয়াল কম্বিনেশন। মাগুলো আমার, বাচ্চারা তোমার। ইটস আ ফিফটি ফিফটি ডিল, আই প্রমিস।

দিব্যি কেমন হাসিঠাট্টার ছলে মনের গভীর বাসনাটা প্রকাশ করতে পারে সোহম! কে বলবে এই মানুষটার একটা মর্মান্তিক অতীত আছে? এবং সেই ক্ষত এখনও সম্পূর্ণ শুকোয়নি?

রোহিণী শুকনো হাসল। অন্যমনস্ক চোখ সামনের বার্থে বসে থাকা বয়স্ক অবাঙালি দম্পতির দিকে। সোহম আবার নতুন করে রোহিণীর সঙ্গে জীবনটা শুরু করতে চায়। বছর খানেক ধরেই বলছে। তার ময়ূরবিহারের ফ্ল্যাটে গিয়ে মা'র কাছেও ঠারেঠোরে পেড়ে এসেছে কথাটা। ইঙ্গিত বুঝে মা-ও খোঁচাতে শুরু করেছে, আর কতদিন রুনি, বয়স তো গড়িয়ে গেল, এবার বিয়েটা সেরে ফ্যাল। মা'র ধারণা, রোহিণীও সোহমকে পছন্দ করে বসে আছে। স্রেফ গড়িমসি করে নষ্ট করছে সময়।

মা'র ধারণা কি একেবারেই ভুল? সোহমকে কি রোহিণী অপছন্দ করে? উঁহুঁ, তা তো নয়। বরং বলা যায় তার তেরো বছরের দিল্লি প্রবাসে সোহমই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে একটু প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে সে। ভিড়ের মাঝেও একাও। সোহমকে ভাল না-লাগার তো কোনও কারণও নেই। ভদ্র, মার্জিত, রসবোধ আছে... সবচেয়ে বড় কথা, রোহিণী সামান্যতম অসুবিধেয় পড়লেও সোহম ছায়ার মতো পাশে। এই

শীতের আগের শীতে, মা'র বুকে কফটফ বসে প্রায় যাই যাই দশা, ফোন পেয়ে রাতদুপুরে সেই কালকাজি থেকে দৌড়ে এল, মাকে গাড়িতে তুলে সোজা হাসপাতাল। যে ক'দিন মা সেখানে, নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বারবার ফোন করছে, দেখে যাচ্ছে...। রোহিণীর মানসিক চাপ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল সেই সময়ে। ভালবাসে রোহিণীকে, কিন্তু কখনও উচ্চকিত নয়। এই যে প্র্যাকটিস্ শিকেয় তুলে রোহিণীর সঙ্গে কলকাতা চলেছে, মুখে বলছে বটে বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, কিন্তু আদতে তো তা নয়। বাবা-মা'র কাছে যাওয়াটা নিছকই ছদ্ম আবরণ, রোহিণীর সঙ্গ পেতেই...

কেয়া হুয়া? অচানক খামোশ কেন, ম্যাডাম?

রোহিণী আনমনে গ্রীবা হেলাল।

পার্টনারশিপ ডিডের ক্লজ তৈরি করছ নাকি মনে মনে?

আমাকে কি অত হিসেবি মনে হয়?

বুঝি না।... তবে থটফুল মুডে তোমায় কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কী ভাবছিলেটা কী?

তেমন কিছু নয়।

উঁহুঁ, কিছু একটা ভাবছিলে।... তোমার দাদার কথা?

ওই আর কী। অন্য প্রসঙ্গ পেয়ে গিয়ে রোহিণী স্বস্তি বোধ করল। সোহমের এও এক বড় গুণ, বিব্রত হতে দেয় না। ঠোঁট চেপে বলল, গিয়ে কী অবস্থায় দেখব না-দেখব...

নাথিং টু ওরি। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মাসির মুখে তো শুনেছ, হেমারেজ হয়নি।

কিন্তু রাইট সাইডটা তো গেছে।

ওটা নিউরোজেনিক শক থেকে। ব্রেনের ব্লাড সারকুলেশন চোক করে গেলে কিছু সেল তো ড্যামেজড হবেই। মুভমেন্ট পেয়ে যাবেন আস্তে আস্তে।

হুঁ, ফিজিওথেরাপিতে ভালই রেসপন্স করছে। বড়মাসি তো বলল, স্পিচ এখন অলমোস্ট নরমাল।

তা হলে টেনশন করছ কেন? তোমার দাদাকে তো আমি দেখেছি, ভেরি স্টংলি বিল্ট। খুব তাড়াতাড়িই রিকভার করে যাবেন। অবশ্য হাত পা হানড্রেড পারসেন্ট সচল হতে একটু সময় তো লাগবেই। অ্যান্ড দ্যাট মে ক্রিয়েট সাম প্রবলেম। আর্টিস্ট মানুষ তো, ছবি আঁকতে না-পারলে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে ছটফট করবেন। তার থেকে ডিপ্রেশন এসে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

রোহিণী একটু যেন কেঁপে গেল। দিব্যদা মানসিক অবসাদে ভুগছে, ভাবতেই গা-টা কেমন শিউরে ওঠে। মানুষটা যে শয্যাশায়ী, এটাই তো কল্পনার অতীত। এই তো, মাস চারেক আগে দিল্লি এল... মুখে সেই মনোহরণ হাসি, গলায় সেই হৃদয় কাঁপানো ডাক! কী রে রুনি, তোর রূপ যে আরও খুলছে দিন দিন! বয়স বাড়ছে, না কমছে? তোকে গড়ার জন্য বিধাতাকে নির্ঘাত ওভারটাইম খাটতে হয়েছিল! কী করে ফিগারটা এখনও একই রকম রেখেছিস রে? শুনেই বুকের ভেতরটা আবার উথালপাথাল। কত কষ্টে যে নিজেকে সংযত করেছিল রোহিণী! করেও বারবার। তবু কথাগুলো যেন কানে বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে। মনে হয় পদ্মফুলে ছাওয়া সরোবরের অতল থেকে উঠে আসছে এক ঘণ্টাধ্বনি। তবে সেই সরোবরের জলের রং নীল। বিষের মতো নীল।

রোহিণীর ঠোঁট নড়ল, দিব্যদার কি কখনও ডিপ্রেশন আসতে পারে?

সোহম খেয়াল করেনি রোহিণীর দূরমনস্কতা। বোতলের সিল খুলে জল ঢালছে গলায়। ছিপি আটকাতে আটকাতে বলল, আই হোপ, উনি ঠিকঠাকই থাকবেন। তবে সেদিন একটা জার্নালে পড়ছিলাম, বেটার দ্যান অ্যাভারেজ হেলথের মানুষরা, কিংবা যারা ভীষণভাবে কাজকর্মে মেতে থাকে... সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার হলে তাদের ব্রেনে ফাংশনাল ডিজঅর্ডারের চান্সটা বেড়ে যায়। অবশ্য কনক্লুসিভলি কিছু প্রমাণ হয়নি। যদিও আমার পারসোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলে...

ঝুপ করে থেমে গেল সোহম।

রোহিণী চোখ তুলল, তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা...?

হ্যাঁ। তবে তুমি কিন্তু এর থেকে কোনও সিদ্ধান্তে এসো না। সোহমের

গলা অল্প উঠেও নেমে গেল, আমার মিসহ্যাপটার কথা তো তুমি জানো। সেই ভয়ংকর কার অ্যাক্সিডেন্টে শর্মিষ্ঠা আর বাবলি...। আমিও কিন্তু সেদিন বিশ্রী রকম ইনজিওরড্ হয়েছিলাম।

জানি তো।

চোটের এক্সটেন্টটা জানো না। টানা ছ'মাস আমি বিছানায় ছিলাম। প্রথম দু'মাস নার্সিংহোমে, তারপর আমাদের সল্টলেকের বাড়িতে। প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে। পেলভিক ফ্যাকচার। হিপ স্পাইকা পরে শুয়ে আছি তো শুয়েই আছি। প্রথম প্রথম বউ-বাচ্চার শোকে ভেতরটা পাথর হয়ে থাকত। কিন্তু নার্সিংহোম থেকে ফেরার পরে অদ্ভুত একটা ফেজ এল। শর্মিষ্ঠা-বাবলি উবে যেতে লাগল মন থেকে। তখন সারাক্ষণ শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা। কবে ভাল হব? কবে উঠে দাঁড়াব? আদৌ কোনওদিন দাঁড়াতে পারব তো? ক্রমশ মাথাটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা জেগে আছি, কড়া কড়া সিডেটিভও আমাকে ঘুম পাড়াতে পারছে না। কী যে সব পিকিউলিয়ার হ্যালুসিনেশন দেখতাম তখন! আমাকে হুইলচেয়ারে করে ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বিছানায় শোওয়া অবস্থায় প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছি...! তোমাকে মিথ্যে বলব না রোহিণী, যারা আমার একদম কাছের ছিল, তাদের মৃত্যুর চেয়েও সেই সময়কার ট্রমাটা এখনও আমায় অনেক বেশি হন্ট করে। আর যদি দু'-এক মাস ওইভাবে পড়ে থাকতাম, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম।

সোহমের হাসিখুশি মুখটা কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। মাথা নামিয়ে জলের বোতল নাড়াচাড়া করছে আলগাভাবে। সোহমকে এরকম কদাচিৎ দেখা যায়। রোহিণীর ভাল লাগে না।

সোহমকে সমে ফেরানোর জন্যে রোহিণী লঘু গলায় বলল, আপনি পাগল হওনি। তা হলে তো দিল্লিতে আমায় তং করার জন্য কেউ থাকত না।

আমি তোমায় খুব জ্বালাই, তাই না?

উত্তরে আবার একটু রসিকতা জুড়তে যাচ্ছিল রোহিণী, ব্যাগে

মোবাইল বেজে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বের করে নাম্বারটা দেখল রোহিণী। দিল্লি। মা।

কী হল?

তুই বড়দির শাড়িটা নিয়ে গেলি না! দিব্যও সেবার ফেলে গেল...।

শাড়ির জন্য ফোন? আমি কি লৌকিকতা করতে যাচ্ছি?

তবু... কেনা ছিল...

সে আমি ওখান থেকে একটা কিনে দেব। তোমার খাওয়া হয়েছে?

এখনই কী? সবে তো পৌনে আটটা। ওমবতীর আগে সিরিয়াল গেলা শেষ হোক, তবে তো আটা মাখবে।

এই ক'টা দিন একটু বাবা বাছা করে রাখো, নইলে তো রাতে থাকবে না। সন্ধের ওষুধটা খেয়েছ?

হ্যাঁ।

প্রত্যেক দিনের সকাল বিকেল সন্ধে আর রাতের ওষুধ আলাদা আলাদা করা আছে। দেখে দেখে খাবে। ভুল যেন না হয়।

হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। পাখিপড়া করে দিয়ে গেছিস তো।... তোরা কদ্দূর পৌঁছোলি?

এখনও কানপুর আসেনি।... সকালবেলা হাঁটুর এক্সারসাইজগুলো করবে মনে করে। দিনে তিনবার পাফ নেবে।... ঘাড়-মাথা দপদপ করলেই ডক্টর শ্রীবাস্তবকে ফোন কোরো। আমার বলা আছে, উনি এসে দেখে যাবেন।

আমাকে নিয়ে অত ভাবিস না তো। এক্ষুনি এক্ষুনি আমি মরছি না।

লেকচার দিয়ো না মা। এখন ছাড়ো, সকালে কলকাতা পৌঁছে আমি তোমায় ফোন করব।

পারলে ঝুনির বাড়িতেও এক-দু' দিন থেকে আসিস। ওরা খুব খুশি হবে।

হুঁ।

মিমলির জন্য তো কিছু পাঠানো হল না। আমার হয়ে মিমলিকে একটা জামা কিনে দিস। কিংবা খেলনা। আর বিভাসকে বলিস, ঝুনি-

মিমলি যখন দিল্লি আসবে, বিভাসও যেন আসে একবার।

এক কথা আর কতবার বলবে, মা? তোমার হয়ে আমি সব কর্তব্যই পালন করে আসব। হয়েছে? এবার রাখছি।

ফোনটা ব্যাগে পুরতে পুরতে আপনাআপনি চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রোহিণীর। কলকাতায় গিয়ে ঝুনির সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই শরীরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। মা না-থাকলে কবে যে ওই শয়তানির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ফেলত সে। দিল্লিতে চলে আসার পর একবারই মাত্র কলকাতায় গিয়েছিল রোহিণী। ঝুনি যে বিয়ের ঢঙটা করল, শুধু সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়, মাকে পাকাপাকিভাবে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য। গাইঘাটার বাড়িটাও বেচে দিয়ে সমস্ত পিছুটান ছেঁটে ফেলেছিল সেই সময়েই। তবে ঝুনির তো লজ্জাশরমের বালাই নেই, দিদি তাকে পছন্দ করে না জেনেও বেশ কয়েকবার হানা দিয়ে গেছে দিল্লিতে। দিনগুলো তখন যে কী বিচ্ছিরি কাটে! অনবরত ঝুনির আহ্লাদিপনা, হ্যা হ্যা, হি হি... অসহ্য! সেই ঝুনির বাড়ি গিয়ে থাকবে রোহিণী! প্রাণ থাকতেও নয়। কাউকে তো বলা যায় না, ঝুনি কীভাবে তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। মাকেও না।

সোহম কখন পাশ থেকে উঠে গিয়েছিল। ফিরল। তার মুখের সহজ হাসিটাও ফিরেছে আবার। বসতে বসতে বলল, ওফ্, ট্রেনে সিগারেট খাওয়াটা যে কী ঝকমারি! শেষে কিনা বাথরুমে ঢুকে ফুড়ুক ফুড়ুক! মনে হচ্ছিল স্কুলের ছেলে হয়ে গেছি... এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম!

রোহিণীও হাসি টানল ঠোঁটে, তুমি স্কুল থেকে সিগারেট খাও?

ক্লাস নাইন। এ-বছর আমার সিগারেট স্মোকিংয়ের সিলভার জুবিলি হল।

ডাক্তার হয়ে বুক ফুলিয়ে বলছ! লজ্জা করে না?

করে তো। কত কমিয়ে দিয়েছি। এখন তো দুটো সিগারেট খাওয়ার মাঝের সময়টায় কোনও সিগারেট ধরাই না। বিলিভ মি।

কথার মারপ্যাঁচও জানে বটে সোহম। ছদ্মকোপে তাকে চড় দেখাল রোহিণী। সোহম হাসছে হা হা।

নৈশাহার বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। খাবার নিয়ে মুখোমুখি বসল দু'জনে। কথা চলছে টুকটাক। সোহমই বলছে বেশি, রোহিণী শ্রোতা। সোহম বলছে তার বাড়ির কথা, বাবা মা দাদা বউদি ভাইপো ভাইঝির গল্প। সোহমের পরিবারের সবাই নাকি চায়, সে আবার ফিরে আসুক, কিন্তু কলকাতা তার আর ভালই লাগে না। বছরে এক-দু'বার সপ্তাহ খানেকের জন্য শহরটায় সে পা রাখবে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, জমিয়ে ক'টা দিন আড্ডা ফাড্ডা, ব্যস ওইটুকুই যথেষ্ট। এবার কলকাতা যাত্রার সমাচারটা অবশ্য বাড়িতে জানায়নি সোহম, হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সে একটা চমক দিতে চায়।

বলেই সোহম হাসছে, আমি কিন্তু চমকটা আরও বাড়িয়ে দিতে পারি।

রোহিণীর মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, কীভাবে?

সে তো তুমি বলবে। চমকটা তো তোমার হাতে।

সামান্য সপ্রতিভ স্বরে রোহিণী বলল, তাড়া কীসের সোহম। আর ক'টা দিন যাক।

যাক। দিন যাক। মাস যাক। বছর যাক। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত সবই যাক। আমার চল্লিশটা গড়াতে গড়াতে পঞ্চাশে পৌঁছোক। পঞ্চাশ থেকে ষাট। থানইটখানা কিন্তু আমার পাতাই থাকবে।

একটা কথা বলি সোহম? বুড়ো বয়সে আর ওসব হ্যাঙ্গাম ট্যাঙ্গামের কী দরকার! বেশ তো আমরা বন্ধু হয়ে আছি।

তোমার কী ধারণা, আমাদের শত্রু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে?

কী জানি। ভয় লাগে। ভুল হয়ে যাবে কিনা ভেবে পাই না।

কীসের ভুল? কেন ভয়? সোহমের চোখ চিকচিক, আমার একটা পাস্ট আছে বলে কি দ্বিধা? সেকেন্ডহ্যান্ড বলে দ্বিধা?

ছি ছি, ওভাবে বোলো না। বলতে নেই।

তবে?

রোহিণী একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। কী উত্তর দেবে সে? বলবে, সেও সেকেন্ডহ্যান্ড? তারও একটা অতীত আছে? বলা যায়? সোহম

তবু উগরে দিয়ে নির্ভার হতে পারে খানিকটা, কিন্তু রোহিণীকে তো একটা পাথর আজীবন বয়ে বেড়াতেই হবে। সঙ্গোপনে। তা ছাড়া অতীতটা যে সত্যিই এখন অতীত, তাও কি জোরগলায় বলতে পারে রোহিণী? সে তো নিজেই নিজেকে বোঝাতে পারে না, অন্যকে সে কী বোঝাবে? সব কিছু না-জানিয়ে সংসার গড়ে তোলা, সেও তো এক ধরনের প্রতারণা। মিথ্যের ওপর বাড়ি বানাবে সে? বালির প্রাসাদ?

রোহিণীর নীরবতার কী অর্থ করল সোহম কে জানে, আর তুলল না প্রসঙ্গটা। মুখ ধুয়ে এসে রোহিণীকে বিছানা পেতে দিল। ধূমপানের অছিলায় কামরার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এসে কুপের পরদা টেনে দিয়ে উঠে গেল ওপরের বার্থে।

রোহিণীও শুয়ে পড়ল। শোওয়াই সার, চোখ বুঝতে পারে কই! বুজেই বা কী লাভ, মনের মুকুরে ফুটে ওঠা ছবি কি চোখ বন্ধ করলেই সরে যায়!

...রোহিণীর বাবা মারা গেছে সেদিন। দীর্ঘ আট মাস কোলোন ক্যান্সারে ভুগে, সংসারকে দেনায় ডুবিয়ে, জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রন্থাগারিক নরেন সোমের জীবনদীপ নিভল। তাকে যমুনাপারের শ্মশানে পুড়িয়ে ফিরেছে লোকজন। রোহিণীর মা শোকস্তব্ধ, তারা দুই বোন তখনও ফোঁপাচ্ছে থেকে থেকে। হঠাৎই দিব্যদা সামনে এসে দাঁড়াল। হাত রেখেছে রোহিণীর মাথায়। ভরাট স্বরে বলল, কান্না একটু বাঁচিয়ে রাখ, রুনি। মানুষকে তো সারা জীবনই কাঁদতে হয়, একবারে চোখের জল সব ফুরিয়ে ফেললে চলবে কেন!

এমন কিছু গভীর সান্ত্বনাবাক্য নয়, তবু কী যে জাদু ছিল ওই কণ্ঠস্বরে, পনেরো বছরের রুনি সম্মোহিত, থেমে গেছে কান্না। তারপর দিব্যদা তাকে হাত ধরে নিয়ে এল বাইরে। সন্ধের আকাশে একটা একটা করে তারা ফুটছে তখন। আকাশটাকে দেখিয়ে দিব্যদা বলল, ওদিকে তাকা। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের অস্তিত্ব কতটুকু সেটা একবার ভাব। কিচ্ছু না। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। নিজেদের সুখদুঃখ এখানে বড় নগণ্য রে, একদম মূল্যহীন।

দিব্যদার ভারী ভারী কথাগুলো সেদিন ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি রোহিণী। বোঝার কথাও নয়। বোঝার বয়সও হয়নি। তবে সেই মুহূর্ত থেকে বারো বছরের বড় মাসতুতো দাদাটি একটা অন্য ধরনের আবেশ তৈরি করেছিল মনে। সেদিনের পরও আরও দু'দিন গাইঘাটায় ছিল দিব্যদা, শ্রাদ্ধশান্তির দিনও এসেছিল। রোহিণী সারাক্ষণ বিমোহিত চোখে দেখে গেছে তাকে। কী চমৎকার বলিষ্ঠ চেহারা, যাকে বলে সত্যিকারের পুরুষ। দেশ-বিদেশ ঘুরে এসে সদ্য আর্ট কলেজে আঁকা শেখাতে ঢুকেছে, মাত্র কয়েকটা রেখার আঁচড়ে বাবার একটা স্কেচ বানিয়ে দিল, বিপুল দাপটে সব কিছু দেখাশোনা করছে, মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাবছ কেন মাসি, আমরা তো আছি ... এমন একটা মানুষের দিকে মুগ্ধ চোখে না-তাকিয়ে পনেরো বছরের মেয়েটার উপায় আছে! দিব্যদা দুটো কথা বললেই হৃৎপিণ্ড কেমন ধকধক করতে থাকে। গায়ে গায়ে একটু ছোঁয়া লাগলেই শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

রোহিণীর মনে আছে, দিব্যদার বিয়ের খবরে ভীষণ ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। বিয়েতে, বউভাতে, বউ আসার দিন, সারাক্ষণই রয়েছে দিব্যদাদের চেতলার বাড়িতে, আবার যেন নেইও। হু হু করছিল ভেতরটা। দিব্যদা কেন যে পৃথাবউদির হয়ে গেল!

হায়ার সেকেন্ডারির পর মেডিকেলে চান্স পেল রোহিণী। মা চিন্তায় চিন্তায় মরছে, কোনওক্রমে দু'বেলা দুটো ভাতের জোগাড় হয়, বড় মেয়েকে ডাক্তারি পড়ানোর হাতির খরচ জুটবে কোথ্থেকে! বড়মাসি আবার বলল, আমি তো আছি। দিব্যদাও বলল, আমি আছি। ব্যস, রোহিণী সোজা নাচতে নাচতে কলকাতায়।

দিব্যদাকে কবে যেন একদম নিজের করে পেল রোহিণী? ফার্স্ট ইয়ারেই কি? না, না, বুঝি সেকেন্ড ইয়ার। দিনটা ছিল রবিবার। শীতের দুপুর। আর পাঁচটা ছুটির দিনের মতোই বড়মাসির বাড়ি গেছে রোহিণী, কিন্তু সেদিন পৃথাবউদি, বড়মাসি কেউ বাড়িতে নেই। পৃথাবউদি গেছে বাপের বাড়ি, বড়মাসিও বেরিয়েছে কোথায় যেন। বাড়িতে সেদিন শুধু দিব্যদা।

দিব্যদা দরজা খুলে বলল, খুব ভাল হয়েছে তুই এসে গেছিস। আমায় একটু কফি সাপ্লাই কর তো।

দিব্যদার সেবা করার বরাত পেয়ে রোহিণী হুড়মুড়িয়ে ঢুকেছে রান্নাঘরে। কফি নিয়ে দিব্যদার স্টুডিয়োটায় গিয়ে দেখল, দিব্যদা ফের মগ্ন রং-তুলিতে। ইজেলে রাখা ক্যানভাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে রং আর রং। কী আঁকছে ওটা? একটা মানুষের আদল যেন ফুটছে, আবার ফুটছেও না।

কফি নামিয়ে রোহিণী বলল, তুত্, কী যে আঁকো, আমি কিছু বুঝতে পারি না।

ক্যানভাস থেকে চোখ না-সরিয়ে দিব্যদা বলল, ছবি বুঝতে গেলে চোখ লাগে। ইনার আই।... শিক্ষাও দরকার।

শেখাও আমায়।

এভাবে শেখানো যায় নাকি? ছবিকে উপলব্ধি করতে হয়। পেন্টিং ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন অফ মাইন্ড। আমার মন কোনও একটা জিনিসকে, সেটা লিভিং হতে পারে, নন লিভিং হতে পারে, কীভাবে দেখছে, কতটা দেখছে এবং এই দেখায় কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে... সবই কিন্তু ছবির মধ্যেই থাকে।

কিন্তু যেটা আঁকছ, সেটা কী?

একটা মেয়ে। যে তার পাস্ট প্রেজেন্ট আর ফিউচারকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারছে না।

কিন্তু কোথায় মেয়েটা? নাক কোথায়? চোখ কোথায়? কান কোথায়?

দ্যাখ ভাল করে। খুঁজে বার কর।

রোহিণী ক্যানভাসের একদম সামনেটায় চলে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। উঁহুঁ, কিছু বুঝছে না। শুধু রং দেখছে। সবুজ, কালচে সবুজ, কচি কলাপাতা, বাদামি, হালকা বাদামি আর মরচে রং। হঠাৎই পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল, তুমি খালি এমন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ছবি কেন আঁকো গো দিব্যদা?

উত্তর না-পেয়ে দিব্যদার দিকে ফিরেছে রোহিণী। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়

ছলাত। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকে দেখছে দিব্যদা!

রোহিণী নার্ভাস গলায় বলল, কী দেখছ? আআআমার দিকে তাকিয়ে কেন?

তুই কী সুন্দর হয়েছিস রে, রুনি! কেন তুই এত সুন্দর হলি?

রোহিণীর মুখে কোনও শব্দ এল না।

দিব্যদা আবার বলল, তোকে আমার আরও ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করছে রে রুনি।

দেখছ তো!

এরকম নয়।... তোকে... তোকে...। বলতে বলতে দিব্যদা হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে সামনে। রোহিণীর হাত দুটো চেপে ধরল, রুনি, প্লিজ... একবার... একবার...

কী যে ঘটে গেল ওই মুহূর্তে! প্রিয়তম পুরুষের প্রার্থনা তখন কি আর রোহিণী উপেক্ষা করতে পারে!

তার নিরাবরণ দেহটাকে কিন্তু নিজে থেকে স্পর্শ করেনি দিব্যদা। শুধু দৃষ্টির পালক বোলাচ্ছিল সর্বাঙ্গে। আর অস্ফুটে বলছিল, বিউটি ইজ ডেথ। বিউটি ইজ হেভেন। বিউটি ইজ লাইট। বিউটি ইজ ডার্কনেস।

নিজের শরীরটা তখন জ্বরো রোগীর মতো কাঁপতে শুরু করেছে রোহিণীর। একটা অচেনা কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। উন্মাদিনীর মতো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল দিব্যদাকে। চুমু খাচ্ছে। বুকে মুখ ঘসছে। অস্থিরভাবে বলে চলেছে, আমি আর পারছি না দিব্যদা। পারছি না, পারছি না, পারছি না।

সেই শুরু। তারপর তো প্রায় নিয়মিতই চলতে থাকল খেলাটা। সপ্তাহে এক দিন, সপ্তাহে দু'দিন...। কী তীব্র আবেগে যে মিলিত হত তারা! তাকে আদর করার সময়ে দিব্যদা যেন মাতাল হয়ে যেত। ভালবাসা যেন শরীর ছাপিয়ে অন্য কোথাও পৌঁছে দিত দু'জনকে।

এক দুপুরে তো ধরাই পড়ে গেল হাতেনাতে। সেদিন পৃথাবউদির জন্য কী খারাপ যে লেগেছিল। কিন্তু দিব্যদাকে সে ছাড়ে কী করে! এক দিকে চোরা পাপবোধ, অন্য দিকে নেশার টান, সে যে কী তীব্র দোলাচল!

তবু দিব্যদাকে রোহিণী বলেছিল, আর নয়, এবার আমাদের থামতে হবে দিব্যদা।

অনুনয়ের সুরে দিব্যদা বলেছিল, আমার রোহিণী নক্ষত্রকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে, রুনি?

একই কথা কি ঝুনিকেও বলত দিব্যদা? আমার কৃত্তিকা নক্ষত্রকে ছেড়ে কী করে বাঁচব, ঝুনি!

ঝুনির সঙ্গে দিব্যদাকে মনে পড়ামাত্র এক তীব্র শীতের অনুভূতি। কামরার এসিটা কি বেড়ে গেল সহসা? পায়ের কাছে পড়ে থাকা কম্বলটা টানল রোহিণী, গলা পর্যন্ত। গুটিয়ে মুটিয়ে শুয়েছে। ভয়ংকর গতিতে ছুটছে ট্রেন, শব্দ বাজিয়ে, শব্দ ছড়িয়ে। চাকায় লেগে পাথরকুচি ছিটকে যাওয়ার আওয়াজগুলোও রোহিণীর বুকে এসে তিরের মতো বিঁধছিল।

ঝুনির লীলাখেলার খবরটা রোহিণীকে শুনতে হয়েছিল পৃথাবউদির মুখ থেকে। তখন ডাক্তারি পাশ করে গেছে রোহিণী, সবে জয়েন করেছে একটা নার্সিংহোমে। বড়মাসির বাড়ি তখন আর যায় না বড় একটা, পৃথাবউদিকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলে। দিব্যদার সঙ্গে দেখা হয় বাইরে, ছোটখাটো আউটিংয়ে চলে যায় দু'জনে।

ওই সময়ে যাদবপুরে একটা ছোট্ট টু রুম ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল রোহিণী। ঝুনিও তখন চলে এসেছে কলকাতায়। গ্র্যাজুয়েশনের পর কীভাবে যেন চাকরি জুটিয়ে ফেলেছে এক বিজ্ঞাপনের ফার্মে। মাকেও সঙ্গে এনে রেখেছে দুই বোন।

পৃথাবউদি অবশ্য সেই ফ্ল্যাটে যায়নি, এসেছিল রোহিণীর নার্সিংহোমে। তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে কর্কশভাবে বলেছিল, তোমরা দুই বোন কী আরম্ভ করেছ, অ্যাঁ? দাদাটাকে শরীরের লোভ দেখিয়ে জোঁকের মতো চুষছ? বাজারের মেয়েছেলেদেরও কিছু এথিক্স থাকে, তোমাদের কি তাও নেই?

রোহিণী হাঁ, আমি তো... বিশ্বাস করো বউদি... দিব্যদার সঙ্গে আর...!

দিব্যদা! দাদা শব্দের মানে বোঝো? তোমার বোনটি তো তোমার

চেয়েও সরেস। শুধু আশনাই করে আশ মিটছে না, সে তো লোকটার মানিব্যাগও সাফ করছে।

রোহিণীর দু'কান ঝাঁঝাঁ। চোখে ঘোর অবিশ্বাস। বাড়ি ফিরেই ধরল ঝুনিকে। আশ্চর্য, ঝুনির কোনও বিকার নেই! তেত্রিশ মাসের ছোট বোন মুখের ওপর বলে দিল, দিব্যদা তোর একার নাকি? তোর যতটা রাইট আছে দিব্যদার ওপর, আমারও ততটাই আছে।

বোনের মাত্র দুটো বাক্যেই রোহিণী বুঝে গেল, ঝুনি তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। পদে পদে সে দিদির থেকে পিছিয়ে। সৌন্দর্যে, লেখাপড়ায়... এমনকী বাবার ভালবাসাও রোহিণীই বেশি পেয়েছিল। কোথাও না-কোথাও দিদিকে তো তাকে হারাতেই হবে।

দিব্যদাও তার স্বরূপটা চেনাল সেই সময়েই। অবলীলায় বলে দিল, আমি কাউকে আমার কাজের কৈফিয়ত দিই না, রুনি। তুই আমার চোখে যা ছিলি, তাই আছিস। বিশ্বাস যদি করতে পারিস তো কর, নইলে আমার কিছুই বলার নেই।

এর পর কি আর রোহিণী থাকতে পারে কলকাতায়? চলে এসেছে সে, দূরে চাকরি নিয়ে পালিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। মাঝে বহুবার দিল্লি গেছে দিব্যদা, তার ফ্ল্যাটেও থেকেছে, কিন্তু দিব্যদাকে আর এক চুলও কাছে এগোতে দেয়নি রোহিণী। বুঝে গেছে, মানুষটার মনে প্রেম বলে কোনও বস্তু নেই, অন্যের মনোকষ্টে ওই মানুষ পীড়িত হয় না, এর সান্নিধ্যে দুঃখ ছাড়া কিছু জুটবে না কখনও।

তবু তাকে দেখে রক্তের গতি চঞ্চল হয়। তবু তার অসুখের সংবাদে চোখ ভরে আসে জলে। তবু তাকে নিয়ে ভাবলে এক অলৌকিক পুলক সঞ্চারিত হয় শিরায় শিরায়। হায় রে রোহিণী!

ঘটাং ঘটাং শব্দে কোনও সেতু পার হল ট্রেন। রোহিণী উঠে বসল। চোখ রাখল কাচে। ওপারে গাঢ় তমিস্রা। হঠাৎ হঠাৎ দূরে কোথাও আলোর ফুটকি দেখা যায়, মিলিয়েও যায় তৎক্ষণাৎ। কুপের পরদা সরে গেছে অল্প, নীলচে আলো এসে পড়ছে ভেতরে। আলোর সরু রেখাটাকে একটুক্ষণ দেখল রোহিণী, আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল আবার।

পাশ ফিরেছে। বড় জোর দু'-তিন মিনিট, ফের উঠে বসল। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। কোনও একটা কুপে বীভৎস সুরে নাক ডাকছে কারও। হঠাৎ একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। মা থামাচ্ছে বাচ্চাটাকে, ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। দিব্যদা কী করছে এখন? ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়ই? দিল্লির ফ্ল্যাটেও আচমকাই মনে হয় এরকম। নিশুত রাতে জেগে উঠে মনে হয়, এই মুহূর্তে কী করছে দিব্যদা? কেমন আছে?

রোহিণী মাথা ঝাঁকিয়ে সিট ছেড়ে নামল। টলমল পায়ে প্যাসেজ ধরে হাঁটছে। ট্রেনের এক কর্মচারী দুপদাপিয়ে আসছিল, সরে তাকে জায়গা করে দিল। কাচ ঠেলে বাইরে এসেছে।

বড্ড তাপ, বড় বেশি তাপ বাইরে। তবে দিব্যি হাওয়াও আছে। বাথরুম ঘুরে এসে একটুক্ষণ হাওয়াটাকে মাখল রোহিণী। আবার চলেছে স্বস্থানে।

কুপে ঢুকেই সোহমের দিকে চোখ গেল। তাকিয়ে আছে সোহম। দেখছে তাকে।

রোহিণী জিজ্ঞেস করল, এ কী, তুমি ঘুমোওনি?

সোহম হাসল, তুমি কি একাই জেগে থাকতে পারো, রোহিণী? আমি পারি না?

সোহমের হাতটাকে ছুঁতে ইচ্ছে করল রোহিণীর। সাহস হল না।

সাত

ঘুলঘুলিতে এক জোড়া চড়ুইপাখি বাসা বেঁধেছে ইদানীং। ভোরবেলা খানিক কিচির মিচির করে দুটিতে কোথায় যেন বেরিয়ে পড়ে। ফেরে সেই দুপুরে, বাড়ি যখন প্রায় নিঝুম, ওপাশে মীরার ঘর থেকে ভেসে আসা টেলিভিশনের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যখন থমকে থাকে দিব্যজ্যোতির চৌকাঠের ওপারে কিংবা ঢোকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে, শব্দের রেণু হয়ে। চড়ুইদম্পতির তখন মহা আনন্দের সময়। অনন্ত

খুনসুটি চলে তাদের। ঝাপটাঝাপটি করছে, এ ওকে তাড়া করছে, ও তাকে ধাওয়া করছে, হঠাৎই যুগলে চলে গেল বাসায়, প্রেমালাপ সারতে সারতে দিব্যজ্যোতির ঘরময় ছড়িয়ে দিচ্ছে কাঠিকুঠি। গৃহস্বামীর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে কখনও বা ঝুপঝুপ নেমে পড়ে লাল মেঝেতে। চলে তুড়ুক তুড়ুক লাফ, যেন এক্কা-দোক্কা খেলছে।

পুচকে পাখি দুটোকে নিয়ে দুপুরটা বেশ কাটে দিব্যজ্যোতির। এই সময়টায় ঘরে সে একাই। সেন্টারের নার্স মেয়েটা দুপুরে মা'র ঘরে থাকে, বিছানায় কলিংবেলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে, বাজালেই সে চলে আসে ঝটপট। তবে দিব্যজ্যোতি তাকে ডাকে না বড় একটা, দ্বিপ্রাহরিক নির্জনতা একা একা উপভোগ করে তারিয়ে তারিয়ে। ঘুমোয় না, ভাতঘুমে চোখ জড়িয়ে এলে জোর করে ছিঁড়ে ফেলে তন্দ্রা, একদৃষ্টে দেখতে থাকে দুই চড়ুইয়ের কার্যকলাপ। মজা পায় খুব, আপন মনে হাসে মিটিমিটি। মাঝে মাঝে কথাও বলে তাদের সঙ্গে। কী রে, কী খেলি আজ তোরা? দানাটানা কিছু জুটল, নাকি শুধুই এঁটোকাঁটা? আজ গেছিলি কদ্দূর? একসঙ্গেই ছিলি। নাকি আলাদা আলাদা? চড়ুই দুটো তখন চোখের পাতা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দেখে তাকে, তারপর মৃদু হুইস্‌ল বাজিয়ে পিড়িং উড়ে যায়।

আজ দুই চড়ুইয়ের দর্শন নেই এখনও। বুকের ওপর একখানা কবিতার বই খুলে ঘুলঘুলিটার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছিল দিব্যজ্যোতি। বুঝি-বা একটু অসহিষ্ণু বোধ করছিল। গেল কোথায়? বেশি দূরে পাড়ি দিল কি?

দরজায় মীরা, এ কী, বলে দিলাম তাও অঞ্জলি জানালগুলো বন্ধ করেনি!

দিব্যজ্যোতি বই বুকের ওপর রাখল, করছিল, আমিই বারণ করেছি।

আজ বাইরে এত তাত, হাওয়াটাও গরম গরম...

আমার খারাপ লাগছে না।

তবু...

তোমার গরমের বাতিক আছে। ফাল্গুনের সমীরণে নাকি তাত! ফুঃ।

জানলা বন্ধ রাখলে আমার দম আটকে আসে। দিব্যজ্যোতি ঠোঁট ছুঁচোল করল, তা তুমি হঠাৎ টিভি ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ যে বড়?

আমার টিভি দেখা তো সময় কাটানো। জানিসই তো, আমার কোনও সিরিয়াল টিরিয়ালের নেশা নেই।

এবারে হয়ে যাবে। যা একখানা নার্স আমদানি করেছ, নেশা ধরিয়ে তবে ছাড়বে।

মীরা আলগা হাসলেন। তাঁর চেহারায় এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে, হাসিতেও। সত্তরে পৌঁছেও তাঁর দেহযষ্টি এখনও টানটান, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় তিনি অনেকটাই লম্বা, স্বাস্থ্যটিও তারিফ করার মতো, চোখমুখও বলে দেয় এককালে মীরা মোটামুটি সুন্দরীই ছিলেন। কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরার অভ্যেসটিও তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

ঘরে ঢুকে বেতের আরামকেদারাটায় বসেছেন মীরা। নরম গলায় বললেন, না রে। আমি তো ভাবছি তোর আর একটু উন্নতি হলেই আবার বিকেলে বেরোনো শুরু করব।

সেই মিশনে গিয়ে দল বেঁধে কথামৃত শোনা?

কতরকম লেকচারও তো হয়। জ্ঞান বাড়ে, মনটা ভাল থাকে...

ফালতু সময় নষ্ট করা। তোমাকে তো বারবার বলেছি, এখনও শক্তপোক্ত আছ, স্ট্রেট সোনামাটি চলে যাও। দিব্যি ওখানে সবার মাথার ওপরে থাকবে, কল্পনাদেরও গাইড টাইড করবে... ওদের কাজকর্মের ওপর ডে টু ডে ওয়াচ রাখাও তো দরকার।

আমি তোর হয়ে ওখানে পাহারাদারি করতে যাব?

বাঁকাভাবে নাও কেন? প্রতিষ্ঠানটা তো তোমারই মা'র নামে, তুমিই না হয় তার দায়িত্ব নিলে!

সুবর্ণলতা তৈরির জন্য যখন মা'র টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিলি, তখন তো এই প্রস্তাবটা দিসনি! কল্পনার ওপরই তো তোর তখন বেশি আস্থা ছিল। এখন কি ভরসা টলে গেছে?

দিব্যজ্যোতি চুপ করে গেল। এই মহিলার সঙ্গে সে কোনও কালেই

কথায় পেরে ওঠে না। মা কঠোর, না কোমল, তাই সে আজও বুঝে উঠতে পারল না।

মীরা ফের হেসে বললেন, কেন আমায় আর ওসবে জড়াবি? তোর কাজ তুই কর। আমি এখানে বেশ আছি।

দিব্যজ্যোতি আস্তে আস্তে উঠে বসল। সময় নিয়ে। চড়ুই দম্পতি ফিরেছে আলমারিতে, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটুক্ষণ স্থির থেকে শুনল তাদের কিচিরমিচির। তারপর হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, রুনি কোথায়? ঘুমোচ্ছে?

নাহ্, বেরোল এইমাত্র। দরজা লাগিয়েই তো আসছি।

কোথায় গেল?

বলল তো কীসব কেনাকাটা আছে।

রুনি কি এখানে শপিং করতে এসেছে নাকি? আসার পর থেকেই তো শুনছি বেরিয়ে যাচ্ছে, আর বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে একটু বসার সময়ই হয় না!

তুই কী এক্সপেক্ট করেছিলি? মীরার ভুরুতে ভাঁজ, এসেই তোর সেবাশুশ্রূষা আরম্ভ করে দেবে?

দিব্যজ্যোতি সিংহ কারও সেবার প্রত্যাশী নয়, মা। তবে আমায় দেখতে কলকাতায় এল, দু'-চার মিনিট বসে গল্পও তো করতে পারে!

আসে তো। বসেও তো। আজ সকালেই তো তোর প্রেশার চেক করল।

দিব্যজ্যোতি একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল। কৌতুক আর তাচ্ছিল্য মেশানো। হালকা গলায় বলল, মহারানিকে বোলো ফিরে যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে। ওকে একটা কাজ দেব।

কী কাজ?

আছে।

ওর কিন্তু আজ ফিরতে রাত হবে। সল্টলেকে নেমন্তন্ন আছে।

নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছে কলকাতায়? কার বাড়ি যাবে আজ?

ওই যে ডাক্তার ছেলেটা... রুনির সঙ্গে এসেছে।

দিব্যজ্যোতি ঝটকা খেল একটু। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, সোহম?

হ্যাঁ। রুনি তো সোহমই বলল।

সোহম... রুনির সঙ্গে কলকাতায় এসেছে? রুনি আমায় বলেনি তো?

মীরা প্রশ্নটার জবাব দিলেন না। ছেলের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, সোহম রুনিকে বিয়ে করতে চায়। ধীরা বলছিল।

অ।

আবার একটু সময় নিয়ে মীরা বললেন, রুনিরও বোধহয় অমত নেই।

দিব্যজ্যোতি জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, ভেরি গুড। ওয়াইজ ডিসিশন।

ভাল তো বটেই। কী-ই যে বিয়ে করবে না বলে ধনুর্ভাঙা পণ করে বসে ছিল! কত সুন্দর সুন্দর সম্বন্ধ এসেছে, সব নাকচ।... এতদিনে তাও মতি ফিরছে।

হুম।

তুমি আর ওর মাথার পোকা নাড়িও না। এবার ওকে শান্তিতে ঘরকন্না করতে দাও।

আমি কবে কার হাত পা বেঁধে রাখলাম? দিব্যজ্যোতি বেশ জোরেই হেসে উঠল। তার মুখ এখনও একশো ভাগ স্বাভাবিক হয়নি, হাসিটা তাই ঈষৎ বিকৃত দেখাল যেন। বাঁ হাতখানা দুলিয়ে বলল, সব কিছু তো বহুকাল আগেই চুকেবুকে গেছে মা। রুনি যদি এখনও বিয়ে না-করে থাকে সেটা রুনির প্রবলেম, আমার নয়।

থাক। কাদা ঘাঁটতে আমার আর ভাল লাগে না। মীরা একটুখানি দম নিয়ে বললেন, একটাই শুধু আফশোস, পৃথার মতো মেয়েকে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে এখানে সুখ পায়নি।

দ্যাখো, নিজেই কিন্তু কাদা ঘাঁটা শুরু করলে। ছাড়ো না পুরনো কথা। ভুলে যাও। দিব্যজ্যোতি খাটের বাজুতে হেলান দিল। পাশবালিশটা কোলে টেনে নিয়ে বলল, সুখ জিনিসটা তো যার যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির

ব্যাপার, মা। কেউ ভাবে, যেমন আছি তাতেই সুখ। কেউ জীবনভর কোথায় সুখ, কোথায় সুখ বলে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ-বা মনে করে, সুখ মানুষের জন্য নয়, ওটা একটা সাবহিউম্যান অনুভূতি। যাদের বোধটোধ কম, আই মিন যারা ভোঁতা টাইপ, তারাই শুধু সুখ সুখ করে কাতর হয়। পৃথা এর মধ্যে একটা ক্লাসে বিলং করে, আমি আর একটা ক্লাসে। এই নিয়ে হা-হুতাশ করার কোনও মানেই হয় না।... আর একটা কথাও মাথায় রেখো, মানুষ বেঁচে থাকে তার কাজে। সুখ কোনও কাজের মধ্যে পড়ে না।

মীরা গম্ভীর মুখে বললেন, এটা তো তোমার ব্যাখ্যা।

আমি তো আমার ব্যাখ্যাই দেব। দিব্যজ্যোতি ফের হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, বাব্বা, বকতে বকতে গলা শুকিয়ে গেল, একটু চা খাওয়াবে? অঞ্জলিকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও না।

অপ্রসন্ন স্বরে মীরা বললেন, আমি এখন চলে গেলেই বুঝি তুই খুশি হোস?

ঠিক ধরেছ। আমি এখন একটু একা থাকাই প্রেফার করব।

কিন্তু একা থাকা আজ দিব্যজ্যোতির কপালে নেই, মীরা উঠে যাওয়ার পরে পরেই কলিংবেল বেজে উঠেছে। দুই আগন্তুক দেখতে এসেছে দিব্যজ্যোতিকে। সোনামাটির শ্যামল গুছাইত আর প্রবীর মান্না।

সন্ধে নেমেছে। ঘুলঘুলিতে ঘুমিয়ে পড়েছে চড়ুই দম্পতি। দিব্যজ্যোতিও চোখ বুজে শুয়ে ছিল। শ্যামল গুছাইত আর প্রবীর মান্না থাকতে থাকতেই এসে পড়ল ফিজিওথেরাপিস্ট। শারীরিক কসরত সেরে দিব্যজ্যোতি এখন রীতিমতো ক্লান্ত। তবে শ্যামলরা খানিক উজ্জীবিতও করে গেছে তাকে। নলকূপ নাকি সামনের সপ্তাহেই বসে যাবে। আর একটি সুসংবাদ, জেলা সভাধিপতির নির্দেশক্রমে আশপাশের আরও বেশ কয়েকটি গ্রামে সুবর্ণলতার জন্য প্রচার চালাবে পঞ্চায়েত। কথায় কথায় প্রবীর এও জানাল, পার্টির রাজ্য সম্পাদকও নাকি দিব্যজ্যোতির শরীরস্বাস্থ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্‌বিগ্ন। প্রবীররা আজ যখন পার্টির রাজ্য

দপ্তরে গিয়েছিল, তিনি নিজে নাকি বেরিয়ে এসে খবরাখবর নিয়েছেন দিব্যজ্যোতির।

এ ধরনের সংবাদে প্রাণিত হওয়ারই তো কথা। শুয়ে শুয়েই দিব্যজ্যোতি ভাবছিল, কবে নাগাদ সে আবার সোনামাটিতে যেতে পারবে। ডান হাত এখন অনেকটাই নাড়াচাড়া করতে পারে, লাঠি ধরে ধরে বাথরুমেও যায়। তবু সাহায্য একটা লাগে এখনও। যতই শ্রান্তি আসুক, ফিজিওথেরাপিটা চালিয়ে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতেই হবে। বাঁ হাতে লেখার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, চেক ফেকও তো সই করা দরকার, মা নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে আর কত তুলে যাবে? আজকালের মধ্যে সুখেন আসবে মাল নিয়ে, তার হাত দিয়ে নগদ কিছু পাঠাতে হবে সুবর্ণলতায়। ওখানে সকলের মাইনেকড়ির ব্যাপার আছে, তা ছাড়া প্রাত্যহিক খরচখরচা... দিব্যজ্যোতি অসুস্থ বলে ওরা হয়তো মুখ ফুটে চাইছে না, কিন্তু অসুবিধে তো হচ্ছেই। চিত্রমালা আর্ট গ্যালারি থেকে একটা পেমেন্ট পাওয়ার কথা ছিল, তাড়া লাগাবে টেলিফোনে? চেক না হয় পরেই হবে, আপাতত ক্যাশটা তো দিয়ে যাক। ধুস, এভাবে চলে নাকি? ব্যাঙ্কে কথা বলতেই হবে। সাময়িকভাবে অক্ষম বা অসুস্থ মানুষদের জন্য তাদের কি কোনও ব্যবস্থা নেই? টিপসইতে টাকা তোলা? পেনশনও তো ওঠানো হয়নি! সিঙ্গল অ্যাকাউন্টটা যদি মা'র সঙ্গে জয়েন্ট করে ফেলা যায়...? তিন সপ্তাহ ধরে মা যে খরচটা টেনে যাচ্ছে, সেটাও তো ফেরত দেওয়া উচিত।

অঞ্জলি ডাকছে, দাদা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

চোখ খুলল দিব্যজ্যোতি। কালোপানা দাঁতউঁচু অঞ্জলির দিকে তাকিয়েই ফের বুজে ফেলেছে।

বিকেলের ছানাটা তো খাওয়া হয়নি, এখন দিই?

থাক। তুমি বরং একটা কাজ করো। টেবিল থেকে বোর্ডটা এনে দাও।

সবে একটা ব্যায়াম হল, এখনই ছবি আঁকবেন?

আহ্, যা বলছি করো। সঙ্গে স্কেচ পেনসিলগুলোও আনবে।

দিব্যজ্যোতির কড়া গলাকে ভয়ই পায় অঞ্জলি। ঝটপট বোর্ড আর পেনসিল এগিয়ে দিয়েছে। বিছানায় বোর্ডটাকে শুইয়ে কাগজে রেখা টানছে দিব্যজ্যোতি। হচ্ছে না, হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে আঁকা অভ্যেস, সামনে খাড়া থাকে ক্যানভাস, চলে ডান হাত— একসঙ্গে এতগুলো কি বদলানো সম্ভব? একটা টানও নিয়ন্ত্রণে থাকছে না দিব্যজ্যোতির, এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। যা চাইছে, কিছুতেই হচ্ছে না। তবু পারতে তো হবেই। পারতেই হবে। ডান হাত কবে চলবে, তার আশায় তো বসে থাকা যায় না!

মিনিট পাঁচেক আঁকিবুকি টেনে দিব্যজ্যোতির গলদঘর্ম দশা। মাথা টিপটিপ করছে। পাশে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছিল অঞ্জলি, বলল, এবার থাক না, দাদা। আবার নয় কাল সকালে...

হুম। লাঠিটা দাও, বাথরুমে যাব।

শরীর কিন্তু কাঁপছে। পারবেন তো?

দেখি চেষ্টা করে। নইলে তুমি তো আছ।

লাঠি শক্ত করে ধরে বিছানা থেকে নামল দিব্যজ্যোতি। জোর কম, তবু বাঁ হাতে ভর দিতে হচ্ছে, টাল খেয়ে যাচ্ছে দেহ। তবে কয়েক দিনে মোটামুটি রপ্ত হয়ে এসেছে। ডান পা টেনে টেনে পৌঁছোল বাথরুমে। ওফ্, এইটুকু রাস্তাও যে কখনও কখনও এত লম্বা মনে হয়!

দিব্যজ্যোতি বেরিয়ে দেখল বিভাস এসেছে। রোজকার মতোই পরিপাটি পোশাকআশাক, নিখুঁত কামানো গাল, সযত্নচর্চিত চুল। সাজসজ্জায় কখনই বিশৃঙ্খল থাকে না ঝুমির বর। ঈষৎ ঝুঁকে খাটে পড়ে থাকা ড্রয়িংবোর্ডটা নিরীক্ষণ করছিল বিভাস, দিব্যজ্যোতিকে দেখামাত্র সসম্ভ্রমে সরে গেল দু' পা। দিব্যজ্যোতি বিছানায় ফের থিতু না-হওয়া পর্যন্ত সে কথা বলবে না। তার সহবতে বাধে।

টানা তিন মিনিট সতেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করে বিভাস গলা ঝাড়ল, আপনার ওয়াকিংটা কিন্তু মারজিনালি বেটার হয়েছে দিব্যদা।

একটু একটু হাঁপাচ্ছিল দিব্যজ্যোতি। ফুসফুসে খানিকটা বাতাস ভরে বলল, তুমি কি সোজা অফিস থেকে?

হ্যাঁ। তিন দিন থাকব না। অফিসট্যুর। ভাইজ্যাগ। তাই দেখা করতে এলাম।

ডিউটি পালন করে যাচ্ছ, অ্যাঁ?

ডিউটিটা হেলাফেলার জিনিস নয়, দিব্যদা। আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজেদের কর্তব্য ঠিকঠাক করি, তা হলেই তো পৃথিবীর অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

তোমার অফিস স্টাফদের জন্য তৈরি করা লেকচার তুমি আমার ওপর ঝাড়ছ?... ভারী ভারী কথা না বলে বসো।

থ্যাঙ্কস।

টেবিলের সামনে থেকে চেয়ারটা টেনে বসেছে বিভাস। টানটান হয়ে। দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞেস করল, ঝুনি কি আসবে আজ?

কাল আসবে। মিমলিকে নিয়ে। কৃত্তিকার আজ স্লিমিং সেন্টারে যাওয়ার দিন।

ঝুনিটা পারেও বটে। দিব্যজ্যোতি মৃদু হাসল, গায়ে একটু চর্বি লেগেছে, কি লাগেনি, ওমনি ছুটল রোগা হতে!

এক্সসেস ফ্যাট ঝরিয়ে ফেলাই ভাল। অযথা কমপ্লিকেশনস ডেভেলাপ করে না।

বিভাসের উপযুক্ত সংলাপই বটে। জীবনে নির্মেদ থাকাটাই বুঝি বিভাসের মূল লক্ষ্য। আচারআচরণ, আলাপচারিতা, সবই তার মাপাজোপা। বিভাসের সঙ্গে আড্ডা চালিয়ে যাওয়া দিব্যজ্যোতির মতো মানষের পক্ষে বেশ কঠিন। তবে এই নীরস রক্তশূন্য ব্যবহার দিব্যজ্যোতি যতই অপছন্দ করুক, এই গুণটিকে সম্বল করেই তো অফিসে তরতর সিঁড়ি ভাঙছে বিভাস! এবং ঝুনির মতো চপলমতি মেয়েও দিব্যি তার সঙ্গে ঘর করে যাচ্ছে!

দিব্যজ্যোতি বালিশে হেলান দিল। অঞ্জলিকে বলল, মাকে গিয়ে খবর দাও, বিভাস সাহেব এসেছেন।

শ্লেষটা বুঝল না বিভাস। ব্যস্ত গলায় বলল, যেতে হবে না।। আমার বড়মাসির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

অ।

দিদি শুনলাম বেরিয়েছেন...

কে দিদি?

রোহিণীদি।

অ।

দিদি তো রবিবার চলে যাচ্ছেন... কৃত্তিকা বলছিল, শনিবার রাতে ওঁকে খেতে ডাকবে... আমিও শুক্রবার ফিরে আসছি...

অ।

দিদির সঙ্গে তো এখনও আমার দেখাই হল না!

আবার একটা অ-উচ্চারণ করার আগেই ঘরে মীরা। জামাইয়ের জন্য চা-জলখাবার এনেছেন। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত থেকে ট্রে-খানা নিল বিভাস, টেবিলে রাখল। খাবারের পরিমাণ দেখে হাঁ হাঁ করল যথারীতি, তারপর খেতেও লাগল টুকটুক। গোটা চারেক ফ্রেঞ্চটোস্ট, সন্দেশ, চানাচুর...। প্লেটটাকেও বুঝি সে নির্মেদ রাখতে চায়!

টুকটাক কথা বলে মীরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরে হঠাৎই অখণ্ড নীরবতা। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে বিভাস, কথা খুঁজছে বোধহয়। আচমকা দেওয়ালে টাঙানো দিব্যজ্যোতির আঁকা একটা ছবি দেখিয়ে বলল, আপনার এই পেন্টিংটা কিন্তু ক্লাসিক।

দিব্যজ্যোতি খুব একটা আমল দিল না। এ-দেওয়ালে, ও-দেওয়ালে, বেশ কয়েকটা শিল্পকর্ম ঝুলছে তার। মাঝে মাঝেই যে-কোনও একটাকে তারিফ করার জন্য বেছে নেয় বিভাস। ছবির কিস্যু বোঝে না, তবু শিষ্টাচারের অঙ্গ হিসেবে মন্তব্য সে করবেই।

হেলাফেলার সুরে দিব্যজ্যোতি বলল, গণেশটার কথা বলছ? ওটা তো ছেলেমানুষি কাজ। সেই কলেজ পাশ করার পর পরই আঁকা। দ্যাখো না কাছে গিয়ে, সালটা লেখা আছে।

দেখেছি আগে। জানি তো... আমার কিন্তু ছবিটাকে বেশ ম্যাচিওরই লাগে। বোঝা যায়, তখন থেকেই আপনি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের দিকে ঝুঁকছেন।

তাই নাকি? তোমার বেশ দূরদৃষ্টি আছে তো! দিব্যজ্যোতি এবার যেন মজা পেয়েছে, তা এই গণেশটার মধ্যে কী বিমূর্ততা দেখলে?

শুঁড়। নরমাল শেপের নয়। ওয়াটার কালারে এঁকেছিলেন, তাই না?

স্যরি। টিলটা লাগল না। ওটা তেলরঙের কাজ।

বিদ্রূপটা গায়েই মাখল না বিভাস। মুচকি হেসে বলল, আপনি তো আবার আঁকা স্টার্ট করে দিয়েছেন দেখছি।

কোথায়! জাস্ট হাতটাকে একটু চালু করার চেষ্টা করছি। ডান হাতে তো পারছি না, তাই বাঁ হাত চালিয়ে চালিয়ে... বলতে পারো, এক ধরনের এক্সারসাইজ।

বাঁ হাতেই এখন কিছুদিন আঁকুন না, নতুন এক্সপেরিমেন্ট হবে।

তুত্, তা হয় নাকি? আঁকতে গেলে রেখার ওপর, তুলির ওপর এবং আঙুলের ওপর পুরো কন্ট্রোল দরকার। শুধু আঙুল কেন, গোটা হাতের ওপরই। প্লাস, মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের একটা মেলবন্ধনেরও ব্যাপার থাকে।

অত শত কে বোঝে, দিব্যদা? আপনার নাম থাকাই তো যথেষ্ট।

মানে?

আপনি একজন বড় শিল্পী। এমনি এমনি তো বড় হননি, প্রচুর খাটতে হয়েছে। সেই পরিশ্রমের ফলেই আজ আপনার নাম, মার্কেট, গুডউইল। আমার তো মনে হয়, আপনার যে-কোনও প্রোডাক্টই এখন বিক্রি হয়ে যাবে।

কী বললে তুমি? কী বললে? প্রোডাক্ট? মার্কেট? গুডউইল? দুম করে গলা চড়ে গেল দিব্যজ্যোতির, আর্টিস্টদের সৃষ্টি শুধুই কমোডিটি?

উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, দিব্যদা? ছবি তো বিক্রি হয়। লাখ লাখ টাকায়... কোটি কোটি টাকায়...

বটেই তো। তুমি আর এ ছাড়া কী বলবে? তোমাদের হিসেবে তো মানুষ মানে বিশ তিরিশ কেজি মাংস, দু'-তিন কেজি রক্ত, আর কয়েকটা হাড়, নাড়িভুঁড়ি। কিন্তু মানুষ মানে কি তাই? দিব্যজ্যোতি মাথা নাড়ল। গলা নামিয়ে বলল, শোনো বিভাস, শিল্প বিক্রি হয়

ঠিকই, কিন্তু বিক্রি হওয়ার জন্যই শিল্প সৃষ্টি হয় না। এনি ফর্ম অফ আর্ট, সে পেন্টিংই হোক, কি গান নাচ সাহিত্য, ক্রিয়েট হয় মনের তাগিদ থেকে। প্যাশনই এর জন্ম দেয়। কত শিল্পী ছবি এঁকেও অন্ধকারে তলিয়ে গেছেন, খবর রাখো? কত শিল্পী নিজের জীবদ্দশায় ছবির কানাকড়িও মূল্য পাননি। অথবা যা পেয়েছেন, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি তাঁদের প্রাপ্য ছিল। বেঁচে থাকতে ভ্যান গখের তো একটা ছবিও বিক্রি হয়নি, তবু কিন্তু তিনি এঁকে গেছেন। কেন? ভবিষ্যতে কোনও একদিন তাঁর নামের গুডউইলে ছবি মার্কেটে কমোডিটি হিসেবে একশো-দুশো কোটি টাকায় বিক্রি হবে, এই আশায়? দিব্যজ্যোতির ঠোঁটের কোণে আস্তে আস্তে একটা হাসি ফুটে উঠল। গলা আরও নামিয়ে বলল, দ্যাখো, আমি ভ্যান গখ নই, পিকাসো নই। অবন ঠাকুর, রামকিঙ্করও নই। আমার লিমিটেশন আমি জানি। আমি একদমই এক মাঝারি মাপের পেন্টার। ছবি বিক্রি হয়ে কিছু টাকা পেলে আমার খুব ভালও লাগে। তবু আমি একজন শিল্পীও তো বটে। যে-ছবি আমার হৃদয় থেকে আসবে না, যে-ছবি আমার ভেতরের অনুভূতিগুলোকে আমার মতো করে ফোটাতে পারবে না, সেই ছবির জন্য আমি তুলি ধরি না বিভাস। নিজেকে ক্রমাগত ভাঙছি, নতুন নতুন ফর্ম খুঁজছি, তা কি শুধুই কিছু টাকা রোজগারের জন্য?

কিন্তু আপনারা তো ছবি মার্কেটিংয়ের জন্য দিচ্ছেন, দিব্যদা। এ-কথাটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

দিচ্ছি। তবে আঁকাটায় আমার কোনও ফাঁকি নেই। হাত চলে না, তবু যা হোক একটা কিছু বানিয়ে দিলাম... সরি, দিব্যজ্যোতি সিংহ তা পারে না।

তর্কের অভিঘাতে দিব্যজ্যোতি ঘেমে গেছে। শ্বাস টানছে জোরে জোরে। বিভাস আরও কিছু বলতে গিয়েও যেন বলল না। কাছে এসে দিব্যজ্যোতির কাঁধে হাত রেখেছে, আমি কিন্তু আপনাকে হার্ট করতে চাইনি, দিব্যদা।

জানি। দিব্যজ্যোতির হাসি মলিন দেখাল, তুমি তোমার ধ্যানধারণা

মতো চলেছ। ইটস ও কে। হয়তো আজকালকার হিসেবে খুব একটা ভুলও বলোনি।

আজ তবে আসি?

এসো।

বিভাস চলে যাওয়ার পর দিব্যজ্যোতি শুয়ে পড়ল। নিজে নিজে পারল না, শরীরটা কাঁপছিল, অঞ্জলি শুইয়ে দিল তাকে। মাথাটাও কেমন যেন বিবশ হয়ে আসছে। রাতের নার্স এসে খেতে না-ডাকা পর্যন্ত পাতলা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল দিব্যজ্যোতি।

রোহিণী ফিরল দশটা নাগাদ। তার খানিক আগে ঘুমের ওষুধ খেয়েছে দিব্যজ্যোতি, স্নায়ু তখনও শিথিল হয়নি। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিল মা'র সঙ্গে কথা বলছে রুনি। হঠাৎ রুনি হেসে উঠল। দিব্যজ্যোতির ঠাকুরদার আমলে তৈরি দোতলা বাড়িখানা গলির ভেতরে, পাড়াটা তাড়াতাড়িই নিস্তব্ধ হয়ে যায়, হাসিটা তাই একটু জোরেই কানে বাজল দিব্যজ্যোতির।

ক্ষণ পরে হালকা পদশব্দ। অচেনা সুগন্ধীর ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। রাতবাতির আলোয় রুনিকে দেখতে পেল দিব্যজ্যোতি। বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী ব্যাপার? এখনও চোখ খোলা কেন?

ঘুম আসতে একটু সময় লাগে।... আজ মাথাটাও কেমন টিপটিপ করছে।

প্রেশার বাড়ল নাকি?

বুঝতে পারছি না।

রোহিণীকে যেন সামান্য উৎকণ্ঠিত মনে হল। লাগোয়া ঘর থেকে ডাকল রাতের নার্সকে। টিউবলাইট জ্বেলে, প্রেশার মাপার যন্ত্র নিয়ে, টুল টেনে বসেছে। স্টেথো লাগাল কানে।

পারদের ওঠানামা পরীক্ষা করে রোহিণীর ভুরুতে ভাঁজ, সিস্টোলিকটা বেশ বাড়িয়েছ দেখছি!

যাচ্ছে বেড়ে মাঝে মাঝে, কথা শুনছে না। দিব্যজ্যোতি ঈষৎ লঘু স্বরে

বলল, তুই তো ডাক্তার, বল কীভাবে শায়েস্তা করা যায়। আলুনি আলুনি খাবার খাচ্ছি, সিগারেট বন্ধ, অ্যালকোহলের প্রশ্নই নেই... আর কী করতে পারি?

তর্ক করাটা কমাও। মিছিমিছি ব্রেনকে এক্সাইট করছ কেন?

মা বুঝি বিভাসের রিপোর্টটা দিল?

ভালমানুষ পেয়ে বেচারাকে খুব দাবড়াও, অ্যাঁ?

বেচারা? ভালমানুষ?

নয়? ঝুনিকে যে বিয়ে করেছে, সে তো বেচারাই।

আর সোহম? সে কীরকম?

মুহূর্তের জন্য তীব্র দৃষ্টি হানল রোহিণী। বুঝি-বা বিভাস সোহমকে এক পঙ্‌ক্তিতে বসানো তার পছন্দ হয়নি। পরক্ষণে নির্লিপ্ত মুখে প্রেশার মাপার যন্ত্র গোছাচ্ছে।

দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞেস করল, সোহমের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলাপ হল?

হুঁ।... বড়মাসি বলছিল তোমার নাকি আমার সঙ্গে কী কাজ আছে?

আমার কাজের জন্য তোর সময় হবে? রোববার তো চলে যাচ্ছিস!

কাজটা কী?

একবার সোনামাটি ঘুরে আসতিস। সুবর্ণলতায়। জায়গাটা দেখাও হত, ওখানকার মেয়েদের একটু হাইজিন টাইজিন নিয়ে বুঝিয়েও আসতে পারতিস। একে ডাক্তার, তায় মেয়ে, তুই ওদের সঙ্গে ভাল কমিউনিকেট করতে পারবি।

বলছ যখন, যাব। ঘুরে আসব তোমার নতুন খেলাঘর থেকে।

দিব্যজ্যোতি যেন নিবে গেল সহসা। রোহিণী লক্ষ করল না, বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

প্রকাণ্ড কক্ষে আবার সেই রাতবাতি। আবার সেই আবছায়া। আবার সেই নিজের মুখোমুখি হওয়া।

আট

অধ্যক্ষের ঘরে স্থান অকুলান বলে মিটিং আজ কলেজের বড় স্টাফরুমে। স্থির করা হচ্ছে আগামী শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভরতি হওয়ার নীতি। অধ্যক্ষ মৃগাঙ্ক সেন তেমন একটা পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়, তবে অ্যাডমিশন টেস্টের ব্যাপারে তার কয়েকটা পরামর্শ আছে, সেগুলোই বলছিল সাজিয়েগুছিয়ে। লিখিত পরীক্ষার গুরুত্ব খানিকটা কমিয়ে স্বাভাবিক অঙ্কনক্ষমতাকে আরও বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কি না, কিংবা মৌখিক পরীক্ষায় চিত্রশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান কতটা যাচাই করা উচিত, এইসব।

এমন মিটিং ফি বছরই হয়। কী অশ্বডিম্ব প্রসব হবে তা তো সকলের জানা। বেশির ভাগ শিক্ষক শিক্ষিকাই তাই নীরব শ্রোতা। এক-আধজন ঢুলছে, কেউ কেউ নিয়মমাফিক হুঁ হ্যাঁ করছে। তবে চা বিস্কুট চলছে ঘনঘন। দুধ-চা, লিকার-চা, চিনি ছাড়া চা, চিনি সহ চা...। শুধু জনা তিন-চারজন অল্পবয়সি অতি উৎসাহে মতামত জানাচ্ছে টুকটাক। চোখ নাক কুঁচকে শুনছে মৃগাঙ্ক, কাগজে নোটও করে নিচ্ছে। অবশ্য শেষ অবধি বক্তব্যগুলোকে সে বিশেষ আমল দেবে, এমন সম্ভাবনা নিতান্তই কম। তরুণ তুর্কিরাও জানে এ-কথা, তবু তাদের কিছু না-কিছু বলা চাই। এ যেন একটা খেলা।

সভা শেষ করার আগে মিটিংয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আর একবার পড়ে দিল মৃগাঙ্ক। ছাত্রসংসদের এক প্রতিনিধিও উপস্থিত আছে আজ, তাকে জিজ্ঞেস করল, কী হে সঞ্জয়, তোমাদের কোনও আপত্তি নেই তো?

সঞ্জয় একটু মুখচোরা ধরনের। খ্যাতনামা-স্যার ম্যাডামদের ভিড়ে সে আড়ষ্ট বোধ করে। তার মুখ থেকে কথা খসার আগে প্রবীণ অধ্যাপক বিজিতের মন্তব্য, ও কী বলবে? ওরা কি অতশত বোঝে?... সঞ্জয়, যাওয়ার সময়ে ক্যান্টিনে চা বলে দিয়ো তো, শেষবেলায় গলাটা আর একবার ভিজিয়ে নিই।

বেলা সত্যিই শেষ। বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এল। চায়ের অপেক্ষায় না-থেকে অনেকেই বেরিয়ে পড়ছে গুটিগুটি। যেতে যেতেই ছোট ছোট জটলায় চলছে খুচরো গল্প আড্ডা।

ফাইলপত্র গুছিয়ে মৃগাঙ্কও উঠে দাঁড়াল। বিজিতকে বলল, কাল লেট আওয়ারে একবার আমার চেম্বারে আসতে পারবেন, বিজিতদা? আপনার পেনশন পেপারগুলো নিয়ে একটু বসব ভাবছিলাম।

বিজিত মৃদু হেসে বলল, মুক্তির ঘণ্টাটা আর এক একবার শুনিয়ে দিলে?

উপায় কী, বিজিতদা। আপনার মতো শিল্পীকে ধরে রাখতে পারলে আমরা তো ধন্য হতাম। আপনার কাছ থেকে স্টুডেন্টদেরও কত কিছু শেখার আছে। কিন্তু..

সংকুচিত বোধ করছ কেন। আমি খুশি মনেই বিদায় নেব। কালের নিয়ম তো মানতেই হবে। বিজিতকে সামান্য উদাস দেখাল, তবে কলেজের কথা খুব মনে পড়বে। এতগুলো বছর... কী সুন্দর কাটল...

সে আর বলতে।... তা হলে কাল তিন-চারটে নাগাদ আসছেন তো চেম্বারে?

ঘড়ি দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল মৃগাঙ্ক। পিছন পিছন আরও কয়েকজন। রমানাথ ব্যাগে একটা বই ঢোকাচ্ছিল। চেন আটকে বলল, আপনি ভাল সময়েই যাচ্ছেন বিজিতদা। কলেজের পরিবেশটা এখন যেন কেমন হয়ে গেছে। লাইফ নেই।... দেখুন না, মিটিংগুলোও একদম ম্যাদামারা বনে গেছে।

মৃগাঙ্করই সুবিধে। পরমেশ দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, এখন মৃগাঙ্ক যা যা ডিসিশন নিচ্ছে, সব পাশ।

বিজিত বলল, আহা, ও অন্যায্য প্রোপোজাল কিছু দিয়েছে নাকি?

ন্যায্য অন্যায্যর কথা ছাড়ুন। চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে কি? মৃগাঙ্ক তো শুধু তাড়া লাগায়, আর ঘড়ি দেখে।

হুম। এসব মিটিংয়ে দিব্যর খুব দরকার ছিল। ও ব্যাটা থাকলে ওরাল এগজামিনেশন আরও স্ট্রিক্ট করার প্ল্যানটা গুবলেট হয়ে যেত।

বিজিত বলল, কিন্তু মৃগাঙ্কর উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়। বেটার কোয়ালিটির ছেলেমেয়ে চাইছে।

কাউন্টার যুক্তিও আছে। দিব্যজ্যোতি থাকলে অবশ্যই বলত, স্টুডেন্টরা তো কলেজে হিস্ট্রি অফ আর্ট পড়বেই। আগে থেকে তাদের সর্বজ্ঞ হয়ে আসার দরকার কী।

বনানী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। বলে উঠল, স্ট্রেঞ্জ! কথাটা তো আপনিও মিটিংয়ে বলতে পারতেন। আপনাদের মতো সিনিয়ার টিচারও যদি চুপ থাকেন...

যাক। মৃগাঙ্ক যেমনটা স্যুটেবল মনে করছে, চালাক। আমাদের কী, ভাল ছাত্র ভরতি হলেও পড়াব, খারাপ ছাত্র এলেও পড়াব। তর্কাতর্কির ঝামেলা আমার পোষায় না।

স্টাফরুম প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। হৈমন্তী জানলার ধারে গিয়ে মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল, বোতাম টিপে ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগে রাখল ফোন। কান বোধহয় এদিকেই খাড়া ছিল, চেঁচিয়ে বলল, এখানেই তো দিব্যজ্যোতি সিংহর সঙ্গে আমাদের তফাত রমাদা। কথা অনেকের গলাতেই বুড়বুড় করে, কিন্তু দিব্যদার মতো বেপরোয়াভাবে কেউ বলে দিতে পারে না।

রমানাথ বলল, তোমার আবার একটু বেশি দিব্যপ্রীতি। কী এমন গুণের আকর ছিল দিব্য? তক্কো হুজ্জোত চেঁচামেচিটা ভাল পারত, আর একটা না-একটা পয়েন্ট খুঁজে নিয়ে বিবাদ বাধিয়ে দিত, ব্যস।...

মৃগাঙ্কদাকে সামনে পেলে তো আরও বেশি করে করত। বনানী সায় দিল, বেচারা মৃগাঙ্কদা নিরীহ মানুষ, লড়াই ঝগড়া মোটেই আসে না।

মৃগাঙ্কর ব্যাপারটা আলাদা। ওকে নিয়ে দিব্যজ্যোতির একটা কমপ্লেক্স ছিল। চশমা খুলে টেবিলে রাখল বিজিত। চোখের পাতা ঘষতে ঘষতে বলল, দু'জনে একই সঙ্গে পাশ করেছে... হঠাৎ একদিন মৃগাঙ্ক ওর মাথার ওপর প্রিন্সিপাল হয়ে বসে গেল... দিব্যর খুব ইগোতে লেগেছিল।

বেশ সুগারকোটিং করে দিলেন তো, বিজিতদা। সাফ সাফ বলুন না,

দিব্য হিংসেয় জ্বলত। একটা দিনের জন্যও ও মৃগাঙ্ককে স্ট্যান্ড করতে পারেনি। প্রিন্সিপালের চেয়ারটার যে একটা মর্যাদা আছে, সেই বোধটাই ওর ছিল না। আপনারা তো মৃগাঙ্কর ঢের ঢের সিনিয়ার, কই আপনারা তো তার পেছনে কখনও আদাজল খেয়ে লাগেননি!

বনানী মাথা নাড়ল, হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক। আমরাও হয়তো অনেক সময়ে দিব্যদাকে সাপোর্ট করেছি, কখনও কখনও হয়তো উসকেওছি। তবে এটাও তো মানতে হবে, দিব্যদার মধ্যে একটা বিশ্রী পরশ্রীকারতা আছে। সমান কেউ দিব্যদার চেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, দিব্যদা এটা হজম করার বান্দাই নয়। এবং তার জন্য যে-কোনও লেভেলে দিব্যদা নেমে যেতে পারত। আই মিন, পারে।

যাহ্, তুই কিন্তু রংটা একটু চড়া করে দিচ্ছিস। হৈমন্তী চেয়ার টেনে বসল। পাখার হাওয়ায় এলোমেলো চুল উড়ছিল, দু'হাতে ঠিক করতে করতে বলল, ওইরকম জেলাসি কার মধ্যে একটু-আধটু নেই রে ভাই?

দ্যাখো, হিংসে করাটা আলাদা। আর ভিন্ডিক্টিভ হয়ে ওঠাটা আলাদা। রমানাথ আঙুল তুলল, তুমি কি কলেজে সেই অ্যাজিটেশনের ব্যাপারটা ভুলে গেলে? মৃগাঙ্ক প্রিন্সিপাল হয়ে জয়েন করার পর পরই স্টুডেন্ট ইউনিয়ন হঠাৎ খেপে গেল... সারাদিন ঘেরাও করে রেখেছে প্রিন্সিপালকে, জল খেতে দিচ্ছে না, বাথরুমে পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না...

সঙ্গে কী কুচ্ছিত কুচ্ছিত স্লোগান! ছিঃ।... ধান্দাবাজ মৃগাঙ্ক সেন দূর হঠো, দূর হঠো! স্টুডেন্টদের পয়সা মেরে পেটমোটা করা চলবে না, চলবে না! আরে ভাই, ক্যান্টিনের সাবসিডি তোরা বাড়াতে চাস, তার জন্য ওই ভাষা! ক্যান্টিনটার ফাটাফুটো দশা তো চিরকালই। সেই আমরা যখন স্টুডেন্ট, তখন থেকেই। হঠাৎ মৃগাঙ্কদা দায়ী হয়ে গেল কী করে? আর সারাতে হলেও তো দু'-চার-ছ'মাস সময় লাগে। হুট বললেই তো হয় না, গভর্নমেন্টের থেকে গ্রান্ট পাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। বাট নো মার্সি। মৃগাঙ্কদা তখন সবে চার মাস হল জয়েন করেছে...

কিন্তু ওই অ্যাজিটেশনের সঙ্গে দিব্যদার কী সম্পর্ক? হৈমন্তী চোখ

ঘোরাল, আমি তো বরং উলটো ছবি দেখেছি। দিব্যদা আমার সামনে মৃগাঙ্কদাকে বলেছিল, স্টুডেন্টদের প্রেশার ট্যাকটিসে একদম মাথা নোওয়াবি না। দিব্যজ্যোতি সিংহ তোর পাশে আছে, দেখি ওরা কী করে।

পরমেশ হঠাৎ হৈমন্তীর পক্ষ নিয়েছে, আমিও কিন্তু দেখেছি দিব্যজ্যোতি প্রিন্সিপালের ফেভারেই বলছিল। ইনফ্যাক্ট প্রিন্সিপাল তো তখনই রিজাইন করতে যাচ্ছিল, দিব্যজ্যোতিই তাকে নিষেধ করে।

ওটাই তো দিব্যর ক্যাচ। রমানাথ ফিক করে হাসল, সাধে কি বলি, ও অনেক উচ্চমাগের জীব। সাপের গালেও যেভাবে চুমু খাবে, ব্যাঙের গালেও একই স্টাইলে চুমু দেবে। ইয়াগোও ওকে দেখে লজ্জা পেয়ে যাবে রে ভাই।

তার মানে আপনি বলছেন দিব্যদাই ছেলেমেয়েদের খেপিয়েছিল?

অবশ্যই। সেবারের জি. এস তীর্থঙ্কর আমার কাছে কনফেস করেছে। এই তো, মাস তিনেক আগে একটা চাকরির রেকমেন্ডেশনের জন্য এসেছিল। জাস্ট ঠাট্টা করে বলেছিলাম, দেখিস আমার বদনাম করে দিস না, পরে যদি কলেজের মতো হল্লাবাজি করিস, আমার প্রেস্টিজটা পাংচার হয়ে যাবে। তখনই আমায় খুলে বলল সব। কবে কোথায় দিব্য ওদের সঙ্গে মিটিং করেছিল... কী কী পয়েন্টে কীভাবে মৃগাঙ্ককে চেপে ধরতে হবে শিখিয়েছিল...। তীর্থঙ্কর তো পরিষ্কার বলে গেল, ওরা প্যারসোনাল অ্যাটাক করতে চায়নি, কিন্তু ব্যাপারটা যেন কী করে সেদিকেই গড়িয়ে গেল।

বনানী বলল, আমি কারও মুখ থেকে শুনিনি। তবে আগাগোড়াই আমার কেমন সন্দেহ ছিল। ওদের পেছনে নিশ্চয়ই একটা কেউ আছে! নইলে ওরা অত বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায়? পুতুলনাচের সেই কারিগরটি যে দিব্যদাই, এটাও আন্দাজ করেছিলাম। কারণ সে পার্টি করা লোক, কীভাবে একটা আন্দোলনকে চাগিয়ে দিতে হয় ভালমতোই জানে, স্টুডেন্টদের ওপরও তার একটা ম্যাগনেটিক ইনফ্লুয়েন্স আছে।

হৈমন্তী বলল, কী জানি, আমার তো এখনও বিশ্বাস হয় না।

স্টুডেন্টদের সঙ্গে দিব্যদার চমৎকার সম্পর্ক। শুধু ইউনিয়ন নয়, সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই। একেবারে বন্ধুর মতো মিশতে পারে দিব্যদা। ওদের প্লেনে নেমে, ওদেরই একজন হয়ে। এই ক্ষমতাটা আমাদের মধ্যে খুব কম টিচারেরই আছে।

রমানাথ বলল, দিব্যর মতো স্যাম্পেলই বা আমাদের মধ্যে ক'টা আছে, হৈমন্তী?

উত্তরে হৈমন্তী কিছু বলতে যাচ্ছিল, থালায় কাপ সাজিয়ে রামখেলাওনকে ঢুকতে দেখে থেমে গেছে। বিজিত হেসে বলল, থাক, চা-টা এসে গেছে। অনেক পরচর্চা হয়েছে, এবার চা খেয়ে যে যার মতো কেটে পড়ি চলো।

হৈমন্তী বলল, এই চায়ের পয়সাটা কিন্তু আমি দেব।... বিজিতদা, বিস্কুট দিতে বলি?

না না, শুধু চায়ের কোনও বিকল্প নেই। যেমন আমাদের দিব্যরও কোনও বিকল্প নেই।

রমানাথ ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। চোখে পড়তেই বিজিতের মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলল, আহা, চটে যাচ্ছ কেন? দিব্য স্বর্গ থেকে খসে পড়া দেবতা, এ-কথা তো আমি বলছি না। দোষ তো তার ছিলই। চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও আছে।... এই যে হৈমন্তী বলল, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দিব্যর খুব মাখামাখি, এটাও ভুল কথা নয়। ভাল করে পড়াতে পারুক না-পারুক স্টুডেন্টদের সঙ্গে ও জমে যেতে পারে। এক্স স্টুডেন্টরা তো এখনও দিব্যদা দিব্যদা করে পাগল। তার মানে নিশ্চয়ই এর পেছনে দিব্যর কোনও প্লাস পয়েন্ট আছে! সাম পজিটিভ কোয়ালিটি!

তা তো বটেই। স্টুডেন্টদের নিয়ে মালের আসর বসালে পপুলারিটি তো বাড়বেই।

রামখেলাওন বেরিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বিজিত বলল, দ্যাখো রমা, জীবনের সবক্ষেত্রেই দুয়ে দুয়ে চার কোরো না। তোমরা... তোমরা কেন, আমিও... আমাদের স্টুডেন্টদের বোধহয় ঠিক

এস্টিমেট করি না। ভাবি, দু'-চারটে চিপ স্টান্ট দিলেই তাদের ওপর কন্ট্রোল নেওয়া যায়। ধারণাটা কিন্তু মোটেই সঠিক নয়। ওদেরও কিন্তু একটা থার্ড আই থাকে। সেই চোখ দিয়ে ওরা বুঝে নেয়, কোন স্যার অ্যাট হার্ট ভাল, কার ভেতরটা ফাঁপা। এখন তো দিব্য পড়ায় না, তবু পুরনো ছেলেমেয়েরা যে দিব্যজ্যোতির কাছে ছুটে ছুটে যায়, এটাকে তুমি কীভাবে এক্সপ্লেন করবে? নিশ্চয়ই তারা দিব্যর মধ্যে কিছু পায়।

কী পায়? ছবি বিক্রির ফন্দিফিকির? নাকি ইন্সপিরেশন?

তা জানি না। তবে কিছু একটা তো পায়ই।... আমাদের কথাই ধরো না। দিব্য তার সহকর্মীদের জন্য চিন্তাভাবনা করত, এটা তো মানবে। শ্যামাপদ এক বছরের ছুটি নিয়ে প্যারিস গেল, সেই লিভটা নিয়ে তো পরে বিস্তর কমপ্লিকেশন হয়েছিল। ডি পি আই অফিসে দৌড়োদৌড়ি করে দিব্যই তো ক্লিয়ার করেছিল কেসটা।... তারপর... দু'সপ্তাহের মধ্যে হিমাংশুর পাসপোর্টটা করিয়ে দিল।

ওর অনেক কানেকশনস, তাই করতে পেরেছে। অসুবিধেয় পড়ে কেউ রিকোয়েস্ট ফিকোয়েস্ট করলে ও ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিত। আর যতটা করত, তার চেয়ে ঢের বেশি শোনাত।

তবু... করেই বা ক'জন?... তোমরা যে যাই বলো, দিব্যকে আমরা সত্যিই খুব মিস করি। ভাবতে খারাপ লাগে, ওরকম একটা লাইভলি ছেলে... স্টাফরুমটাকে জমিয়ে রাখত... হা হা হাসছে, গলা ছেড়ে গান গাইছে... বেচারার যে কী হল!

এবারটা বোধহয় সামলে গেছে। রমানাথ উঠে দাঁড়াল। ব্যাগ কাঁধে তুলে বলল, আমি ওর অ্যাডমায়ারার নই, তবু আমি বলব থ্যাঙ্ক গড, তেমন সিরিয়াস কিছু হয়নি।

তুমি গেছিলে দেখতে?

হসপিটালে ভিড় করতে ভাল লাগে না। বাড়ি ফিরেছে, ভাবছি এবার একদিন যাব। তবে মোহিত অনন্তরা তো গেছিল। হৈমন্তীও তো...। দিব্যর স্পিচ এখন নরমাল না?

শুধু নরমাল! খুব বেশি বকবক করছে। হৈমন্তী চোখ ঘোরাল, যত

চুপ করতে বলি, তত কথা বেড়ে যায়।... দেখলি তো হৈমন্তী, আমি কেমন যমেরও অরুচি! বিধাতা বলে দিয়েছেন, যদ্দিন না তোমার মর্তের মিশন ফুলফিল হচ্ছে, এদিকে নো এন্ট্রি!

বিজিত বলল, তা হলে আমিও একদিন ঘুরে আসব। নার্সিংহোমে তো হয়ে উঠল না, নিজেই জ্বরে পড়ে গেলাম।

যান না। কলেজের কাউকে দেখলে খুব খুশি হয়। সেদিন তো আপনার কথা জিজ্ঞেসও করছিল। মাথা একদম ক্লিয়ার, আপনার রিটায়ারমেন্টের ডেটটাও মনে আছে।

পরমেশও উঠে পড়েছে। হাতে ফোলিও ব্যাগখানা ঝুলিয়ে বলল, আমি যেদিন নার্সিংহোমে গিয়েছিলাম, সেদিন তো খুব ভিড়। তার মধ্যেও হেসে হেসে...। আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবকে তো রীতিমতো লেগপুল করছিল।

বনানীর চোখ বড় বড়, মৃগাঙ্কদা গিয়েছিলেন?

ইয়েস ম্যাম। রমানাথ ফুট কাটল, দিব্যু এমনই চিজ, যাকে সে যাঁতা দেবে, সেও অসুখের সময়ে তাকে দেখতে যাবে।

যাহ্, তুমি না...! পরমেশ হালকা ধমক দিল, আফটার অল ওরা পুরনো বন্ধু...। বলতে বলতে বিজিতকে ডাকছে, কী দাদা, যাবেন তো এবার?

তোমরা এগোও। আমি একটু বাথরুম ঘুরে আসছি।

বনানী বলল, চল হৈমন্তী, আমরাও বেরোই। তুই গাড়ি এনেছিস তো?

হ্যাঁ। কেন?

তুই তো গল্ফ গ্রিনে ফিরবি, আমায় একটু রাসবিহারীতে নামিয়ে দিস, প্লিজ।

নো প্রবলেম।

স্টাফরুমের বাইরে করিডোরটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার। পার হয়ে নীচে নামল চার শিক্ষক-শিক্ষিকা। গেটের দিকে এগোতে এগোতে রমানাথ বলল, বিজিতদা তো দিব্যকে একটু বেশিই স্নেহ করেন, তাই

মুখের ওপর বলা গেল না। ছেলেমেয়েরা দিব্যর অনুগত একটিই কারণে, তারা কখনও দিব্যর স্বরূপটা দেখতে পায়নি।

তা অবশ্য অনেকটাই ট্রু। পরমেশ একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, দিব্যজ্যোতি সিংহ সাংঘাতিক ইমেজ কনশাস। এবং ইমেজটাকে ও টিকিয়েও রাখতে জানে। ওর অ্যাপারেন্টলি বোহেমিয়াম চালচলন দেখে স্টুডেন্টদের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয়, তাদের প্রিয় স্যারের কীরকম একটা ক্যালকুলেটিভ মাইন্ডও রয়েছে। একমাত্র যারা ওর সঙ্গে কাজ করেছে, তারাই ওটা হাড়ে হাড়ে জানে। আমার লাইফের সেকেন্ড... না না, থার্ড এগজিবিশন আমরা করেছিলাম তিনজন। দিব্যজ্যোতি, শতরূপা আর আমি। কথা হয়েছিল, দশ থেকে পনেরোর মধ্যে আমাদের ছবির দাম থাকবে। দিব্য স্রেফ আন্ডারকাট করে নিজের সাতখানা ছবি বেচে দিয়েছিল। আট-সাত যে-দামে পেরেছে ঝেড়েছে। সে কী সিন, ওর ছবিতে টুপটুপ লাল টিপ পড়ছে, এদিকে আমি আর শতরূপা বসে বসে আঙুল চুষছি!

রমানাথ হেসে বলল, প্রয়োজনে আন্ডারকাট তো সবাই করে। খুঁজে দ্যাখো, হুসেনও ফার্স্ট লাইফে করেছেন।

সে তো ভাই আমিও করেছি। ঠেকে শিখে। কিন্তু যাদের সঙ্গে এগজিবিশন করছি, তাদের কাছে লুকোছাপা করে নয়। ওই ধরনের ডিজঅনেস্টি করতে একমাত্র দিব্যজ্যোতিই পারে।

হৈমন্তী হাসতে হাসতে বলল, ওই দোষ দিব্যদার এখনও যায়নি। এখন অবশ্য আর একটা ট্যাকটিক্সও খেলে। গ্যালারির সঙ্গে যোগসাজশে দামটা চড়িয়ে রাখে। মিডিয়ার সঙ্গেও ভাল র‍্যাপো আছে, তাদের দিয়েও একটা হাইপ তুলে দেয়। অবশ্য এ দোষে দিব্যদা একাই দোষী নয়, আরও অনেকেই আছেন। তবে দিব্যদার পাবলিসিটিটা অনেকের চেয়েই বেশি। আই মিন, অতটা বোধহয় দিব্যদা ডিজার্ভও করে না।

অ্যাজ এ পেন্টার, দিব্যদা তত বড় মাপের নয়ও। গত পাঁচ-সাত বছরে কী এমন স্পেশাল কাজ করেছে? সাবজেক্ট তো অলমোস্ট সেম,

কালার যা একটু-আধটু বদলাচ্ছে। লাইনগুলোও সব এক ধাঁচে।

তা অবশ্য আমি বলব না। ভ্যারিয়েশনের চেষ্টা দিব্যজ্যোতি কিন্তু করছে। লাস্ট এগজিবিশনটা তো বেশ স্টার্টলিং ছিল। ওপেনিংয়ের দিন ডেকেছিল, গিয়ে দেখেছি। গিমিকটা অনেক কম। বোধহয় ওই সুবর্ণলতা খোলার পর থেকে একটা হিউম্যান পয়েন্ট ওর মধ্যে জেগে উঠছে।

হবে হয়তো। তবে সুবর্ণলতা দেখিয়ে আমাদের কিন্তু খুব টুপি পরিয়েছিল।... তোর মনে আছে হৈমন্তী, দিব্যদা কেমন জোরজার করে আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল?... একটা মহৎ কাজ হবে, হেল্‌প করাটা তো তোমাদের মরাল ডিউটি...! পরে জানা গেল, দিব্যদা তার দিদিমার রেখে যাওয়া একটা মোটা টাকা পেয়েছিল ওই কাজের জন্য!

এখন তো শুনছি, গর্ভনমেন্ট থেকেও এড পাচ্ছে। ফরেন থেকেও মোটা ফান্ড আসে।

দিব্যজ্যোতি শাহেনশা লোক, ভাই। স্টার্ট যখন করেছে, সুবর্ণলতাকে ঠিক ঘ্যাম কিছু করে ছাড়বে। যত রকম কানেকশন আছে, সব ইউজ করবে। দেখলে না, পার্টির থ্রু দিয়ে কতগুলো জায়গায় ম্যুরাল বানাল! রবীন্দ্র ভবন, নজরুল ভবন, সুকান্ত ভবন— ম্যুরাল বাই দিব্যজ্যোতি সিংহ' সেরিব্রালটা হয়ে ব্যাটা একটু দ-এ পড়ে গেল। খাড়া হতে পারলেই আবার ঠিক খেল শুরু করে দেবে।

বিজিত এসে পড়েছে। বিজিতের গাড়িতে উঠে গেল রমানাথ আর পরমেশ, তিনজনই উত্তরে যাবে। বনানী আর হৈমন্তী এগোল কম্পাউন্ডের শেষ প্রান্তে রাখা লাল মারুতিটার দিকে।

পিছনের সিটে বসে হৈমন্তী শরীর ছেড়ে দিয়েছে। বনানীও পাশে চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর ফুরফুরে হাওয়ায় দু'জনেই যেন দিনের ক্লান্তি তাড়াচ্ছে।

হঠাৎই হৈমন্তী বলল, আজ দিব্যদার বড় বেশি কুচ্ছো গাওয়া হল। তাই না?

বনানী উদাস গলায় বলল, যা সত্যি তাই তো বলা হয়েছে। তাও তো দিব্যদার আসল ভাইসটার কথা ওঠেনি।

নারীদোষ?

আর কী! কত মেয়েকে নিয়ে যে শুয়েছে!

তারা শুত কেন? গ্রিন সিগনাল না পেলে দিব্যদা কখনও কোনও মেয়ের দিকে এগোত না, আমি হলফ করে বলতে পারি। আমাদের সঙ্গে তো এত ক্লোজ, একবারও আমাদের কোনও অশালীন ইঙ্গিত দিয়েছে? যা রটেছে, তার অনেকটাই রং চড়ানো। দিব্যদাকে তো কম লোক হিংসে করে না, তারই...। এই রমাদা টমাদারাই তো দিব্যদা সম্পর্কে ভয়ংকর জেলাস।

মানছি। তা বলে দিব্যদাকে একেবারে ক্লিন চিট দিস না। বউ তো এমনি এমনি কশাদ বসুর সঙ্গে ভাগেনি।

পৃথার ওপর কিন্তু দিব্যদার ভয়ংকর উইকনেস ছিল। তুই তখনও জয়েন করিসনি, জানিস না, যেদিন ফাইনাল ডিভোর্সটা হয়ে গেল, কলেজে এসে দিব্যদার সে কী হাউমাউ কান্না! পৃথা আর আমার রইল না... পৃথা আমার জীবন থেকে একেবারে চলে গেল...!

বনানী চোখ টিপল, কুমিরের কান্না নয় তো? আমি কিন্তু আসার পর দেখেছি, পারমিতা বলে মেয়েটাকে নিয়ে খুব লাট খাচ্ছে।

হৈমন্তী হাসল, মন বড় আজব চিজ রে ভাই! হয়তো কান্নাটাও সত্যি, পারমিতাও। কিংবা হয়তো দুটোই মিথ্যে। কে জানে!

নয়

তুমি কী মিষ্টি দেখতে গো মাসি! তোমার মতো সুন্দর আমি আর একটাও দেখিনি।

মিমলির পাকা পাকা কথায় খিলখিল হেসে উঠল কৃত্তিকা, মাসিকে তুই আজ এই প্রথম দেখলি নাকি?

হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে মিমলি লজ্জা পেয়েছে খুব। চোখের পাতা কাঁপিয়ে বলল, কী করব, বলতে ইচ্ছে হল যে!

এখন? এই খাবার টেবিলে বসে? কৃত্তিকার হাসি থামছে না। উচ্ছল স্বরে বলল, তোর দেখছি আরও একটা ভক্ত বেড়ে গেল রে, দিদি!

রোহিণীর মুখোমুখি বসেছে বিভাস। ঠোঁটে তার পরিমিত হাসি। ফিশফ্রাইতে কামড় দিয়ে বলল, আমিও তো দিদির অ্যাডমায়ারার। এই দুনিয়ায় সুন্দরের অনুরাগী কে নয়!

রোহিণী চোখ তুলেছে। আলগা ধমক দিয়ে বলল, আহ্ বিভাস, তুমিও এই আধবুড়িটাকে নিয়ে মজাক শুরু করলে!

আপনি আধবুড়ি! এখনও স্বচ্ছন্দে আপনাকে কৃত্তিকার ছোট বোন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

পলকের জন্য কৃত্তিকার দৃষ্টি চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল বিভাসের মুখে। পরক্ষণে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে ফিরিয়েছে নিজেকে। হালকাভাবে বলল, বাপ মেয়েতে মিলে আমার দিদির রূপ গিললেই চলবে? হোস্টের ডিউটিটাও একটু পালন করো। ভাল করে খেতে বলো দিদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে দম দেওয়া পুতুলের মতো বিভাস বলে উঠেছে, হ্যাঁ দিদি, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না, খালি খুঁটছেন। কৃত্তিকা আজ নিজের হাতে আপনার জন্য কত কী বানাল...

না-চাইতেও একটা গর্বিত স্বর এসে গেল কৃত্তিকার গলায়, আমি আজ সাবিত্রীকে রান্নাঘরে ঢুকতেই দিইনি।... দ্যাখ দিদি, সব ক'টা তোর ফেভারিট আইটেম। মিষ্টি মিষ্টি পোলাও, দইমাছ, মটন কষা...

দেখছি তো। রোহিণী ঠোঁট টিপে হাসল, দেখেই লোভ হচ্ছে।

তো ঠিক করে খা। শুধু জিভে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিস কেন?

আজকাল আর বেশি রিচ রান্না হজম হয় না রে, ঝুনি। মা'র সঙ্গে থেকে থেকে এক ধরনের অভ্যেস হয়ে গেছে। দেখেছিসই তো তুই, আমরা ঝালমশলা কত কম খাই!

মনে মনে আহত হল কৃত্তিকা। এমনিই তো কত সাধ্যসাধনা করে

আজ আনা গেছে দিদিকে, এ-কাজ, সে-কাজের অছিলায় নেমন্তন্নটা কায়দা করে এড়িয়ে যাচ্ছিল। সোনামাটি যাওয়ার সময় হয়, কিন্তু চেতলা থেকে তিন কিলোমিটার পথ আসতে যত রাজ্যের বাহানা! এসেও না-ছুঁই, না-ছুঁই ন্যাকামো! বোনের আন্তরিকতা আর পরিশ্রমকে মূল্যহীন করে দিয়ে দিদি কি মজা পাচ্ছে?

গলা সহজ রেখেই কৃত্তিকা বলল, শরীর যতটুকু চায়, ততটুকুই খা। মাকে নয় ফোনে বলব, তোমাদের ঢেপসির যত্নআত্তি তোমার বড় মেয়ের পছন্দ হয়নি।

মিথ্যে নালিশ করবি? রোহিণী হেসে ফেলল, তুই আর বদলালি না রে, ঝুনি। একই রকম পাগলামি করিস।

হ্যাঁ, পৃথিবীতে একমাত্র আমিই তো পাগল।

মাংসের টুকরো মুখে তুলতে গিয়েও থমকেছে বিভাস। একবার রেহিণীকে দেখছে, একবার কৃত্তিকাকে। সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলল, তোমরা কি মক ফাইট করছ? নাকি সিরিয়াস?

না না, এটা আমাদের খেলা। রোহিণী হাসতে হাসতেই এক চামচ পোলাও তুলল পাতে। ভুরু বেঁকিয়ে বোনকে বলল, হ্যাঁরে ঝুনি, এখন রান্নাবান্নাকেই জীবনের মোক্ষ বলে ধরে নিলি নাকি? এক সময়ে চাকরি চাকরি করে অত খেপে উঠেছিলি, সেই চাকরি ছেড়ে এখন ঘরে বসে আছিস?

দিদি কি প্রসঙ্গ ঘোরাচ্ছে? নাকি চাকরির কথাটা স্মরণ করিয়ে একটু ঠুকে নিল? কিন্তু কৃত্তিকা আজ একদমই চটবে না। তার সামান্যতম বিরক্তিকেও দিদি নিজের জয় বলে ভেবে নিতে পারে।

মুচকি হেসে বলল, মিমলি বড্ড বায়না ধরেছিল রে। ছোটতে সাবিত্রীর কাছে থাকত, তখন ঝামেলা করেনি, যেই না স্কুলে যাওয়া শুরু হল, ওমনি ব্যস...। তাও ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। আস্তে আস্তে দেখি আমাদের মিমলিরানি খুব জিদ্দি হয়ে যাচ্ছে। তাই ডিসিশনটা নিয়েই ফেললাম। চুলোয় যাক চাকরি, আমার এখন ঘর-সংসার আগে। সত্যি বলতে কী, আমাদের সংসারে আমার চাকরির তো দরকারও নেই।

বিভাস যা ইনকাম করছে, তাতে তো দিব্যি চলে যায়। এই তো দ্যাখ না, দুম করে একটা সাড়ে ষোলোশো স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাট কিনে ফেলল।

বিভাস বলল, লোভে পড়ে গিয়েছিলাম। এমন চমৎকার পজিশন, পাড়াটাও নতুন... তিনতলার ওপর দক্ষিণ খোলা... লিফ্‌ট, বড় বড় দু'খানা ব্যালকনি...

রোহিণী ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার অতিকায় লিভিংরুমটাকে দেখল। তারিফ করার সুরে বলল, সুন্দর হয়েছে। খুব বড় ফ্ল্যাট।

আমার একটু হাত পা ছড়িয়ে থাকাই পছন্দ রে, দিদি। তাও তো এটাতে টেরেস নেই। আমি বিভাসকে বলে দিয়েছি, পাঁচ বছর পরে আমরা কিন্তু একটা টেরেসওয়ালা ফ্ল্যাট কিনব, হ্যাঁ। সেখানে মাটি ফেলে, ঘাস লাগিয়ে, একটা লন বানাব।

বিভাস সংকুচিতভাবে বলল, অনেক টাকার ধাক্কা। পারব কিনা কে জানে!

কৃত্তিকা ধমক দিয়ে বলল, খুব পারবে। পারতেই হবে। জেদ না-থাকলে মানুষের ইচ্ছাপূরণ হয় নাকি?

বলেই তেরচা চোখে রোহিণীকে দেখল কৃত্তিকা। দিদির কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি? মুখটা কি একটুও শুকনো লাগে না? উঁহু, বোঝা দায়। মুখে একই হাসি ধরে রেখেছে। হাসিটা বাড়ছেও না, কমছেও না। পাকা অভিনেত্রীর মতো মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে পারে দিদি। দিব্যদাকে নিয়ে তার সঙ্গে লড়তে গিয়ে গোহারান হেরে যখন কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিল, তখনও তো কোনও তাপ-উত্তাপ দেখায়নি।

কথাটা মনে হতেই কৃত্তিকা খানিকটা চনমন বোধ করল। একটা প্লেট নিয়ে বসে পড়ল টেবিলে। বহুমূল্য বিদেশি ডিনার সেটখানা বের করেছে আজ, সুদৃশ্য চিনামাটির পাত্র থেকে, পোলাও নয়, ভাত নিল অল্প। তার ডায়েটিং চার্টে রাত্তিরে ভাত নেই, তবুও। সামান্য দইমাছের কাই দিয়ে ভাতটা মাখতে মাখতে বলল, কাল সোনামাটি থেকে তুই কখন ফিরলি রে?

রোহিণী এক ঢোক জল খেল, প্রায় সাড়ে দশটা। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল।

অনেকটা রাস্তা, তাই না?

দু'ঘণ্টা-সওয়া দু'ঘণ্টা মতো লাগে। পথে বম্বে রোডে জ্যাম ছিল... তুই যাসনি সুবর্ণলতায়?

আমি গিয়ে কী করব? আমাকে কোন কাজে লাগবে?

সে কী? দেখতেও যাসনি?

বিভাস গেছে এক-আধবার। আমার অত সময় নেই।... স্পৃহাও নেই। দিব্যদাদের বাড়ির ঝিয়ের মেয়েটা ওখানে রাজত্ব করছে... ওই খরখরিটাকে দেখলেই আমার গা জ্বালা করে।

কেন রে? কল্পনা তো বেশ ভালই চালাচ্ছে।

চালাক না, মোচ্ছব করুক।... জানিস, মেয়েটার ওপর সব ছেড়ে দেওয়ার জন্য বড়মাসি কতটা দুঃখ পেয়েছে? বড়মাসি সেখানে যায় না পর্যন্ত। কৃত্তিকা বেছে বেছে ছোট্ট একটা মাংসের টুকরো তুলল হাতায়। চোখে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, অশান্তি হবে বলে চুপচাপ থাকি। তবে বলতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হয়।

কী কথা?

মাকে তো দিল্লিতে আমি বলেওছি। মা তোকে বলেছে কি না জানি না।

কী ব্যাপারে বল তো? দিদার টাকা?

হ্যাঁ। সুবর্ণলতা তো তৈরিই হয়েছে আমাদের দিদার টাকায়। দিদা যেমন বড়মাসির মা, আমাদের মায়েরও তো মা। তিনি তাঁর বড় মেয়েকে সম্পত্তিটা কিছু একটা করার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। তার মানে তো এই নয়, বেচে আট-দশ লাখ যা পাওয়া গেছে সব দিব্যদার হয়ে গেল? আরও দুঃখের কথা কী জানিস? কত টাকা পাওয়া গেছে, কেউ নাকি জানে না! বড়মাসিও নয়! জিজ্ঞেস করলেই বড়মাসি হাত উলটে দেয়। বেচাবেচির পর্বটা দিব্যদা পুরো নিজের কন্ট্রোলে রেখেছিল। তোকে আমাকেও কি বলেছে কিছু? অন্তত মাকে তো একবার জানিয়ে দিতে পারত।

বিভাসের আহার শেষ, এখন মিমলিকে খাওয়াচ্ছে। টেবিল ম্যানারস মেনে। আলগোছে কথা ভাসাল, ছাড়ো না কৃত্তিকা। দিব্যদা তো একটা ভাল কাজেই টাকাটা লাগিয়েছে।

তুমি চুপ করো। এটা আমাদের ফ্যামিলি ম্যাটার।... ভাল কাজ হোক, কি খারাপ, ওই টাকায় আমাদেরও শেয়ার আছে। এবং সেই কারণে, ওই প্রতিষ্ঠানেও। আমাদের বাদ দিয়ে দিব্যদা একা একা সুবর্ণলতা খোলে কোন রাইটে?

রোহিণীর হাত থেমে গেছে। ভুরুর মাঝে একটা দুটো রেখা ফুটেও যেন মিলিয়ে গেল। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু সুবর্ণলতা স্টার্ট হওয়ার পরেও তো দিব্যদার সঙ্গে মা'র বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। কই, মা তো দিব্যদাকে এ নিয়ে কিছু বলেনি!

লজ্জায় বলেনি। বোনপোর ওপর স্নেহবশত বলেনি। বোনপোর স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই বলে বলেনি। কৃত্তিকা চোখের পাতা কাঁপতে দিল না, তা ছাড়া কৃতজ্ঞতা ব্যাপারটাও বোধহয় মা'র মাথায় ঘোরে। এককালে ওরা আমাদের সাহায্য করেছে। অবশ্য...

কৃত্তিকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিনিময়ে দিব্যদাও নিয়েছে অনেক। কোনওক্রমে শব্দগুলো গিলে নিয়ে কৃত্তিকা বলল, অবশ্য দিব্যদা যে তার জন্য টাকাটা আত্মসাৎ করে নেবে, আর সেই টাকায় নাম কিনে দুনিয়ার লোকের বাহবা কুড়োবে... আরও বেশি খ্যাতিমান হবে... এটা কেই বা কল্পনা করতে পেরেছে!

রোহিণীর চোখে তবুও যেন একটা হাসি খেলা করছে। এঁটো হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই দেখছি দিব্যদার একদম অ্যান্টি হয়ে গেছিস?

কৃত্তিকা গোমড়া হল, আমি কারও পক্ষেও নই, বিপক্ষেও নই। যেটা উচিত কথা, সেটা আমি বলবই।

দিব্যদাকে বলেছিস কখনও?

বলব। দিন আসুক। সময় আসুক। কৃত্তিকা একবার মিমলিকে দেখে নিল। অনেকক্ষণ পর হাসছে মিটিমিটি। হাসতে হাসতে বলল, উঠে পড়, উঠে পড়, হাতটাত ধুয়ে নে।... সাবিত্রী এসো, এবার খাবার টাবারগুলো

তোলো। মাংসটা বেশি ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে, ফ্রিজে ঢোকানোর আগে একবার গরম করে নিয়ো।

মাঝবয়সি সাবিত্রী টেবিল সাফ করছে। মিমলি রোহিণীকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বেসিনে, সেখান থেকে আধুনিক কেতায় সাজানো বসার জায়গাটায়। মেয়েটা মাসির মধ্যে কী মধু পেয়েছে কে জানে, গায়ে গায়ে লেগে থাকছে! বিভাসও গিয়ে বসেছে সোফায়, টুকটাক কথা চলছে রূপসি শ্যালিকার সঙ্গে। মিমলি মাসির গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল, মাসি তাকে চুমু খাচ্ছে।

সাবিত্রীকে খাবার দিতে কৃত্তিকা রান্নাঘরে ঢুকেছিল, বেরিয়ে কয়েক পল দেখল দৃশ্যটা। ঠোঁট চেপে হাসল একটু। কেন যে হাসল? শোওয়ার ঘরে গিয়ে মশলার কৌটোটা নিয়ে এসেছে। রোহিণীর সামনে ধরে বলল, হাত পাত।

কী ওটা? মৌরি?

উহুঁ, জোয়ান। সঙ্গে বিটনুন লেবু...। নে, রিচ খানা হজম হয়ে যাবে।

মিমলি বায়না জুড়ল, আমাকেও দাও।

মেয়ের হাতেও দু'-চার দানা জোয়ান দিল কৃত্তিকা, ব্যস, আর নয়। সন্ধে থেকে প্রচুর দৌড়ঝাঁপ হয়েছে, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়।

আর একটু থাকি না, মা। যতক্ষণ মাসি আছে।

আবার অকারণে চপল হল কৃত্তিকা, ঠিক হ্যায়। এবার যখন দিল্লি যাব, তোকে মাসির কাছেই রেখে আসব। খুশি?

হুঁউউ।

তোর দৌড় জানা আছে। আগেরবারই তো দিদা বলেছিল, মিমুসোনা আমার কাছে থাক... ওমনি তো ভ্যাঁ ভ্যাঁ কান্না জুড়ে দিয়েছিলি।

আহা, ও তখন কতটুকু! ফস করে কথার মাঝে নাক গলিয়েছে বিভাস, সবে তো সাড়ে তিন কি চার।

বিভাসের মনে করিয়ে দেওয়াটা মোটেই পছন্দ হল না কৃত্তিকার। সে যে প্রায় তিন বছর মা'র কাছে যায়নি, চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেওয়া কি একান্তই জরুরি? তবে ছদ্ম বিস্ময়ের ছটার আড়ালে লুকিয়েও

ফেলল অসন্তোষটা। চোখ কপালে তুলে বলল, এমা যাহ্, আমি এত দিন দিল্লি যাইনি? ইস, এবার তো তা হলে পুজোয় যেতেই হয়। কী বলিস, দিদি?

আসতেই পারিস। মা খুশি হবে।

এবার কিন্তু মাকে আমি কলকাতায় নিয়ে আসব। আগে থাকতে বলে রাখলাম। কত বছর ধরে মা ওখানেই পড়ে... আমার সংসার করাটাও তো মা দেখল না।

মা কি পারবে আসতে? শরীরের যা হাল। এদিকে বাতে ধরেছে, ওদিকে প্রেশার, হাঁপানির টান...

ওগুলো সমস্যাই নয়। তেমন বুঝলে প্লেনে উড়িয়ে আনব। কলকাতায় ডাক্তারেরও কোনও অভাব নেই।

কথাটা বলে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল কৃত্তিকা। যেন দিদির ডাক্তার হওয়ার গুমোরটাকেও সে খানিকটা খাটো করতে পেরেছে। তা ছাড়া দিদি মাকে কাছে রেখেছে, একা সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে চলেছে— এইসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটাগুলো উপড়ে ফেলার সুযোগও তো সেভাবে আসে না। আজ যখন পেয়েছে, ছাড়বে কেন।

রোহিণী কবজি উলটে ঘড়ি দেখছে। বিভাসকে বলল, এবার তো উঠতে হয়, ভাই।

বিভাস বলল, বসুন না আর একটু। সবে তো দশটা।

রোজ রোজ রাত করাটা ঠিক নয়। বাড়িতে একটা রোগী আছে...। তোমাদের কম্পাউন্ডের সামনে থেকে কি ট্যাক্সি পাব?

গাড়ি তো আছে, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

মিছিমিছি কষ্ট করবে কেন?

কষ্ট কীসের। ইটস মাই প্লেজার।

বিভাস কি একটু বেশি গদগদ ভাব দেখাচ্ছে না? কৃত্তিকা কটাক্ষ হানতে গিয়েও সংযত করল নিজেকে। রোহিণীকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে দিতে বলল, তোর মুখ থেকে একটা খবর কিন্তু খুব আশা করেছিলাম রে দিদি।

রোহিণী ঘুরে দাঁড়াল, কী বল তো?

বড়মাসি বলছিল, তুই নাকি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করছিস?

রোহিণী অস্পষ্ট হাসল, এখনও ঠিক নেই।

সেই ডাক্তার বন্ধু? মা যার কথা টেলিফোনে বলে?

হুঁ।

তোর সঙ্গেই নাকি এসেছে কলকাতায়? একবার দেখালি না?

বিভাস গাড়ি বার করতে গেছে। মিমলি কৃত্তিকার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। ঝুঁকে বোনঝির চুল ঘেঁটে দিল রোহিণী। সোজা হয়ে বলল, দেখে কী করবি? বর মেয়ে নিয়ে দিব্যি তো সুখে আছিস, থাক না নিজের মতো।

কৃত্তিকার কানে ঠং করে বাজল ইঙ্গিতটা। মাথা জ্বালা করে উঠল সহসা। লিফট্ নেমে যাওয়ার পরও ঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। হঠাৎই নজর গেছে মিমলির ওপর। কড়া গলায় মেয়েকে বলল, এখনও দরজায় কেন? যাও, শুতে যাও।

মিমলি গা মোচড়াল, যাচ্ছি তো।

যাচ্ছি নয়, এক্ষুনি যাও। এক্ষুনি।

সশব্দে দরজা বন্ধ করল কৃত্তিকা। ভেতরে এসে সাবিত্রীকে বলল, মিমলিকে নাইটড্রেসটা পরিয়ে দাও।... রান্নাঘরের কাজ শেষ? মাংস ঠান্ডা করে ফ্রিজে তুলেছ তো?

হ্যাঁ।

তুমিও বিছানা করে শুয়ে পড়ো।

আচ্ছা।

বিভাস ফিরল প্রায় এগারোটায়। নিজেকে রাতপোশাকে বদলে নিয়ে ব্যালকনিতে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল কৃত্তিকা। মিষ্টি একটা মলয় বইছে আজ, হাওয়াটা তাকে যেন ছুঁতে পারছিল না। উৎকট এক তাপ বেরোচ্ছে শরীর থেকে। চিন্তা তো শুধু নিজেকে পোড়ায় না, চারপাশেও বুঝি আগুন ধরিয়ে দেয়।

বিভাস ঘরে ঢোকামাত্র কৃত্তিকা গিয়ে হিসহিস করে উঠেছে, যাক,

ফিরেছ তা হলে!

সরল মনে বিভাস বলল, একটু দেরি হয়ে গেল, না? ভাবলাম, গেছি যখন, দোতলায় একবার উঁকি দিয়ে আসি।

সে তো আমি জানি। দিদির পিছু ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না, তাই তো?

বিভাস যেন মজা পেয়েছে। ফিচেল হেসে বলল, এমন কী খারাপ বাসনা? শি ইজ সো চার্মিং! এখনও কী দারুণ ফিগারটা রেখেছেন!

আমার ফিগার বুঝি ধসে গেছে? কৃত্তিকা দুপদাপিয়ে এগিয়ে গেল, কোনটা আমার দিদির চেয়ে খারাপ? বুক? পেট? হিপ?

তুলনা তো করিনি! বিভাস অবাক— তুমি হঠাৎ হিস্টিরিক হয়ে যাচ্ছ কেন? তুমি তোমার মতো, দিদি দিদির মতো।

থাক। কথা ঘোরাতে হবে না। তোমাদের, পুরুষদের আমি খুব চিনি।

বিভাস পাঞ্জাবি খুলে ওয়ার্ড্রোবে রাখছিল। ঘুরে বলল, তুমি তোমার দিদিকে একটুও সহ্য করতে পারো না। কেন বলো তো?

বাজে কথা। দিদি আমায় সহ্য করতে পারে না। দেখলে না, কত সাধাসাধি করলাম, তবু আমাদের বাড়িতে এসে উঠল না!

বিভাস খাটে বসল। ঠোঁট ছুঁচোলো করে বলল, বেশ, তাই নয় হল। কিন্তু দিদিই বা কেন তোমায় সহ্য করতে পারেন না?

আমায় হিংসে করে।

তোমার নিজের দিদি... তোমাকে... হিংসে! বিভাসের গলা থেকে প্রশ্ন ঠিকরে এল, কেন?

এক একজনের নেচার থাকে। আপনজনের ভাল দেখতে পারে না। এই যে আমি চমৎকার সেটল্‌ করে গেছি, আর ও এখনও...

সেই জন্যই উনি কলকাতায় আসেন না? বিভাস যেন এতক্ষণে রহস্যের সমাধান খুঁজে পেয়েছে। বিজ্ঞ গোয়েন্দার ভঙ্গিতে বলল, তাই তুমি বেশি বেশি করে বলছিলে? টেরেসওয়ালা বাড়ি...?

কৃত্তিকা বহুক্ষণ পরে অকৃত্রিম হাসল, খারাপ কিছু বলেছি।

বিভাস হাসতে হাসতে বলল, তুমি কিন্তু বেশ দুষ্টু আছ। দিদি অত দূর থেকে ছুটতে ছুটতে দিব্যদাকে দেখতে এসেছেন, আর তুমি দিব্যদার

সম্পর্কে তার কাছে ঝুরি ঝুরি অভিযোগ জানিয়ে গেলে।... দিদি মনে হল খুব হার্ট হয়েছেন।

তাতে আমার বয়েই গেল। কৃত্তিকা বিভাসের পাশে এসে বসল। আলগাভাবে বিভাসকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমায় গাড়িতে কিছু বলছিল নাকি?

না। চুপচাপই ছিলেন। বিভাস কৃত্তিকার নাকে নাক ঘসল, আচ্ছা, তুমি মাঝে মাঝেই গজগজ করো বটে, কিন্তু দিব্যদা কি সত্যিই অত মতলবি লোক?

কৃত্তিকা ধীরে ধীরে সরে গেল। ড্রেসিংটেবিলের সামনে গিয়ে বসেছে। চুলে ব্রাশ চালাতে চালাতে বলল, আমি যা যা বলি, তার একটাও কি মিথ্যে?

তবু...। বিভাস একটা হাই তুলল, দিব্যদাকে দেখে তো ওরকম মনে হয় না। অন্যকে ঠকিয়ে খুব রইসি চালে থাকেন, তাও তো দেখি না। বরং সোশাল ওয়ার্ক করছেন...। ছবির মার্কেটেরও খবর আমি একটু-আধটু রাখি, সেখান থেকেও ওঁর ইনকাম নেহাত কম নয়। বছর কুড়ি চাকরি করে ভি-আর নিলেন, কলেজ থেকেও না-হোক ছ'-সাত লাখ তো মিলেছেই। সব টাকাই তো শুনি উনি সুবর্ণলতায় লাগাচ্ছেন।

যদি লাগায়ও, নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। অকারণে কিছু করার লোক দিব্যদা নয়।

কী করে বলছ? আমি তো গিয়ে দেখেছি, কত বড় একটা কাজ হচ্ছে সেখানে। ইনটিরিয়র ভিলেজের গরিব মেয়েরা রোজগারের সুযোগ পাচ্ছে...

থামো তো। রাতদুপুরে আর কচকচানি ভাল লাগছে না। ঘুমোও।

কী জানি বাবা, তোমায় আমি বুঝি না। বিভাস শুয়ে পড়ল। আবার একটা হাই তুলে বলল, এই দেখি পড়িমরি করে মেয়ে নিয়ে দিব্যদার কাছে ছুটছ, এই দেখি দিব্যদার নিন্দায় পঞ্চমুখ। দিব্যদা অসুস্থ বলে টেনশনও তো কম করো না!

কৃত্তিকা আর কিছু না বলে বাথরুমে চলে গেল। বেরিয়ে দেখল

বিভাস যথা নিয়মে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিদ্রায় তলিয়ে যেতে বিভাসের এক মিনিটও সময় লাগে না। কী পুরুষ! তার যখন দেহ জেগে ওঠে, বিভাসের তখন নাক ডাকে, কৃত্তিকা চাইলেও কিছুতেই চোখ খোলে না। সেভাবে শরীরের চাহিদা নেই, মাতামাতি নেই, অবরে-সবরে একটুখানি দানাপানি পেলেই বর্তে যায় যেন। এই মানুষটা দিব্যদার চেহারা আন্দাজ করবে কী করে!

নিথর মুখে চুল বাঁধল কৃত্তিকা, নিঃশব্দে ক্রিম ঘষল গালে, নিঃসাড়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, আলো নিবিয়ে দিল। চকিত অন্ধকারে ভেসে উঠেছে দিব্যদার মুখখানা। সেই মুখ... সেই নিষ্ঠুর মুখ।

মস্তিষ্কে চলতে শুরু করেছে ভিডিও ক্যাসেট।... দিব্যদা এসেছে গাইঘাটায়, দিদির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করছে, দিদিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল হাঁটতে, পিছুন পিছুন যাচ্ছিল কৃত্তিকা, হাত নেড়ে দিব্যদা তাকে টা টা করে দিল! ঝুনি যেন নিতান্তই এলেবেলে! ঝুনিকে যেন সঙ্গে নেওয়া যায় না! বেচারা ঝুনির কপালটাই তো এরকম, জন্ম থেকেই। তাকে কালো হতে হবে, অঙ্কে কাঁচা হতে হবে, বাড়িতে কেউ এলে তাকে লুকিয়ে পড়তে হবে, পাছে দিদির সঙ্গে তুলনা শুরু হয়। দিব্যদাও কিনা দিদির খাতাতে দিদির স্কেচ বানিয়ে দিল, আর তার খাতায় আঁকল শুধু হিজিবিজি। আবার ঠাট্টা করে বলল, তোরটা অনেক মহৎ আর্ট রে, বড় হলে বুঝবি! হুঁহু, ঝুনি যেন তখন বাচ্চা আছে! দিদির চেয়ে সে কত ছোট? পুরো তিন বছরও তো নয়!

...দিদি ডাক্তারি পড়তে চলে গেল কলকাতায়। ছুটিছাটায় যখন গাইগাটায় আসত, কীরকম একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোত দিদির গা থেকে। মিষ্টিও নয়, কড়াও নয়, কেমন যেন বুনো বুনো ঘ্রাণ। মা কোনওদিন গন্ধটা পায়নি, শুধু ঝুনিই...। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিত, ওই গন্ধের উৎস ভীষণ চেনা কেউ। ওই গন্ধটার নেশায় কলকাতায় আসার জন্য ছটফট করত ঝুনি। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে সে গড়িয়ে মড়িয়ে সেকেন্ড ডিভিশন, হাবড়া কলেজ ছাড়া তখন তার আর গতি কী!

...একদিন দিদির ব্যাগে একটা চাবি আবিষ্কার করেছিল ঝুনি।

হস্টেলের চাবির রিংয়ে নয়, আলাদা করে রাখা ছিল খাঁজে। সাদা মনে দিদিকে জিজ্ঞেস করতেই দিদির সে কী চোটপাট! কোন সাহসে তুই আমার ব্যাগ ঘাঁটিস! এরকম কুচ্ছিত হ্যাবিটগুলো কোত্থেকে হল! বাজে বা নোংরা নয়, ঝগড়ার সময়ে কুচ্ছিত শব্দটাই ব্যবহার করত দিদি। ঝুনি যে তার তুলনায় অসুন্দর, সেটাই শুনিয়ে দিত বোধহয়। অনেক পরে অবশ্য চাবি রহস্য বুঝেছিল ঝুনি, দিব্যদার কাছেই জেনেছে। চাবিটা ছিল চেতলার বাড়ির। দিব্যদারই বানিয়ে দেওয়া ডুপ্লিকেট।

...তারপর তো দিদি ডাক্তারি পাশ করল, চাকরিও পেল নার্সিংহোমে। ভাড়া নিল ছোট্ট টু-রুম ফ্ল্যাট। এম.এ পড়ার বাসনায় ঝুনিও অমনি নাচতে নাচতে কলকাতায়। অনার্স একটা ছিল বটে, তবে মার্কস সুবিধের নয়, সুতরাং চান্সও জুটল না। দিদি বলল, কী আর করবি, ফিরে যা গাইঘাটায়। মা'র দেখভাল কর, আর পারলে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা টরিক্ষার জন্য তৈরি হ। কেমন যেন একটা সুর ছিল দিদির গলায়! করুণা? নাকি বিদ্রূপ? না তাচ্ছিল্য? কিংবা হয়তো তাকে সরিয়ে দিয়ে স্বস্তি পেতে চাইছিল দিদি! কিন্তু ঝুনির তো তখন, মাত্র ক'দিনেই, চোখে একটা ঘোর লেগে গেছে। কলকাতা যেন চুম্বকের মতো ধরে রাখতে চাইছে তাকে। দিদিকেও তো দেখছে সে, কেমন পাখির মতো উড়ছে দিদি। কোনওভাবেই কি সে এখানে থেকে যেতে পারে না? দিদির গলগ্রহ না হয়ে? একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে?

...তখনই দিব্যদার শরণাপন্ন হল। চেতলায় গিয়ে ধরল এক-দু'দিন, দিব্যদা সেভাবে পাত্তা দিল না। ওখানে যেতে খুব একটা ভালও লাগত না ঝুনির। পৃথাবউদি কেমন যেন বাঁকা চোখে তাকায়, আভাসইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় ঝুনির উপস্থিতি সে আদৌ পছন্দ করছে না। ঝুনি প্রথমে ভাবত, দিব্যদা, বড়মাসি তাদের জন্য এত করে বলেই বুঝি বউদির রাগ! কী করে মাথায় আসবে, পৃথাবউদি তখন এক ঘরপোড়া গোরু!

...ঝুনি একদিন মরিয়া হয়ে হানা দিল দিব্যদার কলেজে। সেদিনও এড়িয়ে যাচ্ছিল দিব্যদা, ঝুনি ঝুপ করে বলে ফেলল, আমার জন্য কেন গো

কিছু করতে চাও না তুমি? দিদি কিছু বললে তো ঝাঁপিয়ে পড়ে করে দিতে!

দিব্যদা স্থির চোখে তাকে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, রুনি আর তুই কি এক?

তোমার চোখে তো তাই হওয়া উচিত। দিদির জন্য যদি উইকনেস থাকে, আমার জন্যও থাকবে।

খুব ভেবেচিন্তে কথাটা বলেনি ঝুনি, কিন্তু দিব্যদার চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল। থমথমে স্বরে বলেছিল, ঠিক আছে, দেখছি।

আমি তা হলে তোমার ভরসাতেই থাকছি ক'দিন?

থাক। তবে রুনিকে কিছু বলার দরকার নেই।

দিন পনেরো পর দিব্যদা হঠাৎ দুপুরবেলা যাদবপুরের ফ্ল্যাটে হাজির, তোর একটা ব্যবস্থা বোধহয় হয়ে গেল। কাজ একটা তোর জুটে যাবে।

ঝুনি লাফিয়ে উঠল, কোথায়?

আমার দুই পরিচিত আর্টিস্ট একটা অ্যাড এজেন্সি খুলেছে। ইন্টিরিয়র ডেকরেশনও করে। তাদের অফিসের ডে-টু-ডে কাজকর্ম সামলাতে হবে। পারবি?

পারব।

এখন তিন হাজারের বেশি দেবে না। চলবে?

দৌড়োবে।... তোমায় যে কী বলে ধন্যবাদ দেব দিব্যদা...!

ধন্যবাদ ধুয়ে কি জল খাব? দিব্যদার গলা আচমকা অন্য রকম, আমি ওই সব ধোঁয়া ধোঁয়া কথায় বিশ্বাস করি না।

মানে?

দিদির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছিলি না? তোর দিদি যা দিতে পারে, সেটা তো তোর নেই। যা তোর আছে, সেটাই দে।

কী দেব?

শরীরটা। বলেই আঙুল নাচাল, নাইটিটা খুলে ফ্যাল।

ঝুনি স্তম্ভিত, কী বলছ তুমি দিব্যদা?

ন্যাকামি করিস না। খোল চটপট।

আমি তোমার ছোট বোন, দিব্যদা!

সঙ্গে সঙ্গে সপাটে গালে চড়, চোপ। বোন বলে মাগনায় সুবিধে নিবি? সব কিছুর একটা দাম আছে, পে কর।

তারপরে তো হয়েই গেল। প্রায় জন্তুর মতো তার শরীরটাকে আঁচড়াল, কামড়াল দিব্যদা। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই শুনল দিদির সঙ্গেও দিব্যদার একটা দৈহিক সম্পর্ক আছে, অমনি এক অদ্ভুত পুলকে ভরে গেল মন। পুলক, না সুখ? পুলক, না তৃপ্তি? নাকি শুধুই দিদির পারফিউম পাউডার ক্রিম লুকিয়ে মেখে নেওয়ার শিহরন?

তা একবার রক্তের স্বাদ পেলে বাঘিনী আর কি শান্ত থাকে! রক্তে তখন কল্লোল বাজছে, দিব্যদাকে চাই, দিব্যদাকে চাই। দিদি না-থাকলে সন্ধেবেলা চলে আসে দিব্যদা, খ্যাপা পশুর মতো দু'জনে দু'জনকে ছিন্নভিন্ন করে তখন। হ্যাঁ, পশুই। লজ্জা, হায়া, শরম, সবই তখন উবে গেছে ঝুনির। এর মধ্যে হঠাৎ দিদি মাকে নিয়ে এল কলকাতায়। কী বিপদ, এবার ঝুনি কী করে! দিব্যদাই সমাধান খুঁজে দিল। মিডলটন স্ট্রিটে দিব্যদার এক বন্ধুর ফ্ল্যাট ছিল, বন্ধু বিদেশে, সেখানে শুরু হল অভিসার। দিদির কাছ থেকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনছে দিব্যদাকে, এতে যে কী অপার আনন্দ!

একটা মাত্র ভুলের জন্য জানাজানি হয়ে গেল। দিব্যদার জ্বর, পাঁচ-সাত দিন দেখা হচ্ছে না, অফিস ছুটির পর চেতলায় চলেই গেল ঝুনি। পৃথাবউদি ছিল না সেদিন তবে বড়মাসি ছিল। ওপাশের ঘরে বড়মাসি থাকা সত্ত্বেও দুঃসাহসী হওয়ার ভূত চাপল ঝুনির মাথায়। জ্বর থেকে সবে উঠেছে, দিব্যদা বেশ দুর্বল, তাও অবসন্ন মানুষটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগাতে চাইছিল ঝুনি। আর সেই মুহূর্তে, যাকে সে হিসেবে ধরেনি, সেই হতচ্ছাড়ি কল্পনাই কিনা তাকে দেখে ফেলল! এবং চুকলি করল পৃথাবউদির কাছে!

অবশ্য ধরা পড়ার জন্যে ঝুনির একটুও অনুতাপ নেই। কিল খেয়ে কিল হজম করা দিদির কলকাতা ত্যাগের জন্যও নয়। একটাই যা দুঃখ, দিব্যদার সঙ্গে খেলাটা হঠাৎ কেটে গেল। দিব্যদা তার শরীরের প্রতি

উৎসাহ হারিয়ে ফেলল হঠাৎ। পৃথাবউদি মারফত বড়মাসিও তখন জেনে গেছে, ঝুনির বিয়ের জন্য উঠতে বসতে চাপ দিচ্ছে মাকে। ঝুনিও বা কেন আপত্তি করবে! দিদিই যখন ফ্রেম থেকে আউট, বিয়ে করে থিতু হওয়াটা মন্দ কী!

...এক শুভলগ্নে সম্বন্ধ করা পাত্রের সঙ্গে ছাদনাতলায় বসে পড়ল ঝুনি। কিন্তু বিয়ের পরেই টের পেল, দিব্যদা তার কত বড় ক্ষতি করে দিয়েছে। বিভাস কেজো মানুষ, বিভাস দায়িত্বশীল মানুষ, কিন্তু ঝুনির বিছানায় সে অচল। ঝুনির চনচনে খিদে মেটাতে একমাত্র দিব্যদাই পারে। শুধু দিব্যদা।

...মিমলিকে দিব্যদাই আনল পৃথিবীতে। মিমলি জন্মানোর পর বিভাসের উৎফুল্ল মুখখানা দেখে ভারী মায়া হয়েছিল ঝুনির, বেচারা!

অন্ধকারে কৃত্তিকার চোখ দুটো জ্বলে উঠল সহসা। দিব্যদা ভেগে গেছে। যেদিনই ঝুনির মুখ থেকে শুনল মিমলির ব্যাপারটা, সেদিন থেকেই এড়িয়ে চলে সুকৌশলে। মহা হারামি লোক, নিজের বাচ্চার ওপরও কণামাত্র টান নেই। মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত। ইচ্ছে করলেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারে কৃত্তিকা। আজকাল যা সব টেস্ট বেরিয়েছে, অস্বীকার করে পার পাবে না। ভাগ্যিস সোনামাটিতে সেদিন দুম করে মরে যায়নি, তা হলে বিস্তর মুশকিল হত। বোধহয় কৃত্তিকার কথা ভেবেই দিব্যদাকে এবার প্রাণভিক্ষা দিল ভগবান।

উঠে বসল কৃত্তিকা। হাতড়ে হাতড়ে টেবিল থেকে টানল জলের জগটা। দু'ঢোক ঢালল গলায়। দিব্যদা আর একটু সুস্থ হলে, এবার একটা হিসেবে বসতে হবে। ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে কৃত্তিকা ছাড়বে না। মুখোশটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিব্যদার আসল রূপ দেখিয়ে দেবে সকলকে। কৃত্তিকার গায়েও কালি লাগবে? লাগুক। সুবর্ণলতা থেকে শুরু করে দিব্যজ্যোতি সিংহের যাবতীয় সম্পত্তি মিমলির নামে হয়ে যাবে, এটা বোঝার পরে বিভাসের মতো হিসেবি মানুষ নিশ্চয়ই কৃত্তিকাকে পরিত্যাগ করার মতো মূর্খামি করবে না! করেও যদি, তারই লোকসান।

কী অনবদ্য পরিস্থিতি! হেড আই উইন, টেল ইউ লুজ!

আচমকা একটা শ্বাস পড়ল কৃত্তিকার। জয়ের ভাবনাতে তৃপ্তি নেই কেন? কোথায় যেন সে হেরে আছে, হেরেই আছে। দিদির কাছে। দিব্যদার কাছে। মা'র কাছে। বড়মাসির কাছে। এমনকী পাশে শুয়ে থাকা এই বোকাসোকা নিরীহ মানুষটার কাছেও।

কৃত্তিকার কান্না পাচ্ছিল।

দশ

দুপুর যখন বিকেলটাকে ছোঁয়, দক্ষিণের জানলাটায় এসে বসে দিব্যজ্যোতি। বেতের আরামকেদারা এখানেই রাখা থাকে আজকাল। প্রাচীন দীর্ঘ বাতায়নে, মোটা মোটা লোহার শিকের ওপারে, তেমন বিশেষ কিছু দৃশ্যমান নয়। খানিকটা গলি, ঘরবাড়ির টুকরো-টাকরা অংশ, আর গলিশেষে বড় রাস্তার একটা কুচি চোখে পড়ে মাত্র। ওই কুচিটুকুতে হঠাৎ হঠাৎ চলমান গাড়ির ঝলক। কখনও সাদা, কখনও লাল, নীল কিংবা হলুদ। সুঁই-সাঁই চলে যায় তারা, দর্শনেন্দ্রিয়কে ফাঁকি দেয় ঘনঘন। হর্নের উৎকট আওয়াজ উড়ে আসে, শব্দের রেশ রয়ে যায় কানে। নজরে পড়ে মানুষও। নারী-পুরুষ-বালক-বালিকা...। প্যান্ট-ধুতি-শাড়ি-সালোয়ার কামিজ-স্কুল ইউনিফর্ম... রঙিন ছাতা, কালো ছাতা, ছাতাবিহীন...। মানুষজনকে একটু যেন খাটো দেখায় দোতলা থেকে। হাঁটাচলাতেও তাদের কেমন পুতুল পুতুল ভাব। সামনের সরু গলি, বাড়িঘরের ভগ্নাংশ, চকিত মানুষ, ঝটিতি যানবাহন, সব মিলিয়ে একটা ছবি তৈরি হয় দৃশ্যপটে। সেই ছবিটাই কি দেখে দিব্যজ্যোতি? হয়তো বা!

গলির মোড়ে আজ এক লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা মোটামতন লোক কার সঙ্গে যেন ঝগড়া করছে। পাড়ার কেউ কি? দিব্যজ্যোতি দূর থেকে ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। তবে আঙুল নেড়ে নেড়ে লোকটার শাসানোর ভঙ্গি ভারী মজাদার লাগছে এখান থেকে। যাকে শাসাচ্ছে তাকে দেখা যায় না,

মনে হয় লোকটা যেন কোনও অদৃশ্য প্রতিপক্ষের উদ্দেশে একা একাই তর্জনী নাচাচ্ছে! দৃশ্যটার যেন একটা মানে আছে! আবার নেইও। ঝুঁকে, গরাদে কপাল ঠেকিয়ে, অন্য লোকটিকে খোঁজার চেষ্টা করল দিব্যজ্যোতি। মুখভঙ্গি করে বলল, দেখি ব্যাটা কোথায় তুই! মুখ দেখা!

গোবিন্দ কখন পিছনে চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। মীরার নতুন পরিচারক, দিন পনেরো হল কাজে ঢুকেছে। বছর ষোলোর ছেলেটা ঘাড় উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে কথা বলছ, মামা?

জবাব না-দিয়ে দিব্যজ্যোতি আরও দু'-চার সেকেন্ড খুঁজল লোকটাকে। তারপর আরামকেদারায় শরীর মেলে দিয়ে বলল, ধুস্।

গোবিন্দ পিটপিট তাকাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার গলিটাকে দেখল, একবার দিব্যজ্যোতিকে।

রগুড়ে গলায় দিব্যজ্যোতি বলল, ব্যাটা ভগবান দেখা দিল না, বুঝলি।... কাপটা রাখ, চা-ই খাই।

হতবাক গোবিন্দ কাপ প্লেট রাখল আরামকেদারার হাতলে। পা টিপে টিপে চলে যাচ্ছে। তার যাওয়ার ভঙ্গিটা দেখে হো হো হেসে উঠল দিব্যজ্যোতি। হাসতে হাসতেই বলল, সুখেনটা কী করছে রে? তাকে একবার পাঠিয়ে দে তো।

তলব পেয়ে সুখেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাজির। পাশে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে। তাকে আলগা নিরীক্ষণ করে দিব্যজ্যোতি বলল, পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলি বুঝি?

না তো। দিদার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

তোর দিদা আজ বেরোবে না বিকেলে?

বোধহয় বেরোবে। শাড়ি বের করছিল।

অ।... তুই মাল ডেলিভারি করে কখন ফিরলি?

দেড়টা।... না না, দুটো।

আমার কাছে এলি না তো!

আপনি তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন...

হুম।... মিসেস সিংহানিয়ার সঙ্গে দেখা হল?

হ্যাঁ। ম্যাডামের একটা কমপ্লেন আছে।

কী?

বলছিলেন, ডিজাইন নাকি একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।

হুম। কথাটা আমিও ভাবছিলাম। যাই সুবর্ণলতায়, তারপর দেখি কী করা যায়।... এক কাজ করিস। ডিজাইনের যে হ্যান্ডবুকটা তৈরি করেছিলাম, সেটা সামনের বার নিয়ে আসিস। ভুলবি না। আমার দাবার বোর্ডটা আনতে বলেছিলাম...

এনেছি। দিদার কাছে আছে।

বিছানার পাশের টেবিলটায় রেখে যাস।... খাটের ওপর থেকে রবারের বলটা দে তো।

ঝটিতি রবারের বলখানা এনে দিয়েছে সুখেন। ডান হাতের মুঠোয় বলটা নিয়ে দিব্যজ্যোতি চাপছে, ছাড়ছে। ব্যায়ামটায় ভারী উপকার হয়। ফিজিওথেরাপিস্ট বলেছে, যত বেশি ব্যায়ামটা করবে, তত ভাল ফল হবে। হচ্ছেও। ডান হাতের আঙুলগুলো দিব্যি নড়াচড়া করছে এখন।

প্রক্রিয়াটা চালাতে চালাতে দিব্যজ্যোতি বলল, পেমেন্টের ব্যাপারে মিসেস সিংহানিয়া কিছু বলল?

একটা চেক দিয়েছে। দশ হাজার টাকার।

মাত্র দশ? ওর কাছে তো অনেক টাকা পড়ে। লাস্ট কনসাইনমেন্টে বত্রিশ হাজার টাকার মাল নিল, কুড়ি হাজার ঠেকাল। এ তো হু হু করে জমে যাচ্ছে! তুই কিছু বললি না?

বলেছি। আবার সামনের সপ্তাহে দেবে বলেছে।

এবার ফোনে খিস্তি মারতে হবে। দিব্যজ্যোতি ঝেঁঝে উঠল, শালী আমার দাড়ি উপড়ে বোস্টন-নিউ ইয়র্কে ব্যাবসা করবে...! বিছানায় পড়ে গেছি বলে খুব অফচান্স নিচ্ছে!

আমরা সরাসরি বিদেশে মাল পাঠাতে পারি না, মামাবাবু?

ওরকমই কিছু একটা ভাবতে হবে এবার। দালালই যদি পয়সা খেয়ে নেয়, সুবর্ণলতার লাভ কোথায়?... যাক গে, তোদের টাকা-পয়সা কী লাগবে, একটা এস্টিমেট করে এনেছিস?

সমরবাবু বানিয়ে দিয়েছে। কাগজটা নিয়ে আসব?

হুঁ।

সুখেন বেরিয়ে যেতেই দিব্যজ্যোতি ইজিচেয়ারের মোটা হাতল দুটোয় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার ডান অঙ্গে সাড় অনেকটাই ফিরেছে এখন, একা একাই চরে বেড়াতে পারে ঘরময়। তবে লাঠিটা এখনও লাগছে। গত সপ্তাহ থেকে সেবিকাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাতবিরেতে বাথরুমে যেতেও তার খুব একটা অসুবিধে নেই। তবে মীরার নির্দেশে গোবিন্দ এ-ঘরেই শোয়। যদিও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছেলেটাকে ডাকাডাকি করে না দিব্যজ্যোতি।

লাঠি ঠুকে ঠুকে দিব্যজ্যোতি বিছানায় গিয়ে বসল। কাগজ নিয়ে ফিরেছে সুখেন, নাকের ডগায় সরু চালশে-চশমা এঁটে হিসেবটা দেখছে মন দিয়ে। চোখ বুজে কী যেন বিড়বিড় করল, ফের নজর কাগজে। দেখা শেষ করে কাগজখানা ভাঁজ করল দিব্যজ্যোতি। সুখেনকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমার কম্পিউটার-টেবিলটার ড্রয়ারে রাখ এটা। আর দ্যাখ, ওই ড্রয়ারেই চেকবই আছে, নিয়ে আয়। কলমটাও।

আজ্ঞা পালন করতে পুবের বন্ধ জানলাটায় গিয়েছিল সুখেন, সেখান থেকেই বলে উঠেছে, আজ কি ঘরে ঝাঁট পড়েনি মামাবাবু?

কেন, কী হল?

জানলার নীচে এত কাঠি পড়ে...!

দিব্যজ্যোতি হেসে ফেলল, ও আমার চড়ুইদের কীর্তি। দুপুরে বোধহয় ঘুলঘুলি থেকে ফেলেছে।

চড়ুই বড় ঘর নোংরা করে। বাসাটা ভেঙে দেব?

থাক। উৎসাহী সুখেনকে নিরস্ত করল দিব্যজ্যোতি, বেচারাদের বেঘর করার পাপটা নয় নাই করলাম। গেলে আপনিই চলে যাবে। মনে হচ্ছে চড়ুইগিন্নি ডিম পেড়েছে। বাচ্চাটাচ্চা ফুটুক।... আমার রাইটিং প্যাডটাও আনিস তো।

ড্রয়ার ঘেঁটে প্যাড চেকবই বার করে বিছানায় এনে রাখল সুখেন। গদগদ স্বরে বলল, [illegible] ওখানেও বাবুই এখন বাসা বাঁধছে।

সাইডটেবিল থেকে একটা মোটা বই টানল দিব্যজ্যোতি। রাইটিংপ্যাড তার ওপর রেখে খুশি খুশি মুখে বলল, গুড নিউজ। কোন গাছে?

পশ্চিম কোণের বেঁটে তালগাছটায়। একসঙ্গে ছ'-সাতটা বাসা।

মেয়ে বাবুইরা খুব ঘুরঘুর করছে তো বাসার কাছে?

সুখেনের কথাটা ঠিক বোধগম্য হল না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছে।

দিব্যজ্যোতি বলল, মাথায় ঢুকল না তো?... ছেলে বাবুইরাই তো বাসা বাঁধে রে। আই মিন, বোনে। তাল, নারকোল... তারপর ধর গিয়ে তোর সুপুরিগাছের কচি কচি পাতার যে লম্বা লম্বা আঁশ থাকে, সেগুলোকে ঠোঁট দিয়ে বুনে বুনে, এক একজন এক একটা বাসা বানায়। পুরোটা কমপ্লিট করে না, তার আগেই মেয়ে বাবুইদের ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। এসো এসো, আমার কেরামতি দেখে যাও! ম্যাডামরা এসে তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাসাগুলোকে পরখ করেন। কোনটা কত টেকসই, কে কত সুন্দর বুনেছে, কার ছাউনি কতটা পোক্ত... যার বাসা মনোমত হবে, ম্যাডাম তার সঙ্গেই জোড় বাঁধবেন। তার পরে বাবুইমশাই ফিনিশিং টাচ দেবে বাসায়। এটাই ওদের কাস্টম।

সুখেন মাথা দুলিয়ে বলল, বাহ্, ভাল রীতি তো! প্রায় মানুষের মতোই। আমাদেরও তো ঘরটর দেখেই ছেলে পছন্দ করা হয়।

অন্যভাবেও তো হয়, সুখেনবাবু! দিব্যজ্যোতি চোখ মটকাল, তোর ঘরদোর কিছু ছিল? আমার দৌলতে দিব্যি তো ফোকটে একটা বউ পেয়ে গেলি!

বোকা বোকা মুখে হাসছে সুখেন। দিব্যজ্যোতি ঘাড় নামিয়ে কাগজে সই মকশো করা শুরু করল। হাত এখনও কাঁপে, তবে হচ্ছে মোটামুটি। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বলেছে, একটু-আধটু ফারাক থাকলেও চেক পাস করে দেবে। প্র্যাক্টিস সেরে চেকবই খুলল। সন্তর্পণে লিখতে লিখতে বলল, ইস, বাবুইপাখির বাসাটা আমার দেখা হল না! আই রিয়েলি লাইক ইট। কী নিপুণ শিল্পকর্ম, আহা।

একটা বাসা তো পেয়েছিলাম। আস্ত। গত রোববার ওখানে কালবোশেখি হল, ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। তুলে রেখেছিলাম ঘরে, ভেবেছিলাম আপনাকে এনে দেখাব... আপনার ভাগনির জন্য হল না। পরদিনই দেখি ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

সে কী রে! দিব্যজ্যোতির হাত থামল, বাসাটাকে নষ্ট করে দিল?

আজকাল কল্পনার রাগ খুব বেড়েছে, মামাবাবু। আমাকে তো সারাক্ষণ গুয়ে বসাচ্ছে, তাই নিয়ে আমি কিছু মনে করি না। তা আমি নয় তার স্বভাবটা জানি, কিন্তু আর পাঁচজন? যা নয় তাই বলছে। মেয়েগুলোকে উঠতে-বসতে দাবড়ানি। সমরবাবুর সঙ্গেও কেমন চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে কথা বলে। আর কচিকাচাগুলোর সঙ্গে যে কী ব্যবহারটা করে!... এই তো, রোববারই, ঝড়ে কিছু আম পড়েছিল, গাঁয়ের বাচ্চারা চাট্টি কুড়োতে এসেছে, তাদের বাপ-মা তুলে কী খিস্তি! বাচ্চাদের ওপর ওর যেন জাতরাগ।

দিব্যজ্যোতি সাবধানে চেকটা ছিঁড়ল, হয়তো নিজের বাচ্চাকাচ্চা হচ্ছে না, তাই।

সুখেন ঘাড় নিচু করে বলল, কতবার তো বলছি, ডাক্তারের কাছে চলো, দু'জনেই পরীক্ষা করিয়ে আসি। কিছুতেই যেতে চায় না। উলটে আমায় গাল পাড়ে।

দিব্যজ্যোতি হাসতে হাসতে বলল, কী বলে তোকে? ঢ্যামনা?

সুখেনের ঘাড় আরও ঝুলে গেল।

মুখ তোল। দিব্যজ্যোতি চেকটা এগিয়ে দিল, কাল সকালে চেকটা ভাঙিয়ে নিয়ে যাস।... এবার আমটাম কেমন হয়েছে রে?

সুখেনের গলা দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজ বেরোল, ভাল।

আশা করছি, বৈশাখে সুবর্ণলতায় যেতে পারব। তদ্দিনে হিমসাগরে পাক ধরে যাবে, কী বল?

সামনের মাসে পারবেন, মামাবাবু?

দেখে কী মনে হচ্ছে, অ্যাঁ? ডান হাতখানা মন্থর গতিতে তুলতে শুরু করল দিব্যজ্যোতি। গোটা বাহুটাই কাঁপছে অল্প অল্প। মুখে একটা কষ্ট

ফুটে উঠল, তবু থামছে না। হাত মাথার ওপর তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসল, কী রে, বল?

সুখেনের চোখ উজ্জ্বল, এবার সোনামাটি গেলে এক মাস থেকে আসবেন। আমরা আপনার সেবা করব।

দিব্যজ্যোতি যন্ত্রণাটা মুছে ফেলে হাসিটুকু ধরে রাখল মুখে। বলল, ওপাশের জানলা দুটো খুলে দিয়ে যা তো। ঘরে ভাল করে হাওয়া খেলুক। তোদের দিদার যে কী বন্ধ বন্ধ বাতিক!

আলো একটু বাড়তেই ঘরটা যেন বদলে গেল সহসা। মায়াবী বিকেল ডানা মেলে দিয়েছে অন্দরে। এবার চৈত্র মাস পড়ার পর বেশ কয়েকটা কালবৈশাখী হয়ে গেছে। কালও একটা ঝড় উঠেছিল সন্ধেবেলা। সঙ্গে জোর এক পশলা বৃষ্টি। তাপ আজ বেশি চড়তে পারেনি, দিনভর হাওয়াও দিচ্ছে খুব। খামখেয়ালি বাতাস। হঠাৎ হঠাৎ বইছে দমকা, থেমে যাচ্ছে পরক্ষণে। আবার উঠছে।

দিব্যজ্যোতি জানলায় গিয়ে বাতাসটা মাখল খানিকক্ষণ। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না, শরীর কাঁপতে থাকে, আস্তে আস্তে কম্পিউটারের সামনে এসে বসেছে। ড্রয়ার থেকে সুখেনের আনা হিসেবটা বের করে পুরছে কম্পিউটারে, সুবর্ণলতার অ্যাকাউন্টে। কম্পিউটারে সে খুব সড়গড় নয়, দেখে দেখে টিপছে কি-বোর্ড, ঠিক অক্ষর টিপল কি না চোখ তুলে বারবার দেখছে মনিটারে।

কাজ অর্ধেকও এগোয়নি, পিছনে ফের গোবিন্দ, মামা, একজন মেয়েছেলে এসেছে।

দিব্যজ্যোতি বিরক্ত মুখে তাকাল, মেয়েছেলে?

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বলল, না না, দিদিমণি।

দিদিমণি?

না না, মাসি। আসতে বলব?

দিব্যজ্যোতি হেসে ফেলল। বেচারা গোবিন্দ এখনও বাবুদের বাড়ির তাল-ছন্দে ঠিক রপ্ত হয়নি। কাকে কী বলতে হয়, কীভাবে বলতে হয়, জ্ঞানটা কম। পরশু না কবে যেন ঝুনি এসেছিল, তাকে কাকিমা বলে

ডেকে ফেলে বেচারার কী আতান্তর! কেন কাকিমা মনে হল, কাকাটিকে সে পেল কোত্থেকে... পরের পর প্রশ্ন হেনে চলেছে ঝুনি, আর গোবিন্দ গপগপ ঢোঁক গিলছে। বিজিতদাকেও কাল দাদু বলেছিল না?

দিব্যজ্যোতির সম্মতির অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গিয়েছিল গোবিন্দ। ফিরেছে যে মেয়েছেলে কাম দিদিমণি কাম মাসিটিকে নিয়ে, তাকে দেখে দিব্যজ্যোতি রীতিমতো চমকিত।

হৃষ্ট স্বরে বলল, কী ব্যাপার, অ্যাঁ? প্যারিসের পারমিতা পাতকের প্রকোষ্ঠে?

পারমিতা একটুও হাসল না। জিনস্ টপ পরিহিতা, কোমর অবধি লম্বা চুল, সুগন্ধী মাখা, ফ্যাটফেটে ফরসা পারমিতা কোমরে হাত রেখে স্থির। দুঃখী দুঃখী গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার এ কী হল, দিব্য?

এক কালের ছাত্রী পারমিতার নাম ধরে ডাকা দিব্যজ্যোতির কানসওয়া। বছর আষ্টেক আগে প্যারিসে তারা একত্রে বাস করেছিল মাসখানেক, তখন থেকেই।

দিব্যজ্যোতি বাঁ হাতে চেয়ারটাকে সামান্য ঘোরাল। সপ্রতিভ গলায় বলল, মৃত্যুকে ছুঁয়ে দেখার সাধ হয়েছিল। ফেল করে গেলাম।

ডোন্ট টক শিট্। এখন আছ কেমন?

নেচে দেখাতে পারব না। তবে জাস্ট ফাইন। দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

ওপাশের চেয়ার টেনে বসেছে পারমিতা। কেমন যেন অদ্ভুত চোখে দেখছে দিব্যজ্যোতিকে। মুগ্ধতা নয়, বিস্ময় নয়, প্রেম নয়, বিষাদও নয়, তবু সবই যেন ওই দৃষ্টিতে আছে। মিলেমিশে।

দিব্যজ্যোতি ভুরু নাচাল, খবর পেলে কোত্থেকে? কলেজের কেউ...?

সবে তো দেশে এলাম। এখনও কারও সঙ্গে যোগাযোগই হয়নি। পারমিতার ঠোঁটে ছোট্ট একটা হাসি দেখা দিল, কাল সন্ধেবেলা গড়িয়াহাটে হঠাৎ তোমার এক্স ওয়াইফের মুখোমুখি। আমাকে প্রথমটা রেকগনাইজ করতে চায়নি, আমিই আগ বাড়িয়ে কথা বললাম। জাস্ট হাই হ্যালো করতে গিয়েছিলাম, তখনই দুম করে তোমার অসুস্থতার কথাটা বলল। শুনেই মনটা এত খারাপ হয়ে গেল!

দিব্যজ্যোতি মৃদু হাসল, মাঝে মাঝে মন খারাপ হওয়া ভাল। ওতে মনের একটা এক্সারসাইজ হয়।

উফ্, তোমার ওয়ে অফ টকিং একই রকম রয়ে গেল।

আনরোম্যান্টিক?

না। সিউডো রোম্যান্টিক।

গ্রেট কমপ্লিমেন্ট। আমার কোনও প্রেমিকাই আমাকে এই আখ্যা দেয়নি। দিব্যজ্যোতি শব্দ করে হেসে উঠল। হঠাৎই হাসি থামিয়ে বলল, অ্যাজ এ হোস্ট জিজ্ঞেস করছি, চা খাবে? কফি? অর এনি আদার ড্রিঙ্কস?

আজ নো ফরমালিটি, দিব্য। আমি বসবও না বেশিক্ষণ, তাড়া আছে। আজ শুধু তোমায় দেখতে এসেছি।

কেমন দেখছ? দিব্যজ্যোতি চেয়ারে টানটান হল।

সত্যি বলব? কিছু মাইন্ড করবে না?

তুমি তো জানো আমি সত্যি শুনতেই ভালবাসি। মিথ্যে আমার বরদাস্ত হয় না।

লাইনারশোভিত চোখের কুচকুচে কালো মণি দুটো কেঁপে উঠল তিরতির। মাথা নেড়ে নেড়ে পারমিতা বলল, ইউ আর লুকিং সিকলি, দিব্য। ওল্ড।

দিব্যজ্যোতির মুখটা সামান্য শুকনো দেখাল। তবু হাসার চেষ্টা করে বলল, একটা বড় ধাক্কা গেল কাহিল তো লাগবেই। তা ছাড়া বয়সও তো হচ্ছে।

না না, ঠিক সেরকম নয়। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আর আগের তুমি নেই, অনেকটা নিবে গেছ। পারমিতার গলা নেমে গেল হঠাৎই, প্রায় বিড়বিড় করে বলল, এটা ঠিক এক্সটারনাল সিকনেস নয়, তুমি বোধহয় ভেতরে ভেতরে...

তোমার কি অন্তর্দৃষ্টি গজিয়েছে নাকি? ফের শব্দ করে হেসে উঠল দিব্যজ্যোতি। বাঁ হাতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল, নো, বকোয়াস, পারমিতা। আমি আগে যা ছিলাম, তার চেয়ে হাজার গুণ ভাল আছি।

চাকরি বাকরির ঝুটঝামেলা নেই। প্রাণের খেয়ালে ছবি আঁকছি। মনের চাহিদা মেটাতে মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি। লাস্ট তোমার সঙ্গে যখন দেখা... আই মিন, লাস্ট আমরা যখন মিট করেছিলাম...

মিট! ইউ কল ইট মিট? পারমিতা আহত গলায় বলল, সিম্পলি মিট?

ও কে। সেকেন্ড টাইম প্যারিস গিয়ে আমি যখন তোমার সঙ্গে ছিলাম...

এত অবলীলায় তুমি কথাটা বলে দিলে? তোমার গলা কাঁপল না?

আমি ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট মানুষ, পারমিতা। ওয়ার্ল্ড ট্যুর করতে গিয়ে তোমার সঙ্গে প্যারিসে দেখা হল, আমরা কয়েকটা দিন এক সঙ্গে রইলাম...

শুধু থাকা?

ওয়েল... ক্লোজ হয়ে ছিলাম। আমাদের দু'জনেরই সেই সময়টা খুব সুন্দর কেটেছে। আমার অ্যালবামে সেই সময়কার কয়েকটা ছবিও আছে, মাঝে মাঝে ছবিগুলো দেখতে আমার ভালও লাগে... তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সেই সময়ে আমি বলেছিলাম দেশে ফিরে গিয়ে এবার একটা বড় কাজে হাত দেব?

হ্যাঁ, ওরকমই একটা বাহানা দিয়েছিলে বটে। এতক্ষণ পর পারমিতার স্বরে একটু যেন ব্যঙ্গ, কী একটা ওয়ার্ড যেন খুব ইউজ করতে? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আত্মরতি। বলতে, শুধু আত্মরতিতে জীবনটা অপব্যয় করা কোনও কাজের কথা নয়। বেঁচে থাকতে গেলে লাইফের একটা মিশন চাই।

এখনও বলি। এবং জেনে রাখো, সেই মিশনটা আমি খুঁজেও পেয়েছি। এত বছর পর পোড়া দেশটায় এলে, নিশ্চয়ই কিছুদিন থাকবে... একবার গিয়ে দেখে এসো আমি কী গড়েছি। সুবর্ণলতা। আমার ড্রিম প্রোজেক্ট। আমাদের ট্র্যাডিশনাল আর্টকে প্রোমোট করছি। গ্রামের দরিদ্রতম মেয়েদের কিছু উপার্জন করার একটা রাস্তা খুলে দিয়েছি। এখনও পুরো হয়নি, অনেকটাই বাকি। স্টিল, গিয়ে দেখলে

বুঝবে, দিব্যজ্যোতি সিংহ জীবনটাকে কত বড় করে ভাবতে পারে। দিব্যজ্যোতি একগাল হাসল, অ্যান্ড ফর দ্যাট ম্যাটার... সব কিছু মিলিয়ে এত ব্যস্ত থাকি, যে আমার খারাপ থাকার কোনও সুযোগই নেই।

আমি তোমার প্রতিষ্ঠানটার খবর শুনেছি। প্যারিসে থাকলেও এখানকার সঙ্গে আমার টাচ তো আছে। পারমিতা চোখ তেরচা করল, ব্যস্ত থাকো জানি। ইনভলভড্ থাকো কি?

থাকি না? এত সময় ডিভোট করছি... আমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে গেছে...

সে তো তোমার এক্স ওয়াইফও তোমার সঙ্গে জুড়ে ছিল। কম দিন নয়, প্রোব্যাবলি দশ-এগারো বছর। আমার সঙ্গেও তো তুমি অন্তত চারটে উইক...। জানি না আর কারও সঙ্গেও এরকম হয়েছে কি না...! এ-সবের মধ্যে কোথাও কি তোমার কখনও ইনভলভমেন্ট ছিল? হয়েছে কখনও? আমার তো ধারণা, তুমি কোনও কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকার মানুষ নও। তোমার সেই ক্ষমতাই নেই।

দিব্যজ্যোতি স্থির চোখে পারমিতাকে দেখল একটুক্ষণ। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে, জীবনটাকে এত ছোট অ্যাঙ্গেল থেকে দ্যাখো কেন, অ্যাঁ? যে-কোনও সম্পর্ক... এনি ড্যাম রিলেশনশিপ... জীবনের একটা পার্ট মাত্র। গোটা জীবন নয়। আর বেঁচে থাকাটাই তো জীবনের সবচেয়ে বড় ইনভলভমেন্ট। নয় কি? লাইফের প্রত্যেকটা মোমেন্ট ডিফারেন্ট, বেঁচে থাকার ভঙ্গিটাও তাই অলওয়েজ পালটে যায়।

কথার মাঝেই মীরা ঢুকেছেন ঘরে। পারমিতাকে ঝলক দেখে নিয়ে দিব্যজ্যোতিকে বললেন, তোর কি এখন সুখেনকে দরকার?

না। কেন?

আমি একটু সুখেনকে নিয়ে বেরোচ্ছি তা হলে। কয়েকটা জিনিস কিনে ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

তুমি ফিরছ কখন?

আটটার মধ্যে চলে আসব। তোর কিছু লাগবে?

একটা ভাল শেভিং ক্রিম...। দিব্যজ্যোতি গালে হাত বোলাল। মুচকি হেসে বলল, এইসব বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলো এসে বলছে, আমায় নাকি বুড়ো বুড়ো লাগছে! গালটাকে আরও ঝকঝকে করতে হবে।... তুমি ওকে চিনতে পারছ তো? আগে এক-দু'বার এসেছে। পারমিতা। আমার ছাত্রী ছিল।

মীরা চিনলেন বলে মনে হল না। হেসে বললেন, ও আচ্ছা। ...বসো, তোমরা গল্প করো।

বেরিয়ে গেলেন মীরা। পারমিতাও উসখুস করছে। ঘড়ি দেখে বলল, আজ তা হলে উঠি?

দাঁড়াও। তোমার খবর তো এখনও জানা হল না। দিব্যজ্যোতি ভুরু নাচাল, আছ কোথায় এখন? প্যারিসেই?

ওখানেই তো রয়ে গেলাম।

শুনেছিলাম তুমি বিয়ে করেছ? ফরাসি ছেলেকে?

হ্যাঁ। পিয়ের। উনত্রিশ মাস আগে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ইজ ইট? তুমি তা হলে এখন সিঙ্গল?

কিস্যু খবর রাখো না। লাস্ট ইয়ারে আবার বিয়ে করেছি। রিকার্ডোও একজন পেন্টার। স্প্যানিশ। ফার্স্ট ম্যারেজে আমার একটা ইস্যুও আছে। ছেলে। আমাদের সঙ্গেই থাকে।

প্যারিসেই তা হলে সেটল্ করে গেলে?

মনে তো হচ্ছে। ফেরা আর হল কই!

ফিরতে পারোনি বলে আফশোস আছে নাকি?

না। ইনফ্যাচুয়েশান আমি কাটিয়ে ফেলেছি।

দ্যাটস দা স্পিরিট। মোহ জাগবে, ঘুচে যাবে, সম্পর্ক গড়বে, ভাঙবে, আবার নতুন করে তৈরি হবে, কিংবা হবে না... জীবন তো এরকমই হওয়া উচিত।

পারমিতার ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেল, নিজেকে দিয়ে অন্যকে অ্যাসেস করো না, দিব্য। কেউ সম্পর্ক ছিঁড়ে গেলে কষ্ট পায়, কেউ সম্পর্ক গড়তেই জানে না।

উম্‌ম্‌।... তা দেশের মাটিতে আছ ক'দিন?

দিন কুড়ি। বাবার শরীরটা খারাপ। বাইপাস হবে, দাদারা ডাকাডাকি করছিল... মা চাইছে আরও কিছুদিন থাকি... ওদিকে বর-ছেলেও রেখে এসেছি...

কখন যেন চলে গেছে পারমিতা। দিব্যজ্যোতি আবার ইজিচেয়ারে। বাইরের মেদুর বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে এখন। গলির আলো জ্বলেনি আজ, আশপাশের বাড়ির আলো মাখা গলিটাকে কেমন যেন মনমরা দেখায়। বড় রাস্তার টুকরোটায় যথারীতি গাড়ির আনাগোনা। হঠাৎ আলোর ঝলকানি, হঠাৎ ছেঁড়া ছেঁড়া আঁধার।

দিব্যজ্যোতির হাতে রবারের বল। চাপছে। ছাড়ছে।

রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল দিব্যজ্যোতি। মাঝসমুদ্রে একটা পুরনো মানোয়ারি জাহাজ। গাদাবোট টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজটাকে। অদূরে দেখা যায় বন্দর। প্রকাণ্ড জাহাজখানা চলেছে বন্দরে। পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্ত হচ্ছে তখন। সমুদ্রের বুকে জাফরানি আর সোনালি হলুদ ঝিকমিক করে উঠল।

দা ফাইটিং টেমেরেয়ার!

টার্নারের পেন্টিংটা কেন যে এল দিব্যজ্যোতির স্বপ্নে!

এগারো

...হেঁইও মারি জোয়ারদারি, হেঁইও মারি জোয়ারদারি...

মাগো মা, সকাল থেকে এই এক ষাঁড়চেল্লানি শুনে শুনে মাথা ধরে গেল কল্পনার। সেই পরশু থেকে মাটির তলায় পাইপ চালান চলছে তো চলছেই, এখনও সাদা জলের দেখা নেই! দশ দশখানা মুশকো জোয়ান মিলে কী গুষ্টির পিণ্ডি করছে কে জানে! চিৎকারের কোনও বিরামবিশ্রাম নেই, মাঝে ওদের টিফিন টাইমটুকুন যা জিরেন পায় কান দুটো। মুখের ভাষা কী কল মিস্তিরিগুলোর, গান গেয়ে গেয়ে যার-তার

চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করছে! গাল পাড়লে নাকি গতরের জোশ বাড়ে! কী বেহায়া, কী বেহায়া! নিজেদের গানে নিজেরাই আবার দাঁত বার করে হাসে! সুবর্ণলতায় টিউবওয়েল বসছে না তো, কল্পনার বাপের শ্রাদ্ধ হচ্ছে!

কুয়োতলায় আঁচাতে এসে কল্পনা আপন মনে হেসে ফেলল। বাপ কোথায় ঠিক নেই, তার আবার শ্রাদ্ধ! সে লোক কোন কালে মাকে ছেড়ে ভেগেছে— স্মরণ করতে গেলে কল্পনাকে মাথার চুল ছিঁড়তে হবে। আবছা শুধু মনে পড়ে তার শুঁটকোপানা বাপ চুল্লু টেনে এসে রাতদুপুরে হল্লা করত খুব, আর মাকে গোবেড়েন দিত। মা'রও বলিহারি, প্রেম করে বিয়ে করল কিনা এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। তাও স্বজাতি নয়, বিহারি। আরে বাবা, যার পেটই চলে সওয়ারি বদল করে, বউ তো সে বদল করবেই। দু'খানা বাচ্চা পয়দা করে বেমালুম কেটে পড়ল একদিন। খোঁজ নেই, খোঁজ নেই, তারপর জানা গেল সাহানগরের মালতিকে নিয়ে নাকি ঘর বেঁধেছে। এখন তো শোনা যায়, মালতী, পুষ্পা, শ্যামা সব ক'টাকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে, ডজনখানেক অ্যান্ডাবাচ্চা চতুর্দিকে ছড়িয়ে, বাবু নাকি ধাঁ। শেষ বয়সে আপন মুলুক গয়ায় ফিরে দেশওয়ালি বউ-ছেলে নিয়ে খেতিবাড়ি করছে। ওই লোকের মরার খবর কোনওদিন কি পৌঁছোবে কলকাতায়? মাঝখান থেকে কল্পনার মা'র সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হয়ে গেল।

ভিনদেশি চুল্লুখোর বাপটার কথা ভাবতে ভাবতে এঁটো থালা-গেলাস মেজে ফেলল কল্পনা। থালাখানা নাকের ডগায় এনে শুঁকল ভাল করে। গন্ধের ব্যাপারে তার একটু পিটির পিটির আছে। কী অভ্যেসই যে গড়ে দিয়েছে চেতলার দিদা, থালাবাটি একটু আঁশটে বাস ছাড়লেই কল্পনার গা গুলিয়ে ওঠে।

বাসনকোসন কুয়োতলাতেই রেখে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে, কল্পনা হানা দিল মিস্ত্রিদের কর্মযজ্ঞে। শালের খুঁটি, বাঁশ, মোটা মোটা দড়ি, ইয়া ইয়া পাইপ, সব মিলিয়ে বাড়ির পিছন ভাগের চাতালটার একেবারে ছিড়িবিড়ি দশা। তার মধ্যেই লোহার ডান্ডা ধরে গোল হয়ে

ঘুরে চলেছে পাঁচ জোয়ান। তাদেরই একজন হেঁকে উঠল, কাদা ছিটবে, সরে যাও... ও মাসি...

কল্পনা কটমট চোখে দেখল সুখেনের বয়সি বোনপোটাকে। দু'হাত কোমরে রেখে বলল, তোমাদের পাইপ দিয়ে কবে আর জল বেরোবে?

এক আধবুড়ো মিস্ত্রি উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছিল। বলে উঠল, বেরোচ্ছে তো। ভসকা ভসকা। হলদে হলদে। ঘোলা ঘোলা।

মরণ! সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বলি, কাজ শেষ হবে কবে?

মাথায় টুপি, হাফপ্যান্ট, তদারকি বাবুটি ছায়ায় চেয়ার পেতে বসে। কানে পালক ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ভাল জল খেতে হলে একটু সময় তো দিতে হবে গো, মেয়ে।

চটপট ফিনিশ করুন। মেয়ে-বউদের অসুবিধে হচ্ছে।

আর তো মাত্র কালকের দিন। তারপর ঘটাং ঘটাং হাতল, ছড়াং ছড়াং জল।

হুঁহ্, হোক আগে।

কল্পনা মুখ বেঁকিয়ে সরে এল। ঘটা করে টিউবওয়েল বসানোর দরকারটা কী ছিল কে জানে! সুবর্ণলতার সবাই কি এতকাল জলের অভাবে গলা শুকিয়ে মরছিল? কুয়োর জল কী এমন খারাপ, অ্যাঁ? ভালমতোই ঢাকা থাকে, নোংরা পড়ে না...। মামার মাথায় কী খেয়াল যে চাপল, এখন জলের ছুতোয় রাজ্যের মানুষ ভিড় জমাবে সুবর্ণলতায়। বাগান মাড়াবে, ফুল ছিঁড়বে, যেখানে সেখানে পেচ্ছাব সারবে...! হরিশ কত পাহারা দিয়ে বেড়াবে? কল্পনাই বা কোনটা ছেড়ে কোন দিকে চোখ রাখবে? নাম ফাটবে মামার, আর দায় বাড়বে কল্পনার। এবার দেখা হলে মামাকে সাফ বলে দেবে, ওই কল সামলানোর জন্য আলাদা একটা লোক চাই।

মাজা বাসন ক'টা তুলে নিয়ে কল্পনা ফিরল রান্নাঘরে। রাখল জায়গা মতন। সুবর্ণলতার এই ঘরখানা তার একেবারেই নিজস্ব। প্রাইভেট। ঢুকতে পারো যে খুশি, কিন্তু কারও খবরদারি এখানে চলবে না। মামারও নয়। মনে বড় সাধ ছিল, যদি কখনও নিজের একটা সংসার হয়, অন্তত

রান্নাঘরটুকু যেন পছন্দ মতো সাজাতে পারে। বড় মানুষের সমান সমান হওয়া তো কপালে নেই, নিদেনপক্ষে হেঁশেলটুকু কি চেতলার দিদার মতো হতে পারে না? তা কল্পনার প্রার্থনা বিধাতাপুরুষ শুনেছে খানিকটা। দেওয়ালে টানা টানা তাক, রোজকার থালা বাটি রাখতে স্টিলের কিচেনকুইন, কাপডিশ ঝোলানোর ব্র্যাকেট, কাঠের আলমারি বোঝাই ডিনার সেট, টি সেট, শরবত সেট, ননস্টিক কড়া, ননস্টিক কুকার, কাঁটাচামচ, ছুরি, কী নেই! আছে একখানা ঢাউস ফ্রিজও। এসব ব্যাপারে মামার কিপটেমি নেই এতটুকু। কল্পনা যা চেয়েছে, এসে গেছে টপাটপ। শুধু নাকের বদলে নরুন, গ্যাসের জায়গায় দু'খানা পাম্প স্টোভ। তবে তেল পোড়াও যত খুশি, কেরোসিন জুটে যাবে। লাগোয়া ছোটমতন একখানা ভাঁড়ারঘরও পেয়েছে কল্পনা। এটা উপরি।

সুখেনের এখনও খাওয়া হয়নি। সে গেছে উলুবেড়িয়ায়, টেলিফোনের তাগাদা দিতে। ঢিকির ঢিকির মানুষ কখন ফেরে ঠিক নেই, হাঁড়িকুড়ি কোলে বসে থাকা কল্পনার পোষায় না। স্বামী হয়েছে তো কী, তার অপেক্ষায় পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতে হবে নাকি? অত পিরিত বাপু কল্পনার নেই। তবু কী ভেবে, হাঁড়ি ঝাঁকিয়ে, ভাতের পরিমাণটা একবার দেখে নিল কল্পনা। খোরাকি একটু বেশিই সুখেনের, তবে কুলিয়ে যাবে। ডাল, চচ্চড়ি আর ফ্যাসামাছের ঝালও আলাদা আলাদা করে তুলল বাটিতে, ভাল করে ঢাকা দিল। কোত্থেকে এক হুলো জুটেছে সুবর্ণলতায়, বজ্জাতটার বেজায় নোলা, একটু বেখেয়াল হলেই সর্বস্ব চেটেপুটে খেয়ে যায়। কল্পনাও তক্কে তক্কে আছে, একদিন বাগে পাক, আস্ত চেলাকাঠ ভাঙবে পিঠে।

বাড়তি মাছ [illegible] ফ্রিজে তুলে কল্পনা রান্নাঘর ছাড়ল। দরজায় শিকল এঁটে হেঁশেল [illegible] চলেছে কর্মশালায়। এই সময়টায় ঘরে ঘরে ঢুঁ মারতেই হয়। নজরদারি না থাকলে দুপুরবেলা প্রাণের সুখে গপ্পো মারে মেয়ে-বউগুলো।

মাদুর বোনার ঘর পেরিয়ে সেলাই ঘরে যেতে গিয়ে কল্পনার কান খাড়া। হুঁ হুঁ বাবা, যা ভেবেছ তাই। আজ ওই ঘরেই আসর বসেছে। হি-

হি, হু-হু, হা-হা... যেন হাসির দোকান খুলেছে দল বেঁধে। ঘরে যাদের নিত্যি অভাব, নিত্যি অশান্তি, তাদের যে এত রস আসে কোত্থেকে!

কল্পনা বাইরে থেকেই হাঁক ছাড়ল, হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ? এটা কি ফুর্তি লোটার জায়গা?

ব্যস, আর টুঁ শব্দটি নেই। ঢালা শতরঞ্চি পাতা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা জনা চোদ্দো মেয়ে-বউ অমনি ভিজে বেড়ালটি সেজে ছুঁচ গাঁথছে কাপড়ে।

দুপদাপিয়ে ঘরে ঢুকল কল্পনা। তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল সকলকে। আহা, মনোযোগের কী বহর, যেন হাতের কাজটি ছাড়া আর কিচ্ছুটি বোঝে না!

বেঁটে টুলের ওপর একখানা পা তুলে কল্পনা হিটলারি ভঙ্গিতে দাঁড়াল। কর্কশ স্বরে বলল, দ্যাখো, রোজ রোজ এক প্যাচাল পাড়তে আমার ভাল লাগে না। সুবর্ণলতাকে কী ভেবেছ তোমরা? দানছত্তর? যদি মনে করো, এক দিনের কাজ তিন দিনে করলে বেশি মজুরি পাবে, সে গুড়ে বালি। অসঙ্গত কারণে বেশি সময় লাগালে আমি কিন্তু মজুরি কেটে নেব। তখন যেন কাঁদতে বসো না, কল্পনাদিদি দিল না, কল্পনাদিদি পাষাণ...! কান খুলে শুনে রাখো, ফাঁকিবাজদের জন্য কল্পনা নস্করের পরানে সত্যিই কিন্তু কোনও মায়াদয়া নেই, হ্যাঁ।

গুছিয়ে বকুনি দিতে পেরে বেশ তৃপ্তি জাগল কল্পনার। তবে ফল কিছু হল কি না বোঝার উপায় নেই, কর্মরত মুখগুলো একই রকম নির্বিকার।

পেট থেকে কথা বার করতে কল্পনা গলা নরম করল, কী নিয়ে রঙ্গতামাশা হচ্ছিল শুনি?

বাক্যিটুকু খসার অপেক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে সদ্য ছিপিখোলা সোডার বোতলের মতো হাসি ফিনকি দিয়ে উঠেছে সুনীতার ঠোঁটে, সালমা ভাবী যা একখানা... হি-হি-হি-হি... খবর শোনাল... হি-হি...

সবে পরশু থেকে আসা শুরু করেছে সালমা, এর মধ্যেই আড্ডার মধ্যমণি!

কল্পনা চোখ খর করল, কী এমন রসের খবর, শুনি?

ও আমার মুখে আসবে না... হি-হি... রমাবউদিকে জিজ্ঞেস করো... হি-হি...

ন্যাকাপনা করিস না তো। বলবি তো কী হয়েছে? শোনার জন্য কল্পনারও এবার বুক হাঁসফাঁস, রমাদি, তুমিই বলো তবে।

রমা পা ছড়িয়ে কাপড়ে সুতোর ফুল তুলছিল। ফিক করে হেসে বলল, আমাদের আমিনা নাকি তার বরের কাছে ঘেঁষতে চাইছে না।

কেন?

বর নাকি যখন তখন জাপটে ধরে...

তা এতে হাসার কী আছে? ওটাই তো ব্যাটাছেলের ধম্মো। কল্পনার স্বর রুক্ষতর, আহ্লাদিপনা ছেড়ে হাত চালাও। আমি কিন্তু চারটে বাজলে ইঞ্চি মেপে হিসেব বুঝে নেব, হ্যাঁ।

ঘর যেন চুপসে গেল কল্পনার মেজাজে। তবু তার মধ্যেই সুনীতা বলে উঠল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কল্পনাদি?

কী?

মাস্টারমশাই নাকি এখন হাঁটাচলা করছেন?

হ্যাঁ। কেন?

তা হলে তো এবার সুবন্নলতায় আসতে পারেন।

তাঁর বিহনে তোমাদের কী অসুবিধেটা হচ্ছে, শুনি?

তা নয়... তিনি এলে এখানকার চালচিত্তিরটাই বদলে যায় কিনা। কী আমুদে মানুষ... হাসছেন, গপ্পো করছেন, গান শোনাচ্ছেন... সুবন্নলতা যেন ভরে থাকে।

শ্যামলী বলল, সেই মানুষটাকে বিধাতা কিনা পঙ্গু করে দিচ্ছিলেন! কী অধম্মো হত বলো তো!

রমা বলল, মাস্টারমশাই বলেছিলেন সবাই মিলে সুবন্নলতায় একদিন ফিস্ট হবে। উনি নিজের হাতে মাংস রাঁধবেন। উনি এলে ফিস্টটা কিন্তু হওয়া চাই, কল্পনাদিদি।

দেখা যাবেখন। এখন কাজ সারো তো।

বাইরে ফের কলের গান। ফের শুরু হল কেত্তন। শ্যামলী-রমারা

চোখ মটকাচ্ছে। গনগনে দৃষ্টিতে তাদের আবার একবার শাসন করে বাঁধানো দাওয়ায় এসে বসল কল্পনা। রোদ আজ বেজায় চড়া। তাপ যেন চামড়া ঝলসে দেয়। হাওয়াও নেই বিশেষ, সামনের গাছপালা যেন কেমন নিথর দাঁড়িয়ে। আচমকা কোত্থেকে একটা পাপিয়া ডেকে উঠল। কোন পাতার আড়াল থেকে কে জানে, শির ফুলিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে, পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!

কল্পনা হাই তুলল একখানা। খরখরে গলায় বলল, মরণ!

সুখেন ফিরল প্রায় সাড়ে তিনটেয়। কল্পনা তখন নিজের ঘরে তক্তপোশে গড়াচ্ছে।

জামা ছাড়তে ছাড়তে সুখেন বলল, শালার বাসটা মাঝরাস্তায় দুম করে বিগড়ে গেল, বুঝলে।

পাশবালিশ ছেড়ে চিত হল কল্পনা। জড়ানো গলায় বলল, জানা কথা। তুমি কাজে বেরিয়েছ, পথে কোনও অঘটন ঘটবে না...

সত্যি বলছি। মাইরি। পরের বাসের জন্য ঠায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে। তাতেও যা ভিড়, বাপ। চালে লোক বসে গেছে।

তোমার বেত্তান্ত পরে শুনব। কাজের কাজ কিছু হল?

কই আর। আজও তো ঘুরিয়ে দিল।

কেন?

কী সব ঝঞ্ঝাট চলছে। এখন কোনও অর্ডার বেরোবে না।

মামার নাম করেছিলে?

রোজই তো বলি। ওরা মামাটামা বোঝে না। শুধু নোট চেনে।

তার মানে ঝামেলাটা ওদের বাহানা?

সুখেন হাত উলটে দিল, তাই হবে।

তাই-ই। কল্পনা উঠে বসল। চোখ-নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কত নেবে জিজ্ঞেস করলে পারতে।

মাথা খারাপ! মামাবাবু নিষেধ করেছেন না! আগের দিনও বলেছেন, লাইনের জন্য খবরদার কাউকে ঘুষ দিবি না। একটা পয়সাও নয়।

কল্পনা বেজার মুখে বলল, মিছিমিছি দেরি। টেলিফোনটা লেগে গেলে কত উপকার হয়।

বটেই তো। মামাবাবুর খোঁজটা তো রোজকার রোজ রাখা যায়।

ওরে আমার মামাবাবুর ভাগনিজামাই রে! কল্পনা ভেংচে উঠল, এই দাসীবাঁদির কোনও উপকার হয় না? নিজের মা-ভাইয়ের সঙ্গে আমিও তো দু'-চারটে কথা বলতে পারি।

সেটাও একটা সুবিধে অবশ্য। গামছায় ঘাম মুছতে মুছতে সুখেন দেঁতো হাসল, শালাবাবু যখন মোবাইল নিয়েছে...

তা হলে? আগে তো মামা রাজিই ছিল না।... এখন সুযোগ যখন এসেছে, তোমার তো উঠেপড়ে লাগা উচিত। নাকি নিজের সাত কুলে কেউ নেই বলে গা করছ না?

কথাটা পুরোপুরি সত্য নয় অবশ্য। সুখেনের বাবা আছে একটা। দূর সম্পর্কের। সৎমার বর।

ম্লান মুখে সুখেন বলল, আর কী করি বলো দিকিনি? বারবার তো ছুটছি।

ও তো ঢঙের যাওয়া। বোঝোই যখন পাত্তি খাবে, ঠেকিয়ে দিলেই হয়।

তারপর? মামা জানতে পারলে? তিনি ন্যায়নীতি মেনে চলা মানুষ...!

ফের ঝামরে উঠতে গিয়েও মুখে কুলুপ আঁটল কল্পনা। পোড়ামুখ থেকে আলটপকা কিছু বেরিয়ে গেলে নিজেরই তো ক্ষতি। যে-ডালে বসে পুচ্ছ নাচাচ্ছে, সে-ডালে কেউ কুড়ুল মারে!

হাত ঘুরিয়ে এলোচুলের গোছা শক্ত করে বেঁধে নিল কল্পনা। ফ্যাসফেসে গলায় সুখেনকে বলল, যাও, চান সেরে এসো।

কাঁধে গামছা ফেলে পুকুরে গেল সুখেন। বাথরুমে তার পোষায় না, কুয়োতলাতেও নয়, কবে কোন যুগে গ্রামে ছিল, তখনকার অভ্যেসটাই ফিরিয়ে এনেছে আবার। দিব্যি সুখে আছে। চাল ছিল না, চুলো ছিল না, মা-মরা বাপে খেদানো লোকটা সাতঘাটের ঠোক্কর খেতে খেতে এসে ভিড়েছিল চেতলার মুদিখানায়। দাঁড়িপাল্লায় ডাল, চাল, আটা, ময়দা

মাপত, মাল বয়ে পৌঁছে দিত বাড়ি বাড়ি, উঠতে বসতে গাল খেত মালিকের, আর ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর ছুঁচোর সঙ্গে লড়াই করে রাতে পড়ে থাকত ওই দোকানঘরেই। মামার কৃপায় সেই লোকের একখানা বউ জুটল, সঙ্গে সুবর্ণলতায় মহাসুখের ঘরবাড়ি...। পুকুরে মাছ, গাছে ফলপাকুড়, খেতে শাকসবজি... মামার মতো মানুষের ওপর সুখেন নস্করের তো অটল ভক্তি থাকবেই।

কিন্তু মামা কি সত্যিই ন্যায়নীতির মানুষ? নাকি ন্যায়নীতিকে কাঁচকলা দেখানো মানুষ?

নাহ্, কল্পনা আজও ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারল না। ভাবতে গেলে সব কিছু কেমন গুলিয়ে যায়। সেই কোন কাল থেকে দেখছে মামাকে, তবু ধন্দ জাগে। বড় ধন্দ জাগে।

চেতলায় মামাদের বাড়ি মা যখন কাজে ঢুকল, কল্পনা কতটুকুই বা! স্পষ্ট মনে আছে তাকে দেখেই দিদা আঁতকে উঠেছিল, ওইটুকু মেয়ে বাসন মাজবে কী গো? লেখাপড়া না শিখিয়ে ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছ?

দুখিনী মা'র ঘাড় ঝুলে গেল, কী করি মা, পেট বড় বালাই। একা হাতে সংসার টানতে হয়। ছেলেমেয়ে দুটোকেই কী করে পড়াই, বলো?

উঁহুঁ, ও বললে তো চলবে না। মেয়ে বলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে? ওকে স্কুলে ভরতি করে দাও, খরচখরচা আমি দেব।

তা দিদা চেষ্টা করলে কী হবে, কল্পনার যে মাথাই নেই। বই দেখলেই ঘুম পায়, অঙ্ক কষতে গেলে পেট কামড়ায়...। মামা-মামির ইংরেজি বাংলা দেখিয়ে দেওয়া, টিউশন পড়ার জন্য দিদার পয়সা জোগানো, সবই বিফলে। গড়িয়ে গড়িয়ে সিক্সে উঠে কল্পনার দম ফুড়ুত। লেগে পড়ল রাতদিনের কাজে, দিদার বাড়িতেই।

তখনও পর্যন্ত মামা তার চোখে হিরো নাম্বার ওয়ান। চেহারা, স্বাস্থ্য, হাঁটাচলা, কথা বলা, সবেতেই মারকাটারি। মামা যখন গমগমিয়ে হাসে, সলমন খান, গোবিন্দারাও তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে যাবে। কিন্তু ও-বাড়িতে দিনরাত থাকতে গিয়ে কল্পনার তো আক্কেল গুড়ুম। যাহ্ বাবা, হিরোর ক্যারেক্টার তো বেশ লুজ! নিজের মাসতুতো বোনকেও

কিনা বুকে চেপে ময়দা ঠাসার মতো ঠাসে! মনের দুঃখে মামি বেচারি ইশ্‌ক চালায় মামার এক কচি ছাত্রর সঙ্গে। আর মামা-মামি একত্র হল, তো ওমনি ঠোকাঠুকি। মামির চিল্লানি থেকেই তো কল্পনা জানল, শুধু ঝুনিমাসি নয়, স্বর্গের দেবীর মতো দেখতে রুনিমাসিকেও মামা নাকি চুষে মুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে!

তারপর তো মামি একদিন ভাগলবা। রুনি-ঝুনিরাও আর চেতলার ছায়া মাড়ায় না। বড় বোন কলকাতার বাস তুলে সোজা দিল্লি, আর ছোটটি সেজেগুজে বিয়ের পিঁড়িতে বসে রাতারাতি সতীলক্ষ্মী। বাড়িতেও অখণ্ড শান্তি। মামা যেন খানিক বিবাগী, আপন মনে ছবি আঁকে, আর মাঝে মাঝেই পাড়ি দেয় বিদেশ। দিদা চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়িতেই থাকে সারাক্ষণ। টিভি দেখে আর দিদার সঙ্গে শুয়ে বসে গল্প করে সময়টা বেশ কেটে যায় কল্পনার। মা একের পর এক সম্বন্ধ দেখে যাচ্ছে তার, কিন্তু একটাও লাগছে না। বাবুর বাড়ি থেকে থেকে কল্পনার নাক উঁচু হয়েছে, যাকে-তাকে গলায় ঝুলিয়ে দিলে সে মানবে কেন? মা'র আনা পাত্র কল্পনার পছন্দই হয় না, শুধুমুদু বয়স গড়িয়ে যায়।

ওদিকে কে একজন তখন হাসছিল অলক্ষ্যে। কে যে সে? বিধাতাপুরুষ? নাকি শয়তান? কল্পনার শুকনো চোখ দু'টো জ্বালা জ্বালা করে উঠল। কে যে তাকে ঠেলে দিল গর্তে?

সেদিন নার্সিংহোমে গিয়েছিল দিদা। ন্যাকাষষ্ঠী ঝুনিমাসির পেট কেটে বাচ্চা হয়েছে সকালে, নাতনির মুখ দেখতে। মামা কলেজ থেকে ফিরতেই তার জন্য চা করে নিয়ে গেল কল্পনা। রোজকার মতোই।

মামা কাপডিশ ছুঁল না। কেমন যেন আনমনা গলায় বলল, আমার গ্লাস বোতল দিয়ে যা তো।

এই বিকেলবেলা তুমি মদ খাবে? তোমার টাইম তো রাত্তিরে, ন'টার পর।

আহ্, যা বলছি কর।

মামার আলমারি থেকে সাজসরঞ্জাম এনে দিল কল্পনা। বসার ঘরে।

ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল বার করে বলল, তুমি নার্সিংহোম গেলে না যে বড়?

মামা যেন চমকে তাকাল। তারপরই গোমড়া। বলল, গেলাম না। এমনিই।

ঝুনিমাসির বাচ্চা দেখতে তোমার ইচ্ছে করছে না?

মামা জবাব দিল না। হুইস্কি ঢালছে গ্লাসে।

কী যে তখন ক্যারা নড়ল কল্পনার, ফস করে বলে বসল, জানি তুমি কেন যাওনি!

কেন?

বলব? রাগ করবে না?

বল।

কল্পনার সঙ্গে মামার ঠাট্টাইয়ারকি তো চলেই। কল্পনা খিলখিল হেসে উঠল, ঝুনিমাসির বিয়ে হয়ে গেছে বলে তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ।

দু'-এক সেকেন্ড থমকে থেকে হো হো হেসে উঠেছে মামা। জলের বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বলল, তোর তো খুব বুদ্ধি!

আহা, বুদ্ধির কী আছে! আমি আর এখন বাচ্চা আছি নাকি, যে কিছু বুঝব না?

তাই নাকি? মামার চোখ কল্পনার মাথা থেকে পা অবধি নামল। উঠল। হেসে হেসেই বলল, তুই তো পুরোদস্তুর যুবতী হয়ে গেছিস রে!

হব না? একুশ পুরতে চলল...

মামা আবার বলল, বটেই তো। তাই তো। এতদিন সেভাবে খেয়ালই করিনি! বলতে বলতে হাত নেড়ে সামনে ডাকছে, এদিকে আয়, তোকে ভাল করে দেখি।

কী দেখবে?

আয় না।

কাছে যাওয়ামাত্র মামা সটান হাত তুলে দিল বুকে। টিপেটুপে দেখতে লাগল, যেন সাইকেল রিকশার হর্ন বাজাচ্ছে। কল্পনার গা কেঁপে উঠল। ছিটকে সরে গেছে দু'পা, এ কী ক[illegible]হ, মামা?

পরখ করছি। শাঁসেজলে দিব্যি হয়েছিস তো! সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল মামা। ফের গায়ে হাত বোলাচ্ছে, নাহ্, তোর শরীরটা তো বেশ।

এর পর যা যা ঘটল, তা তো একেবারেই অভাবনীয়। মুরগির ছাল ছাড়ানোর মতো টেনে টেনে খুলল কল্পনার সালোয়ার কামিজ। তাকে পুরো উদোম করে দিয়ে বলল, বড় হতে গেলে পুরুষমানুষের শরীরটাও চিনতে হয় রে।

সেদিনই প্রথম চিনল কল্পনা। বসার ঘরের মেঝেয় শুয়ে। মামির বড়মতন ছবিটার সামনে। তারপর কতবার যে মামার বিছানায় যেতে হয়েছে কল্পনাকে। দিদা ঘুমিয়ে পড়ার পর। চুপিচুপি। পা টিপে টিপে। একটু একটু করে কল্পনারও তো নেশা ধরে গিয়েছিল। নিজেকে কেমন রানি রানি মনে হত। মামার মতো মানুষ শেষে তারই হাতের মুঠোয়, ভাবা যায়! শরীর দিয়ে যদি মামাকে বশে রাখতে পারে, তা হলে আর চিন্তা কীসের!

অলক্ষ্যে সেই অলুক্ষুনেটা আবার বুঝি হাসছিল তখন। পেটে বাচ্চা এসে গেল কল্পনার।

টের পেয়ে মামাকে জানাতেই মামার সটান জবাব, নষ্ট করে ফ্যাল।

কেঁদে ফেলেছিল কল্পনা, তা কী করে হয়?

মামা খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কান্না। তারপর কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলল, ওরে বোকা মেয়ে, নিজের ভবিষ্যৎটাও ভাবছিস না? আমার মতো একটা বুড়োর কাছে পড়ে থাকলে তোর চলবে? আমাকে দেখে তো বুঝেছিস, সংসারধর্ম আমার ধাতে নেই। কিন্তু তোকে তো ঘরসংসার করতে হবে, না কী?

কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম...

আমিও তো অনেক কিছু ভেবেছি রে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোর একটা ভাল বিয়ে দেব। সারাটা জীবন যাতে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারিস, তার একটা পাকা বন্দোবস্ত তো করতে হবে।... জানিসই তো, হাওড়ায় জমিটমি নেওয়া কমপ্লিট, এবার ঘরদোর তুলে ফেললেই সুবর্ণলতা চালু। তবে আমার পক্ষে তো সর্বক্ষণ ওখানে পড়ে থাকা সম্ভব

নয়। দেখাশোনাটা তা হলে কে করবে? তুই। এটা তোর আজীবনের ব্যবস্থা। আমার অবর্তমানেও যাতে কেউ তোকে নড়াতে না-পারে, এ আমি লিখে দিয়ে যাব। তুই ছাড়া আমার আর আছেটাই বা কে? তোর চেয়ে বেশি আর কাকে বিশ্বাস করব? আমার কাজ তুই যতটা বুক দিয়ে আগলাবি... ভাব তুই; ভেবেচিন্তে উত্তর দে। সমস্ত পিছুটান ঝেড়ে ফেলে আমি এগোতে চাইছি, আবার কি আমাকে ছোট গন্ডিতে আটকে ফেলতে চাস?

ব্যস, কল্পনা গলে জল। সুড়সুড় করে মামার সঙ্গে গিয়ে পেট খসিয়ে এল, কাকপক্ষীটিও জানতে পারল না। তবে কপাল যার মন্দ, দুর্ভোগ তার পিছু ছাড়ে না। বাচ্চা ফেলতে গিয়ে জন্মের মতো বুঝি বাঁজা হয়ে গেল কল্পনা। নইলে বিয়ের সাড়ে পাঁচ বছর পরেও কল্পনা মা হয় না কেন?

মামা অবশ্য কথা রেখেছে। এমনকী যে-শরীরের বিনিময়ে এত কিছু পাওয়া, সেই শরীরের দিকেও আর হাত বাড়ায়নি। রাতবিরেতে কল্পনাকে তো যেতেই হয় মামার ঘরে, অনেক সময়ে সুখেন হয়তো সুবর্ণলতায় থাকেও না, তবু নয়। এটাই বুঝি উচিত কাজ। এখানেই মামা বুঝি মামা। একদম অন্য রকম। সুখেনের ভাষায় ন্যায়নীতির মানুষ।

তাও কেন যেন মাঝে মাঝে মনে হয়, কোথাও একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। বিচ্ছিরিভাবে ঠকানো হয়েছে কল্পনাকে। কিন্তু কোথায় যে সে ঠকল, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। আর পারে না বলেই বুঝি অহর্নিশি এত জ্বালাপোড়া।

বাইরে ফের হতচ্ছাড়া পাপিয়াটা ডাকাডাকি শুরু করেছে, পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!

কল্পনা ঘাড় ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকাল। বিরক্ত স্বরে বলল, মরণ।

সোনামাটিতে রাত বড় তাড়াতাড়ি নামে। দু'-চারটে ঘরে টিভি চলে হয়তো, বাদবাকি গাঁ আট সাড়ে-আট বাজতে না-বাজতে গাঢ় নিঝুম। শুধু গ্রামের এ প্রান্তে, রাস্তার এ পারটায়, সুবর্ণলতাই যা জেগে থাকে খানিকক্ষণ।

জেগে থাকে কল্পনা। অগত্যা সুখেনও। রাতের খাওয়া সেরে কল্পনা টহল দিতে বেরোয়, টর্চ ফেলে ফেলে দেখে সুবর্ণলতার এ কোনা, ও কোনা। শেয়াল না-থাক, হুমদো হুমদো কুকুর তো আছে। একটু বেখেয়াল হলেই ব্যস, হাঁস-মুরগির দফারফা। প্রথম প্রথম টহলদারির কাজটা ঘুমকাতুরে হরিশের ওপর ছেড়ে রেখেছিল কল্পনা, ঠেকে শিখে এখন নিজেই চৌকিদারি করছে।

এ কাজে যেন একটা নেশাও আছে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও সে দাঁড়িয়ে পড়ে কোনও গাছের তলায়, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শোনে তক্ষকের ডাক। শুনতে শুনতে ফের এগোয়। ঝিঁঝির উল্লাসে কখনও বা কান ঝালাপালা, আবার হঠাৎ তারা থেমে গেলে চরাচর যেন বিলকুল শুনশান। কল্পনার গা শিরশির করে। পায়ের নীচে শুকনো পাতা ভাঙার মড়মড় কেমন ভূতুড়ে লাগে তখন। আরও কত যে না-চেনা আওয়াজ, অজানা গন্ধ ঠিকরে আসে গাছগাছালি থেকে। মাটি ফুঁড়ে। ওইসব ছমছমে শব্দগন্ধের মাঝখানে, অন্ধকার গায়ে মেখে, ডাকসাইটে কল্পনা যক্ষিণীর মতো হেঁটেচলে বেড়ায়। টর্চের আলোয় যেটুকু দেখা গেল, সবটাই যেন কল্পনার। শুধু কল্পনার। ভাবনাটাতেই যে কী আজব মৌতাত।

পুকুরপাড়ে চক্কর মেরে, হাঁস-মুরগির ডেরায় উঁকি দিয়ে, কল্পনা আজ ঘরে ফিরে দেখল সুখেন মশারি টশারি টাঙিয়ে ফেলেছে। মেঝেয় বসে ছোট ডায়েরিতে হিসেব লিখছে। দিনের খরচ।

কুঁজো থেকে জল গড়াতে গড়াতে কল্পনা বলল, চেয়ারটেবিল তো আছে, সব সময়ে মেঝেয় বসো কেন?

সুখেন চোখ তুলে হাসল, আমার মেঝেই ভাল। সুবিধে হয়।

কুঅভ্যেসগুলো আর গেল না। সাধে কি হাভাতে বলি!... তুমি ফের কলকাতা যাচ্ছ কবে?

দেখি। ভাবছি সামনের হপ্তায়...

ক্ষীরসাপাতিগুলো কি অদ্দিন থাকবে? এখনই তো পাকা বাস ছাড়ছে।

আগে যাব বলছ?

যাওয়া তো উচিত। দিদা আম ভালবাসে...। লিচু, কালোজাম, জামরুল, সবই কিছু কিছু করে নিয়ে যেয়ো। আমার বাড়ির জন্যও আলাদা করে কটা দিয়ে দেব...

সুখেন ডায়েরি বন্ধ করল, এবার কলকাতা গেলে একবার দক্ষিণেশ্বর ঘুরে আসব। শালাবাবু বলেছে, নিজের অটোয় চড়িয়ে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ তার এমন শখ! তেলের দাম সস্তা হয়ে গেল নাকি?

তা আমি জানি না। আমাকে বলল... তোমার মা'রও নাকি খুব যাওয়ার ইচ্ছে। উঠে তক্তপোশের কোনা ঘেঁষে বসল সুখেন, শালাবাবুর ইনকাম কিন্তু এখন ভালই হচ্ছে। নতুন সিট বানাল, বডি রং করাল...।

ভাল কথা। সুখের কথা। তবে যার দৌলতে এত লপচপানি, তাকে দেখতে যাওয়ারই বাবুর সময় হয় না।

কেন, স্বপন তো গেছে মামাকে দেখতে।

ও তো দায়সারা যাওয়া। কল্পনা ঘাড় তুলে মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখাটাকে দেখল একবার। ভোল্টেজ কম, বাতাস কেমন মরা মরা। গায়ের ব্লাউজটাকে খুলতে খুলতে বলল, আমার মায়ের পেটের ভাইকে আমি চিনি না? একের নম্বরের বেইমান। যে-মামা তোকে অটোখানা কিনে দিল, লাইন ধরার টাকাটা পর্যন্ত জোগাল, তার প্রতি তোর একটা কর্তব্য নেই? দিদা যখন হাঁচোড়-পাঁচোড় করে হাসপাতাল আর বাড়ি করছিল, তোর কি উচিত ছিল না গাড়িটা নিয়ে এসে দাঁড়ানো? দরকারে লাগুক, না-লাগুক? মাল কামাতে তুই তখন কিনা শাট্‌ল মেরে বেড়াচ্ছিস! আগেরবার গিয়ে মাকেও আমি শুনিয়ে এসেছি কথাটা।

মা কী করবে! সুখেন মশারিতে ঢুকে পড়েছে। বালিশে মাথা ছেড়ে দিয়ে বলল, যে যেমন স্বভাব নিয়ে জন্মায়। কেউ উপকারীর উপকার মাথায় রাখে না। কেউ বা যেচে পড়ে মানুষের জন্য করে মরে।

কল্পনা চুপ করে শুনল কথাটা। তারপর আলো নিবিয়ে সেও এসেছে বিছানায়। শুল পাশ ফিরে।

সুখেন ফের বলল, মামাবাবুর ছাত্রছাত্রীদেরই ধরো না। সকলেই

কেমন উপযাচক হয়ে ছুটে ছুটে এসেছে। তারপর ধরো গিয়ে রুনিমাসি। মায়ের পেটের বোন নয়, তবু দাদাকে দেখতে সেই কোন দিল্লি থেকে চলে এলেন। ডাক্তার মানুষ, হাতে কত কাজকম্মো থাকে...। দাদা একবার মুখ ফুটে বলতেই এখানে পর্যন্ত এসে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। যাদের পেটে সত্যিকার বিদ্যে থাকে, তারা এরকমই হয়, বুঝলে।

রুনিমাসির নামে, নাকি তার প্রশংসায় কে জানে, কল্পনার মামা-দরদ মুহূর্তে উধাও। একটা কুণ্ডলী পাকানো সাপ হঠাৎই নড়ে উঠেছে মস্তিষ্কে। গরগরে গলায় বলল, হয়েছে। কচকচানি থামাও তো। ঘুমোও।

না বলছিলাম... উনি যদি না-আসতেন, কেউ কি দুষত? তুমিই বলো?

আহ্, আর ভাল্লাগছে না।

এবার বুঝি ঝাঁঝটা কানে ঠেকেছে। সুখেন নিশ্চুপ হয়ে গেল। কল্পনাও গুম। সাপটা মাথা বেয়ে শরীরে নামছে যেন। ফণা মেলছে। তার হিসহিস আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছিল কল্পনা। একটা বিষ যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে দেহে, জ্বলছে গা হাত পা। আঁধার বিছানায় জ্বালাটা তাপ হয়ে ফুটে উঠছিল ক্রমশ।

দু'-চার মিনিট পর কল্পনা টের পেল সুখেন হাত রেখেছে কাঁধে। টানছে।

ঝটকা মেরে ঘুরল কল্পনা, কী?

যদি খুব রাগ না-করো তো একটা কথা বলি।

ভ্যানতাড়া কোরো না। বলো।

উলুবেড়িয়ায় টেলিফোন অফিসের পাশে এক ডাক্তারদিদি বসছে। মেয়েদের ডাক্তার।

ফের ওই কথা? কতবার বলেছি, ছেলে ডাক্তার হোক, মেয়ে ডাক্তার হোক, কারও কাছে আমি যাব না। কপালে থাকলে এমনিই হবে বাচ্চা। না হলে দরকার নেই।

আহা, অবুঝপনা করো কেন?... জানো, এবার মামাবাবুও বলছিলেন...

মামা?...মামা...?

হ্যাঁ। বলছিলেন, জোর করে তোমায় ডাক্তারের কাছে...

ভেতরের সাপ ছোবল দিয়েই ফেলল। কল্পনা তীব্র স্বরে বলে উঠল, ড্যামনা।

বারো

স্টিলের আলমারিটা বন্ধ করে চাবির গোছা ব্যাগে পুরলেন মীরা। আর একবার নেড়ে দেখে নিলেন ইস্পাতের হাতল। সবে মাস দেড়েক কাজে লেগেছে গোবিন্দ, ছেলেটাকে বিশ্বাসী বলেই মনে হয়, দোকানবাজার করে এসে পয়সাকড়ির হিসেবও দেয় ঠিকঠাক, তবু সতর্ক থাকা ভাল। জীবন তাঁকে শিখিয়েছে, মানুষের সামনে লোভের জিনিস ছড়িয়ে রাখতে নেই। লোভলালসায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়াটাই মানুষের ধর্ম।

শাড়ির কুঁচি ভাঁজে ভাঁজে ফেলার জন্য মীরা ঝুঁকলেন সামান্য। চিরকালই শাড়ি পরার ব্যাপারে তাঁর একটু খুঁতখুঁতুনি আছে। অফিস যাওয়ার তাড়ার সময়েও একশো ভাগ মনোমত না হলে বেরোতেন না তিনি। অভ্যেসটা রয়েই গেছে। সোজা হয়ে ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়ল, গোড়ালির কাছে পাড়টা গুটিয়ে গেছে। নিখুঁত মেয়েলি প্রক্রিয়ায় টেনে টেনে সযুত করলেন সেটাকে। ড্রেসিংটেবিল থেকে ঘড়ি তুলে বাঁধছেন কবজিতে। অল্প গলা তুললেন, গোবিন্দ...?

বার দুয়েক ডাকার পর গোবিন্দর দর্শন মিলেছে, কী বলছ, দিদা?

কোথায় ছিলি?

বারান্দায়। ময়নাটাকে ছোলা দিচ্ছিলাম।

দিন কয়েক আগে কোত্থেকে একটা শালিখের বাচ্চা ধরে এনেছে গোবিন্দ। ছেলেটার বদ্ধমূল ধারণা, ওটা ময়না। গোবিন্দর আবদারে একখানা খাঁচাও কেনা হয়েছে। পরিচর্যাও চলছে জোর।

মীরা হেসে বললেন, দিনে ক'বার ছোলা খাওয়াস রে? ও তো এবার পেট ফুলে মরে যাবে।

বা রে, বাটি খালি হয়ে গেছিল যে।

যা খুশি কর। অক্কা পেলে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসিস না। মীরা কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখলেন, কাজের কথা শোন। উপমা করা আছে, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মামাকে দিবি। যদি দেখিস ঠান্ডা হয়ে গেছে, মাইক্রোওভেনে গরম করে নিস। মামা কিন্তু ঠান্ডা সুজি মুখে তুলবে না। পাম্প চালাবি ঠিক ছ'টায়। বন্ধ করতে ভুলিস না, সকালে কিন্তু ট্যাঙ্ক উপচে জল পড়েছে।

আর একটা কী যেন বলবেন ভাবছিলেন, মনে পড়ার আগে টেলিফোন বেজে উঠল। চওড়া প্যাসেজে গিয়ে রিসিভার তুললেন মীরা। ওপারে অনুপল। দিব্যর ছাত্র।

অনুপল ছেলেটাকে মীরার বেশ পছন্দ। দায়িত্বশীল। মাথা ঠান্ডা। দিব্যর অসুখের সময়ে ঝটিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল এই অনুপলই।

মীরা স্মিত স্বরে বললেন, কী খবর? তোমার দিব্যদাকে দেখতে আসছ না যে বড়?

একটু বাইরে গিয়েছিলাম, মাসিমা।... দিব্যদা তো এখন মোটামুটি ফিট?

অনেকটাই। আঁকাজোকা নিয়েও বসছে মাঝে মাঝে।

বাহ্, বাহ্, খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি হল তো!

তা হয়েছে।... ধরো, দিব্যকে দিচ্ছি।

দিব্যর বিছানার পাশে কর্ডলেস ফোনটা থাকে। সমান্তরাল সংযোগ। এদিকের রিসিভার রেখে গোবিন্দকে ছেলের ঘরে পাঠালেন মীরা। ক্ষণ পরেই ফিরে এসেছে গোবিন্দ। কাঁচুমাচু মুখে বলল, মামা জোর ঘুমোচ্ছে। ডাকব?

কপালের ভাঁজ বাড়ল মীরার। ভরা বিকেলে ঘুমোচ্ছে দিব্য? সকালে অনেকক্ষণ স্টুডিয়োয় ছিল, বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ল নাকি?

মাথা নেড়ে মীরা বললেন, থাক। আমি বলে দিচ্ছি।

বলা অবশ্য হল না, লাইন কেটে গেছে। মীরা অপেক্ষা করলেন একটুক্ষণ, যদি আবার রিং বাজে।

বাজলও। ফোন তুলেই মীরা বললেন, সরি অনুপল। লাইনটা কী করে যেন...

কে অনুপল? আমি ধীরা বলছি।... অ্যাই, তুই দিদি তো?

পলকের জন্য চমক, পলকেই ধাতস্থ মীরা। হেসে বললেন, ওমা, তুই! কী খবর বল? আছিস কেমন?

মন্দের ভাল। দিল্লিতে যা গরম চলছে...। তবে বলতে নেই, গরমকাল বলেই হাঁপের টান এখন একটু কম। কিন্তু হাঁটু-কোমরের বেদনাটা কিছুতেই যায় না রে। রুনি একটা তেল আনিয়ে দিয়েছে বাইরে থেকে। মাখছি। কাজ তেমন হচ্ছে না।

ধীরাটা বরাবরই একটু দুর্বল ধাঁচের। তবে যত না শরীরে ব্যাধি, তার চেয়ে বেশি বুঝি মনে। রোগ রোগ করে, একটুতেই কাতর হয়ে, শরীরটা বেচারা আরও কমজোরি করে ফেলল। বাইরে থেকে দেখে যেমনই লাগুক, মীরারও তো প্রেশার আছে, গ্যাস-অম্বলের সমস্যায় ভালই ভোগেন। কিন্তু আধিব্যাধিকে মাথায় তুলতে তিনি রাজি নন। কাউকে কিছু না-বলে নিজেই ডাক্তারের কাছে গেছেন, ওষুধও খান, গোটা কয়েক ছোটখাটো নিয়ম মানেন, ব্যস দিব্যি আছেন। দু'-দু'খানা বড় অপারেশান হয়ে গেছে, তাতেও কি নুয়ে পড়েছেন কখনও? অবশ্য ধীরার মতো আর্থিক টানাটানির ভোগান্তিটা তাঁর যায়নি। নরেন মারা যাওয়ার পর দুই মেয়ে নিয়ে যা দুর্বিপাকে পড়েছিল বেচারি।

মীরা জিজ্ঞেস করলেন, নি ক্যাপটা পরছিস তো?

সবই করছি। সবই করি। কিছুতেই কিছু হয় না।... ছাড়। দিব্য কেমন আছে?

ভাল। বেশ ভাল।

যা একখানা ফাঁড়া গেল... এখন হাঁটাচলা করছে তো...?

হুঁ।... রুনি কী ঠিক করল শেষ পর্যন্ত?

নিমরাজি মতন হয়েছে। সোহম বলছে, বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমি পুরো রাজি করিয়ে নেব।

খুব ভাল। শ্রাবণ মাসেই তবে বিয়েটা লাগিয়ে দে।

আমারও তো সেরকমই ইচ্ছে। অবশ্য ঘটা করে কিছু করা যাবে না। রুনি সোহম দু'জনেরই আপত্তি। করলে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হবে। দু'বাড়ির লোকজন আসবে শুধু। ওদিক থেকে সোহমের বাবা মা দাদা বউদিরা, আর আমাদের সাইডের ঝুনি বিভাস যদি আসে... আর তুই... দিব্যও নিশ্চয়ই ততদিনে পুরো সুস্থ হয়ে যাবে...

দিব্যর নাম উঠতেই একটু যেন কুঁকড়ে গেলেন মীরা। ইতস্তত স্বরে বললেন, দিব্য বোধহয় দিল্লি যাওয়ার ধকল নিতে পারবে না রে।

দেরি আছে তো। এখনও প্রায় তিন মাস। ধীরার গলায় আবেগ, দিব্য না এলে হয়? সে আমার ছেলে... বিপদে আপদে পাশে পাশে থেকেছে... রুনি তার অত আদরের বোন...

প্রায় এই ধরনের কথা বোনের মুখ থেকে বহুকাল ধরে শুনছেন মীরা। এক সময়ে ভয়ংকর পীড়া বোধ করতেন, এখন অনেক সয়ে এসেছে। তবু খারাপ লাগে। এ এমনই এক অস্বস্তিকর গ্লানি, যা কিছুতেই কারও সঙ্গে ভাগ করা যায় না। ভালবেসে কেউ যেন তাঁর সারা মুখে পাঁক লেপে দিচ্ছে, অথচ মুখ ফুটে তিনি বারণ করতে পারছেন না— এমনই এক অনুভূতি জাগে যেন। এরকম মুহূর্তে এক একদিন দিব্যর বাবার কথা খুব মনে পড়ে মীরার। আপাতউদাসীন, নির্বিরোধী, কিন্তু শক্ত মনের মানুষটা আজ বেঁচে থাকলে চিত্তের ভার খানিকটা কি লাঘব হত?

ফুসফুসে এক খামচা বাতাস ভরে মীরা বললেন, সে দেখা যাবেখন। তবে আমি যাব। কথা দিচ্ছি।

আট বছর ধরেই তো আসব আসব করছিস! এবার যদি পদধূলি পড়ে। তোরই তো মেয়ের বিয়ে।

আবার সেই আবেগজর্জর সংলাপ! কোনওক্রমে হুঁ হ্যাঁ দিয়ে কথা চালিয়ে মীরা ফোন রাখলেন। মেজাজটার ছন্দ কেটে গেছে হঠাৎ। বেরোনোর মুখে ধীরার ফোনটা না-এলেই বুঝি ভাল হত।

বাইরে বিকেলটা ঝকঝক করছে। বাতাসে মেঘের বালাই নেই, রোদ এখনও যথেষ্ট কড়া। হাওয়া-টাওয়াও দিচ্ছে না তেমন। কদিন ধরেই একটা শুকনো গরম চলছে। তাপ ঝিনঝিন করে গায়ে ফোটে। শিগগির শিগগির ঝড়বৃষ্টি না হলে ভাজা ভাজা হয়ে যাবে শহরটা।

ছাতা মাথায়, গলি পেরিয়ে, মীরা ধীর পায়ে বড় রাস্তায় এলেন। ছেলের গাড়ি পাড়ার গ্যারেজেই থাকে, ড্রাইভারও এসে হাজিরা দেয় রোজ, তবে ওই গাড়ি মীরা চড়েন না পারতপক্ষে। ইচ্ছেই করে না। বাসে মিনিবাসে ওঠানামা করতেও কেমন অসুবিধে হয় ইদানীং, ভিড়ভাড়ও অসহ্য লাগে, টুকটাক যাতায়াতের জন্য মিটারের গাড়িই এখন ভরসা।

ট্যাক্সিতে উঠে মীরার হঠাৎই মনে হল, আর একটা নির্দেশ দেওয়া হয়নি গোবিন্দকে। প্রতি সোমবার ফিজিওথেরাপিস্টের পাওনা মেটাতে হয়, দিব্যর খেয়াল না-থাকারই কথা, গোবিন্দকে বলে এলে মামাকে সে স্মরণ করিয়ে দিত। যাক গে, কাল দেখা যাবে।

মীরার দু'হাত কোলের ওপর জড়ো, দৃষ্টি জানলার বাইরে। উলটো দিকে ছুটছে বাড়িঘর। চিন্তাও। শেষ অবধি তবে বিয়েতে রাজি হল রুনি? মতটা টিকে থাকবে তো? তাঁকে এবার বলে গিয়েছিল, মনস্থিরের পর্ব শেষ। তার পরেও তো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ বলতে দেড় মাস লাগিয়ে দিল! এত কীসের দোলাচল? এখনও? বহুদিন তো হল, এবার তো অতীতটাকে মুছে ফেলাই যায়। একটা ভুল, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, গোটা জীবনের ধারাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পারা উচিতও নয়।

তবে উচিত-অনুচিত দিয়ে কি সর্বক্ষেত্রে মানুষকে মাপা যায়? রুনির মধ্যে যদি কোনও পাপবোধ বাসা বেঁধে থাকে, তবে তা হঠানো খুবই কঠিন। সবাই তো আর দিব্যর মতো পদ্মপাতা নয়, যে টোকা মেরে জলটা ফেলে দেবে। সোহমকে কি সব খুলে বলেছে রুনি? না-বললে নিজেই পুড়বে। গোপন ক্ষত লুকিয়ে হাসিমুখে সংসার করতে গেলে যতটা মনের জোর দরকার, তা রুনির নেই। ঝুনির মতো তরলও সে নয়,

যে বরকে নিয়ে অক্লেশে খেলা করবে। সমস্ত রকম পাপাচার ধুয়ে ফেলে। সারাক্ষণ যদি হৃদয় বলে, সোহমকে সে কোথাও একটা ঠকিয়েছে, বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি তখনই তো শেষ।

সবচেয়ে ভয়ের বিষয়, দিব্যর ওপর রুনির এখনও টানটা রয়ে গেছে। পুরোমাত্রায়। দিব্যকে দেখতে এসে রুনি যতই ভানভণিতা করুক, মীরার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। দিব্যর কাছে যাচ্ছে না, গেলেও বেশিক্ষণ বসছে না, দুটো-চারটে কথা বলেই বেরিয়ে আসছে, বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটাচ্ছে... আবার সেই মেয়েই মাঝরাতে ও-ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত দিব্যর দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে সারারাত!

দৃশ্যগুলো স্মরণে এলেই চড়াং করে মাথা গরম হয়ে যায় মীরার। এই সময়ে যদি ছেলেকে ঘেঁটি ধরে এনে দেখাতে পারতেন কত বড় সর্বনাশ সে করেছে মেয়েটার!

শুধু রুনি কেন, পৃথার কম ক্ষতি করেছে দিব্য? স্বামীঅন্তপ্রাণ ছিল মেয়েটা, তাকে কী দগ্ধান না দগ্ধাল! অন্য নারীতেই যদি আসক্ত থাকবি, তা হলে ঢঙ দেখিয়ে বিয়ে করা কেন? তাও তো পৃথা দশ-দশটা বছর মুখ বুজে সহ্য করেছে দিব্যকে, অন্য কেউ হলে কী ঘটে যেত কে জানে! না, কণাদের সঙ্গে পৃথার সম্পর্ক গড়ে ওঠায় কোনও দোষ দেখেন না মীরা। তিলে তিলে মরার হাত থেকে তো বেঁচেছে মেয়েটা।

পৃথার মুখে প্রথম যেদিন দিব্যর ব্যভিচারের কথা শুনলেন, মীরা বিশ্বাসই করতে পারেননি। ছেলের একটু নারীঘটিত দোষ আছে, এ তিনি জানতেন, বিয়ের আগে গোটা কতক ফস্টিনস্টির খবরও তাঁর কানে এসেছে। তবে সেগুলোকে তেমন ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। এসব খুচরোখাচরা ভাব-ভালবাসা তো হয়েই থাকে। উঠতি বয়সে শরীরী কৌতূহল সর্বদা শিকলে বাঁধা থাকবে, এমন ধারণা আঁকড়ে থাকার মতো প্রাচীনপন্থীও তিনি নন। মানুষ যে স্বভাবতই বহুগামী, তাও তিনি জানেন। কিন্তু বিয়ের পর তো কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়। তার ওপর কিনা রুনিকে নিয়ে...?

সে রাত্রেই ছেলেকে ডেকেছিলেন ঘরে। আশ্চর্য, অভিযোগটা শুনেও দিব্যর এতটুকু হেলদোল নেই! নির্লজ্জের মতো বলে দিল, ওটা জাস্ট একটা মোমেন্টের ব্যাপার, মা। তুমি ওই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

ছি ছি দিব্য, রুনি না তোর বোন?

সো?... শরীর অতশত বোঝে না, মা। খিদে পেলে তাকে খাবার দিতে হয়। এটাই নিয়ম।

তার জন্য তোর বউ আছে। প্রেম করে তাকে বিয়ে করেছিস, তার চোখের সামনে তুই বেলেল্লাপনা করবি...

পৃথার ব্যাপারটা আমাকেই বুঝতে দাও, তোমার নাক গলানোর দরকার কী! পৃথাকে আমি যথেষ্ট ভালবাসি। তাকেও বুঝতে হবে আমার শরীর আর মন, দুটো এক নয়।

কী যে আজব যুক্তি! নাকি কুযুক্তি? সেদিনের পর আরও কত অজস্রবার তিনি ভর্ৎসনা করেছেন ছেলেকে। রুনি-ঝুনিকেও যতটা বলার বলেছেন ঠারেঠোরে, নিজের মান বাঁচিয়ে। রুনির গায়ে তাও মানুষের চামড়া, মাসির বাড়ি আসাটাই সে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ঝুনি? বেহায়ার বেহদ্দ। মাসি বাড়িতে আছে জেনেও দিব্যর ঘরে ঢুকে...! শেষের দিকে পৃথা তো মীরার দিকেই আঙুল তুলতে শুরু করেছিল, আপনি দায়ী! ইচ্ছে করে আপনি বোনঝিদের কন্ট্রোল করছেন না! ইনডাইরেক্টলি আপনিই প্রশ্রয় দিচ্ছেন ছেলেকে!

আর কী-ই বা করতে পারতেন মীরা? দিব্যকে ঘাড় ধরে বার করে দিলে কি সমস্যার সমাধান হত? নাকি বোনঝিদের সামনে নো এনট্রি বোর্ড ঝুলিয়ে দিলে চুকে যেত ল্যাটা? কিছুতেই কিছু হত না। কল্পনা যে কল্পনা, নিছক একটা কাজের মেয়ে, তাকেও কি ছেড়ে কথা বলেছে দিব্য? এমনি এমনি তাকে এখান থেকে তুলে সুবর্ণলতার সর্বেসর্বা করে বসিয়ে দিল? মীরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলেন?

চিন্তার মাঝেই কখন বালিগঞ্জ সারকুলার রোড পৌঁছে গেছেন মীরা। বড় স্কুলবাড়িটা পেরিয়ে নামলেন ট্যাক্সি থেকে। পাশের রাস্তাটায় ঢুকে একটু গেলেই তাঁদের থিয়োলজিকাল ইনস্টিটিউট। একতলায় একটা বড়

হল আছে, সেখানেই আসর বসে ধর্মতত্ত্বের। সপ্তাহে পাঁচ দিন।

খান চল্লিশেক চেয়ারের অধিকাংশই ভরে গেছে। মীরা তৃতীয় সারিতে একটা ফাঁকা সিটে বসলেন। চলছে সভা, মীরা মন দিলেন কথকের ভাষণে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করে শোনাচ্ছেন এক সৌম্যকান্তি প্রৌঢ়। সংস্কৃতে শ্লোক উচ্চারণ করে বাংলায় তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

অন্য দিন মীরা নিমগ্ন থাকেন পাঠে। আজ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন বারবার। তার মধ্যেই হঠাৎ কানে এল, হে মহাবাহু অর্জুন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিনটি গুণ প্রকৃতিতেই আছে, এরাই নিষ্ক্রিয় আত্মাকে দেহাভিমান দিয়ে শরীরে আবদ্ধ করে। তা এর মধ্যে সত্ত্বগুণটা কী? মানুষ যদি নিজেকে সুখী ভাবতে পারে, আর জ্ঞানের আসক্তি দিয়ে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করতে পারে, তবেই বুঝতে হবে সেই মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটেছে। হৃদয় অবশ্য এখানে আত্মার প্রতিরূপ। আর এই মানুষটিকে আমরা বলব সাত্ত্বিক।

মীরা নড়েচড়ে বসলেন। জ্ঞানের প্রতি আসক্তি তো দিব্যরও আছে। তা হলে কি তাকে সাত্ত্বিক বলা যেতে পারে? কিন্তু নিজেকে কি সুখী ভাবতে পারে দিব্য?

আর একটু এগিয়েছেন কথক, এবার আসছি রজঃ গুণে। রজোগুণ মূলত রাগাত্মক। রাগ মানে এখানে কাম। অর্থাৎ কামনা। অভিলাষ। যা পাইনি, তা পাওয়ার ইচ্ছেটা রজোগুণের একটা প্রধান অংশ। রজোগুণই আমাদের মধ্যে তৃষ্ণা আর আসক্তির জন্ম দেয়। যে-কোনও একটা কাজ যদি আমরা করি, তবে সেই কাজটা করার জন্য আমাদের মধ্যে যে-আত্মতৃপ্তি দেখা দেয়, সেটাও রজোগুণ।

কী আশ্চর্য, এই আসক্তি আর আত্মাভিমান দিব্যর মধ্যে ভীষণভাবে প্রকট! আর তৃষ্ণা তো তার অন্তহীন। তা হলে কি দিব্য রজোগুণের মানুষ? কিন্তু আসক্তি তো সে ঝেড়েও ফেলতে পারে অনায়াসে। কোনও বন্ধনে যে নেই, সে রাজসিক হয় কী করে?

কথক বলে চলেছেন, তমোগুণের কথা ধরা যাক এবার। যে-গুণের

ফলে মানুষের হিত-অহিত জ্ঞান লোপ পায়, বিবেক নিষ্ক্রিয় থাকে, প্রধানত সেটাই তমোগুণ। আমরা জীবনে যেসব ভুল করি, কর্মে আলস্য দেখাই, কিংবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করি, সবই এই তমোগুণের কারণে...

দিব্যকে কি বিবেকবান বলা সঙ্গত? আপনজনের মনে যে সজ্ঞানে দুঃখ দিতে পারে, তার বিবেক সম্পর্কে কি সংশয় জাগে না? ভাল-মন্দের ধারণাগুলোও দিব্যর কেমন গোলমেলে। দিব্য কি তবে তামসিক? তাই বা কী করে হয়? কাজে আলসেমি বা সময়ের অপচয়ের প্রবণতা তো দিব্যর স্বভাবে নেই!

উঁহুঁ, দিব্য এসব কোনওটাই নয়। আবার বোধহয় মিলেমিশে সবগুলোই। ছোটবেলায় ফড়িং ধরে, কাচের বোতলে পুরে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকত দিব্য, কাগজ আর রং পেনসিল নিয়ে নানাভাবে আঁকত ফড়িংটাকে, আবার আঁকা হয়ে গেলে পতঙ্গটাকে হাতের মুঠোয় চেপে একটা একটা করে তার ডানা ছিঁড়ত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের কী বিচিত্র সমন্বয়!

তা মানুষ বোধহয় এরকমই হয়। কোনও শাস্ত্রের সংজ্ঞায় বাঁধা পড়ে না পুরোপুরি। এই তো বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে, পূর্বপুরুষদের দোষগুণ নাকি পরের প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। জিনের কেরামতি। কিন্তু দিব্যর সঙ্গে দিব্যর বাবার কতটুকু মিল? চেহারাই অন্য রকম। সুধাময় ছিলেন মেরেকেটে পাঁচ ফুট ছয়, দিব্য ছ'ফুট ছুঁইছুঁই। গায়ের রং আর হাইট তো ছেলে মীরার কাছ থেকে [illegible] য়েছে। আবার সুধাময় ছিলেন নিতান্ত নিরীহ মানুষ। ঘরকুনো। আড্ডা হইচই বন্ধুবান্ধব থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস, এই ছিল তাঁর নড়াচড়ার পরিধি। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেশামিশিও পছন্দ করতেন না, সামাজিক কাজকর্মে জোর করে তাঁকে নিয়ে যেতে হত। নেশা বলতে ছিল রেডিয়ো আর খবরের কাগজ। ঘরের মধ্যে বসে থেকে সারা পৃথিবীর খবর জেনে তাঁর যে কী সুখ হত কে জানে! অথচ দিব্যর গোটা পৃথিবীটাই ঘরবাড়ি। দঙ্গল, হইহল্লা ছাড়া সে হাঁপিয়ে ওঠে। চেনাজানার

বৃত্তটা যে দিব্যর কত বিশাল! মানুষের সঙ্গে মেশাটাই যেন দিব্যর প্যাশন। প্রায় অপরিচিত লোকও তিন দিনে দিব্যর গলায় গলায়, এমনটা দেখে দেখে মীরার চোখ পচে গেল। শুধু চেনা নয়, তাদের হাড়হদ্দও দিব্যর জানা চাই। তা সেই মানুষ মোড়ের রিকশাওয়ালাই হোক, কি অতি সম্ভ্রান্ত কেউ। এত সহজভাবে তাদের স্তরে মিশে গিয়ে গপ্পো চালাতে পারে দিব্য!

তবে একটা ব্যাপারে দিব্য প্রায় বাপ কা বেটা। দেখে যতই নরম-সরম মনে হোক, অদ্ভুত এক কেঠো জেদ ছিল সুধাময়ের। দাপুটে বাবার ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে ম্যাট্রিক পাশ মীরাকে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন সুধাময়। এ এক ধরনের দূরদর্শিতাও বটে। মাত্র বিয়াল্লিশ বছরে হৃদরোগে মারা যান তিনি, সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির অফিসে তাঁর জায়গায় চাকরিটা পেতে মীরার অসুবিধে হয়নি, বি.এ পাশ করাটা কাজে লেগে গিয়েছিল।

জেদি দিব্যও কম নয়। আর্ট কলেজে তো জোর করে ভরতি হল, মীরা পইপই করে বারণ করা সত্ত্বেও। ক্ষতি অবশ্য হয়নি। ছেলের নামযশ দেখে মীরার তো এখন গর্বই হয়।

বাপ-ছেলের একটা ঘোরতর অমিলও মনে পড়ে গেল মীরার। সুধাময় ছিলেন একটু বউঘেঁষা। আড়ালে অনেকেই তাঁকে স্ত্রৈণ বলত, মীরা জানেন। দিব্যকে কি ভুলেও ওই অপবাদ দেওয়া যাবে?

বাবা নয়, দিব্যর মধ্যে দিব্যর ঠাকুরদাই বুঝি বেশি প্রকট। তিনিও ছিলেন হইহইবাজ, আড্ডাপাগল। শাশুড়িহীন সংসারে এসে মীরা শ্বশুরমশাইকে পাননি বেশি দিন, রেলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার মুখে মুখে তিনি গত হন। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। তবে ছ'-সাত বছরেই মীরা যা দেখেছেন...। তখন রবিবার বা ছুটির দিন মানেই বাড়িতে মোচ্ছব। সকাল থেকে ইয়ারদোস্ত আসছে, তাদের এই বানিয়ে দাও, ওই বানিয়ে দাও... দুপুরে এতজন খাবে, অতজন খাবে ...। দেওরের তখনও বিয়ে হয়নি, একা হেঁশেল সামলাতে সামলাতে মীরার প্রাণ যায় যায়। আর সন্ধেবেলা তো বোতলের আসর বসবেই বসবে।

দেবীপ্রসাদ সিংহের নীতিবোধটাও ছিল ভারী আজব। ছিলেন ট্রেনের টিকিটচেকার, পাঁচ হাতে ঘুস খেতেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনও রাখঢাক গুড়গুড়ও ছিল না। উৎকোচের টাকায় দু'-দু'খানা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন কলকাতায়। আবার সেই দেবীপ্রসাদই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, দানধ্যানও করতেন দেদার। একটাই প্রত্যাশা, সবাই তাঁর গুণগান করুক।

গুণগান তো দিব্যও চায়। করেও সে লোকের জন্য। কেউ এসে সাহায্য চাইলে দিব্য কখনও তাকে বিমুখ করে না। বাজারের এক ডিমওয়ালির মেয়ের বিয়েতে এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিল। ছাত্রছাত্রীরা কেউ হয়তো মাইনের টাকা দিতে পারছে না, কিংবা পরীক্ষার ফি কম পড়ে গেছে, দিব্য স্যারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কিছু না-কিছু বন্দোবস্ত হবেই। তবে শ্বশুরমশাইয়ের মতো অসৎ উপায়ে বোধহয় টাকা রোজগার করে না দিব্য। কাজকর্মেও তার নিষ্ঠা দেখার মতো। দিব্য যখন একাগ্র চিত্তে ছবি আঁকে, দুনিয়া রসাতলে গেলেও সে টের পাবে কি? নিজস্ব উপলব্ধিকে রঙে রঙে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাটাই বা তাকে কে দিল? এটা কি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা?

তবে হ্যাঁ, গানের গলা দিব্য পেয়েছে মীরাদের দিক থেকে। মীরার বাবা রীতিমতো নাড়া বেঁধে গুরুর কাছে গান শিখেছিলেন, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পাচর্চা করতেন নিয়মিত, মুঙ্গেরে মীরার বাপের বাড়িতে কত যে বড় বড় গাইয়ের আসাযাওয়া ছিল। মা অবশ্য বাবার এই সংগীতপ্রীতিকে পছন্দ করেননি কোনওদিন। নিষ্কর্মা বর বাপের পয়সায় বসে বসে খাচ্ছে, আর রাতদিন দ্রিমতানাদেরেনা করছে, কোন বউই বা মন থেকে বরদাস্ত করতে পারে? গোদের ওপর বিষফোড়া, বাবা কিনা জড়িয়ে পড়লেন এক অবৈধ সম্পর্কে, মীরারই দূর সম্পর্কের এক মাসির সঙ্গে। মা কাঁদতেন লুকিয়ে লুকিয়ে, বাবাকে সামনে পেলে দুশ্চরিত্র লম্পট বলে গাল পাড়তেন, কিন্তু মণিমাসিকে কেন যেন তাড়াননি বাড়ি থেকে।

হঠাৎই মীরা কেঁপে গেলেন ভেতরে ভেতরে। দিব্য কি তবে তাঁর বাবার কাছ থেকেই ...? নাকি বাবা মা, ঠাকুরদা, দাদামশাই, দিদিমা,

হয়তো বা অদেখা ঠাকুমা, সবাই একসঙ্গে বয়ে চলেছে দিব্যর শিরা-উপশিরায়?

গীতাপাঠ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। চলছে পঞ্চদশ অধ্যায়। পুরুষোত্তম যোগ। সংসারবৃক্ষ, বৈরাগ্য, শাণিত অস্ত্র, আরও কী কী সব যেন বলছেন কথকমশাই। কিছুতেই স্থিতমনা হতে পারছিলেন না মীরা। এমন চিত্তবিক্ষেপ তাঁর কদাচিৎ ঘটে। কী যে আবোলতাবোল চিন্তা আজ ঢুকে পড়েছে মাথায়!

নিঃশব্দে উঠে পড়লেন মীরা। বাইরে এসে খোলা জায়গায় দাঁড়ালেন একটু। তারপর ট্যাক্সি ধরে সোজা বাড়ি।

ঢোকার মুখেই হিমাদ্রি। একতলার ভাড়াটে, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, কলমের রিফিল তৈরির ব্যাবসা করে, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ভারী নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। একগাল হেসে হিমাদ্রি বলল, ভাল আছেন, মাসিমা?

এই তো...। মীরা মৃদু হাসলেন, তোমাদের কলটা সারিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর কোনও সমস্যা হয়নি তো?

ঠিকই আছে।... তবে মাসিমা, ভেতর বারান্দার সিলিংটা একটু ড্যামেজ হয়েছে। একটা জায়গায় চাঙড় খসে ঝুলছে। বেশি কিছু নয়, তবু...

হুম। ভাবছি এবার মিস্ত্রি লাগাব। ওপরেও অল্পস্বল্প কাজ আছে। দিব্য আর একটু সেরে উঠলেই...

না না, তাড়া নেই কিছু। এক-দু'মাস পরেই করুন না। হিমাদ্রি ঘাড় চুলকোচ্ছে। আবদারের সুরে বলল, ওই সময়ে ঘরটরগুলো একবার রং করে নিলে হয় না?

হিমাদ্রির অনুরোধ কিছু অসঙ্গত নয়। সেই কবে বাড়ি রং হয়েছিল, প্রায় এগারো বছর। পৃথা যাওয়ার পর পরই আগের ভাড়াটে ফ্ল্যাট কিনে উঠে গেল, তখনই হাত পড়েছিল গোটা বাড়িতে। দিব্য ঠাট্টা করে বলেছিল, দেখো, পাড়ার লোক যেন না-ভাবে বউ চলে যাওয়ার আনন্দে শাশুড়ি বাড়ির জৌলুশ বাড়াচ্ছে!

স্নিগ্ধ স্বরে মীরা বললেন, সে প্ল্যানও মাথায় আছে। দেখা যাক কদ্দূর কী করে উঠতে পারি।

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, মাসিমা।... রোববার সকালে গিয়ে দিব্যদার সঙ্গে দেখা করে আসব।

হিমাদ্রি হয়তো কিছু ভেবে বলেনি কথাটা, তবু মীরার হাসি পেয়ে গেল। তিনি রং করাতে রাজি না হলে হিমাদ্রি কি দিব্যকে দেখতে যাবে না?

আলগা হাসিটাকে ঠোঁটে রেখে মীরা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায়। দিব্যর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। নীলু বসে আছে দিব্যর কাছে। হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে দিব্যকে, ঘাড় দোলাচ্ছে দিব্য।

মীরাকে দেখে দিব্য জিজ্ঞেস করল, আজ এত তাড়াতাড়ি?

চলে এলাম। দেওরের ছেলের দিকে তাকালেন মীরা, কী রে, তুই কতক্ষণ?

নীলু সপ্রতিভভাবে কবজি দেখল, তা ধরো প্রায় চল্লিশ মিনিট।

গোবিন্দ চা-টা দিয়েছে?

ইয়েস। দিব্যদার নোনতা সুজিও অর্ধেক মেরে দিলাম।

বেশ করেছিস। বাড়ির খবর সব ভাল তো?

চলতা হ্যায়, জেঠিমা। নাথিং নিউ। মা আরও ফুলছে, বাবার মর্নিং ওয়াকের স্প্যান বাড়ছে, তোমাদের বউমা শুঁটকো হওয়ার জন্য একের পর এক খাওয়া ছাড়ছে, তোমার নাতির গেছোমি...

হয়েছে। তোর মালগাড়ি থামা।... বস, আমি আসছি।

মীরা সরে এলেন দরজা থেকে। বলতে নেই, তাঁর দেওরের বাড়িতে আধিব্যাধি খুব কম। মনোময় মীরার চেয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছরের বড়, অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় তিয়াত্তর প্লাস, এখনও শরীর বেশ মজবুত। লেক গার্ডেন্সের বাড়িটা থেকে রোজ হাঁটতে যায় রবীন্দ্র সরোবরে। বংশের ধারা ভেঙে মনোময়ই যা একটু দীর্ঘায়ু হল।

ঘরে এসে কাপড় বদলালেন মীরা। দিব্য নার্সিংহোম থেকে ফিরতে তাও এ-বাড়িতে বারকয়েক দেখা গেছে মনোময়কে, এমনিতে তো সে এখানে প্রায় আসেই না। ছেলেই বাপের কর্তব্য সারে। মীরার দেওরটি চিরকালই একটু স্বার্থপর। নিজেরটুকু ছাড়া কিছুই বোঝে না। দাদা মারা

যাওয়ার পর দুটো বছরও চেতলায় রইল না, লেক গার্ডেন্সের বাড়ির দোতলার ভাড়াটে তুলে বউ-ছেলে নিয়ে চলে গেল সেখানে। মুখে যদিও বলে, বউদির সুবিধে করতেই তার এই প্রস্থান, একতলাটা ভাড়া দিয়ে বউদি আরামসে থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি কি তাই? আদতে তো বাপের সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেওয়া। বউদি আর ভাইপোর দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলা। অথচ মনোময়রা থাকলে হয়তো ভালই হত। অন্তত দিব্যর জন্য। যৌথ সংসারে মানসিক বিকার সংযত থাকে।

কালো কলকাপাড় সাদা শাড়ি ভাঁজ করে মীরা রাখছেন আলনায়, ঘরে নীলু। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, তোমার গোবিন্দরাম নাকি একটা শালিখ পুষেছে?

আর বলিস না, কী যে খ্যাপামো! বলে, ওটা নাকি ময়না! যা না, বারান্দায় আছে, দেখে আয়।

খাঁচা পর্যবেক্ষণ করে এসে নীলু বলল, না গো, ময়না হলেও হতে পারে। শালিখের সঙ্গে একটু তফাত আছে।

ছাই তফাত।... চা খাবি নাকি আর একবার?

তোমার জন্য করলে বলে দাও। আমার তো চায়ে না নেই।

গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়ে খাটের এক ধারে বসলেন মীরা। পলকা কৌতূহলমাখা স্বরে বললেন, দাদাকে অত হাত-পা নেড়ে কী বোঝাচ্ছিলি রে?

সে একটা ব্যাপার আছে। নীলু চোখে রহস্য করল, প্রাইভেট।

ও। আমাকে বলা যায় না বুঝি?

তা ঠিক নয়। নীলু হঠাৎ নিশ্চুপ। তারপর কপাল কুঁচকে বলল, তোমার বোধহয় জেনে রাখাই ভাল। দাদা তোমার মায়ের সম্পত্তি টম্পত্তি বেচে যে-টাকাটা পেয়েছিল... ষোলো লাখ...

কত?

তুমি জানো না?

দিব্য আমা[illegible] কিছু বলে নাকি? ও[illegible] কিছু জিজ্ঞেস করা মানেই তো ওর কাজে নাক গলানো...

স্ট্রেঞ্জ! তোমার মা'র জমি-বাড়ি...! নীলু আবার একটুক্ষণ স্পিকটি নট। তারপর গলা নামিয়ে বলল, যাক গে, শোনো, দাদা ষোলো লাখ পেয়েছিল। তার অর্ধেক সুবর্ণলতা তৈরিতে খরচ করেছে, বাকিটা ফিক্সড করে রেখেছিল। মাস মাস একটা সুদ পেত। খুব কম। চার হাজার। এই বছরখানেক আগে আমায় এসে বলল, তুই তো শেয়ার টেয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস, এই টাকাটা কীভাবে লাগানো যায় বল তো? উইথ মিনিমাম রিস্ক? আমি তখন সব ব্যবস্থা ট্যবস্থা করে দিলাম। এখন দু'-তিন মাস ছাড়া ছাড়া ভাল ডিভিডেন্ড পাচ্ছে, সুবর্ণলতারও অ্যাকাউন্ট মোটা হচ্ছে। দাদাও খুশি, আমারও কমিশন আসছে।... এই তো, সেরিব্রালটার আগেই বলছিল, এভাবে রিটার্ন এলে সামনের বছরের মধ্যে সুবর্ণলতায় আর একটা বিল্ডিং তুলে ফেলবে। গ্রামের বয়স্ক মেয়েদের জন্য একটা ইনফরমাল স্কুল স্টার্ট করার প্ল্যান আছে, সেখানে মাস্টার ফাস্টার লাগবে... গ্র্যান্ট ট্যান্ট জুটছে বটে... কিন্তু মনের মতো করে কিছু গড়তে গেলে সব সময়ে গ্র্যান্টের জন্য হাপিত্যেশ করে থাকলে তো চলে না...। কথাটা তো ভুল নয়, বলো জেঠিমা?

মীরা অস্ফুটে বললেন, হুঁ।

গোবিন্দ চা এনেছে। কাপ হাতে নিয়ে বড় করে একটা চুমুক দিল নীলু। ভুরুতে হালকা ভাঁজ ফেলে বলল, যাক গে, তুমি জেনে গেলে, ভালই হল। আমিও মেন্টালি অনেকটা ফ্রি হলাম। দাদার স্ট্রোকের খবর শুনে তো মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল আমার। সুবর্ণলতার নামে অতগুলো টাকা বাজারে খাটছে...। যদি দাদার হঠাৎ কিছু ঘটে যায়, তো সাড়ে সর্বনাশ। সুবর্ণলতার ওই অ্যাকাউন্ট কে হ্যান্ডেল করবে? ইনফ্যাক্ট, দাদাকে আমি আজ অ্যাডভাইস করে গেলাম তোমার সঙ্গে অ্যাকাউন্টটা জয়েন্ট করে রাখতে।

কী বলল তোর দাদা?

হুঁ হাঁ করল না। তবে মনে হয় রাজি। দ্যাখো না, দু'-একদিনের মধ্যেই বোধহয় তোমায় বলবে। আর একখানা শব্দময় বড় চুমুকে নীলুর কাপ শেষ। নিচু গলায় বলল, তুমি কিন্তু নিজে থেকে কিছু আলোচনা কোরো

না। দাদা বহুত সেয়ানা আছে, ঠিক বুঝে ফেলবে, হেভি খচে যাবে আমার ওপর।... আফটার অল, দাদা একটা ভাল কাজ করছে তো, তাই আমি তোমাকেও অ্যালার্ট করে রাখলাম...

বেশ করেছিস।

বেশ কি না জানি না। পরে যেন আমার কোনও বদনাম না হয়।... কেজো কথা বাদ দাও, একদিন এসো আমাদের বাড়ি। টিভি দেখে দেখে তোমার বউমা কত নতুন নতুন রান্না শিখল, টেস্ট করে যাও। এঁচোড়ের পায়েস, লাউয়ের মালাইকারি, চিকেন ভ্যানতাড়া...

অ্যাই, ফাজলামি করিস না তো।

হ্যা হ্যা হাসতে হাসতে চলে গেল নীলু। মীরা উঠে কাপ দুটো রান্নাঘরের সিঙ্কে রেখে এলেন। নীলু আজ তাঁকে অবাক করে দিয়েছে। খানিকটা স্বস্তিও বোধ করছেন যেন। কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করত, দিব্য টাকাগুলো সুবর্ণলতায় ঠিক ঠিক খরচ করছে তো? মা অনেক আশা নিয়ে, বিশ্বাস করে, বাপের বাড়ি সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি বড় মেয়ের নামে লিখে দিয়েছিলেন। মীরা যেন গরিব মেয়েদের জন্য কিছু একটা করে। দিব্য যখন দায়িত্বটা মাথায় তুলে নিল, খুব খুশি হয়েছিলেন মীরা। তারপর তাঁকে তুড়ি মেরে হঠিয়ে দিয়ে সব কিছু যেভাবে একা একা করছিল...। যাক, দিব্য তাঁকে ঠকায়নি। ওই সম্পত্তি নিয়ে ঝুনি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অনেক প্রশ্ন করে তাঁকে, ঢোঁক গিলে গিলে জবাব দিতে হয়, এবার তো আর সদুত্তর দেওয়ার অসুবিধে রইল না।

গোবিন্দ উঁকি দিয়েছে, দিদা, রুটিগুলো করে ফেলব?

মীরা দেওয়ালঘড়ি দেখলেন, এত তাড়াতাড়ি? সবে তো পৌনে আটটা। মামা ন'টায় খাবে।

তা হলে একটু টিভি দেখি?

চালা। কিন্তু আস্তে।

কী একটা হাসির সিরিয়াল চলছে টিভিতে। দু'-চার মিনিট মীরাও চোখ রাখলেন পরদায়। গল্প আধাখেঁচড়া অবস্থাতেই ঝাং ঝাং বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেল। সাধে কি মীরার টিভি দেখতে বিরক্ত লাগে!

বিছানা ছেড়ে নামলেন মীরা। দিব্যর কাছে গিয়ে একটু বসলে হয়। দিনমানে ছেলের সঙ্গে আজ তো কথাও হয়নি তেমন। চব্বিশ ঘণ্টা টো-টো করে বেড়ানো দিব্য এখন পরিপূর্ণ গৃহবন্দি, মা হিসেবে তাঁর কি মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গ দেওয়া কর্তব্য নয়?

দিব্যর ঘরে ঢুকে মীরার পা আটকে গেল। দিব্য বসে আছে দক্ষিণের জানলায়। গভীর তন্ময় ছেলে কী যে দেখছে অন্ধকারে! মা যে পিছনে দাঁড়িয়ে, দিব্যর হুঁশই নেই।

ছেলের চওড়া কাঁধে হাত রাখতে গিয়েও সরে গেলেন মীরা। এত কাছাকাছি থেকেও দিব্য যেন আবছা হয়ে এল ক্রমশ।

তেরো

দিব্যজ্যোতি একা একা দাবা খেলছিল। চৌষট্টি ঘরের বোর্ডটা তাকে আজ পেয়ে বসেছে যেন। মধ্যাহ্নভোজের পর একটু ঝিমিয়ে নিয়ে ঘুঁটি সাজিয়ে শুরু করেছিল, এখনও একটা দান পুরো হল না। সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হয়ে খেলা যে কী কঠিন! সাদা এগোতে গেলে কালোর ফাঁকফোকর নজরে পড়ে যায়, কালোকে এগোলে সাদার। কাউকেই তো সহজে জিততে দেওয়া চলে না, তাই দিব্যজ্যোতি খেলছে খুব সতর্ক হয়ে, ঢিমেতালে। এক একটা চাল দিয়ে ভাবছে তো ভাবছে, ভাবছে তো ভাবছে।

ডান দিকে নৌকোর ঘরের কালো বোড়েটাকে ষষ্ঠ ঘরে ঠেলতে গিয়ে দিব্যজ্যোতির হাত থেমে গেল। সাদা গজের রাস্তাটা খুলে যাচ্ছে না? চাল একবার দিয়ে ফেললে ফেরত নেওয়া যাবে না, এ-নিয়ম সে নিজেই স্থির করেছে, সুতরাং বোড়েটা না-ছোঁয়াই ভাল। বরং টিকে থাকা কালো ঘোড়াটাকে নিয়ে একটু ভাবলে হয়। রাজা-মন্ত্রীকে ঘিরে জব্বর দুর্গ গড়ে ফেলেছে সাদা, সরাসরি সেখানেই হানা দেওয়া দরকার।

মাথা চুলকে চুলকে শেষমেশ ঘোড়াটাকেই আড়াই ঘর বাড়াল

দিব্যজ্যোতি। হ্যাঁ, এই ভাল। নৌকো মন্ত্রী, দুটোই একসঙ্গে ধরা পড়ছে, আবার ঘোড়ার পিছনে বোড়ের জোরও থাকছে। সাদা এবার সরাক মন্ত্রীকে।

নিজের মগজকে ঘুরিয়ে ফের কালো থেকে সাদায় আনছিল দিব্যজ্যোতি, সামনে মূর্তিমান বাধা। মীরা আর গোবিন্দর যুগলে প্রবেশ।

দিব্যজ্যোতি ঘাড় ওঠাল। মীরাকে দেখে নিয়ে বলল, বেরোচ্ছ নাকি? আজ তো তোমার মিশন নেই!

একটু কসবা যাব রে।

সেখানে আবার কে আছে? তোমার ধর্মপথের কোনও সহযাত্রী?

ফের তোর ওই বাঁকা বাঁকা কথা! কতবার বলেছি, ধর্মকর্ম করতে আমি যাই না। নানান ধরনের তত্ত্বকথা শুনতে আমার ভাল লাগে। নিজে মানা না-মানাটা বড় নয় দিব্য, জানাটাই বড়।

ওয়েল সেড। দিব্যজ্যোতি খুনসুটিটায় মজা পেল। দাঁত বার করে বলল, কসবায় তা হলে কোন মক্কেল?

বললাম যে, মুঙ্গেরের রানিদি এসেছে। পেটে কী একটা অপারেশন হবে।... যাই, একবার দেখা করে আসি। মনটা খুব টানছে।

তোমাদের মনেরও বলিহারি। দিদা মারা যাওয়ার পর তো মুঙ্গেরের ছায়াও মাড়াওনি। বিশ বছর পর সেই মুঙ্গেরের দিদির জন্য হঠাৎ মন উচাটন!

মন থাকলেই উচাটন হয়, দিব্য। শুধু বিশ বছর নয়, যদ্দিন মানুষ বেঁচে থাকে, তদ্দিনই হয়। তুই এসব বুঝবি না।

কিঁউ? দিব্যজ্যোতি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল, মুঝমে দিল য্যায়সা গড়বড়িয়া চিজ নেহি হ্যায় কেয়া?

হ্যায়, কি নেই হ্যায়, ভাবো। আমি যাচ্ছি।

যাও। গলা জড়িয়ে একটু কেঁদে এসো। দিব্যজ্যোতি চোখ টেরচা করে গোবিন্দকে দেখল, তা এই পক্ষীপ্রেমিকটিও তোমার সহচর হচ্ছেন নাকি?

তোকে একা ফেলে বেরোই আমি? মাখনলালকে চারটে শাড়ি ইস্ত্রি করতে দিয়েছিলাম, নিয়ে চলে আসবে গোবিন্দ।

দিব্যজ্যোতি চোখ টিপল, তা হলে ওকে দিয়ে কয়েকটা সাদাকাঠিও আনাই...

কী? কী আনাবি?

সিগারেট। আহা, কতকাল সুখটান দিইনি। তিন তিনটে মাস...। খেতে কেমন তাই তো ভুলে গেছি।

ভুলেই থাকো। আবার তোমার ডানা গজাচ্ছে, তাই না?

বা রে, এবার তো ওড়াউড়ি স্টার্ট করতেই হবে। আমি ডিসাইড করে ফেলেছি, নেক্সট শনিবার সুবর্ণলতায় যাব।

খবরদার। একদম বাড়াবাড়ি নয়। এখনও তুমি লাঠি নিয়ে হাঁটছ। ডাক্তার বলে দিয়েছে, আরও মিনিমাম এক মাস রেস্ট।

ওই ডাক্তারের বাড়ি ঢোকা এবার আমি বন্ধ করে দেব। ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তোমাকে আধমরা করে দিল!

যা খুশি করো

ছেলের দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মীরা। লেজুড় সহ, হা হা হেসে উঠল দিব্যজ্যোতি। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা শুনল কান পেতে। আবার মনোনিবেশ করেছে সাদা-কালোর যুদ্ধে।

সাদা মন্ত্রীকে যে কোন ঘরে রাখা যায় ভেবে পাচ্ছিল না দিব্যজ্যোতি। কালো বেশ ভালমতোই চেপে ধরেছে। তিড়িংবিড়িং লাফানো ঘোড়াটাকে কি সাফ করে দেবে বোর্ড থেকে? বড় প্যাঁচোয়া এই ঘোড়া, সোজাসাপটা চলে না, হুশহাশ ঢুকে পড়ে এদিক-ওদিক। সামনে আড়াল রেখেও নিস্তার নেই, টপকে যাবে টুপ করে। তফাতে থেকেও রাজা বিপন্ন হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। নাহ্, একটা কিছু করতেই হয়।

সাদা গজ দিয়ে দিব্যজ্যোতি কালো ঘোড়াকে সাবাড় করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কালো বোড়ে কাটল গজকে। ঝট করে এগিয়েও গেল এক ঘর। দিব্যজ্যোতির মনে হল যেন অনেকটা। ষষ্ঠ ঘরে পৌঁছেছে, আর দু'ধাপ পেরোলে ওই তুচ্ছ একরত্তি বোড়ে হয়ে যাবে মন্ত্রীর সমান সমান।

সাদাকে আরও সাবধানী হতে হবে এবার।

মাথা বোর্ডের আরও কাছে ঝুঁকিয়ে সাদার শক্তি নিরীক্ষণ করল দিব্যজ্যোতি। ঘোড়া গেছে, গজও খতম, একটা নৌকোও বদল করতে হয়েছে একটু আগে, মন্ত্রী ছাড়া আছে মাত্র দুটো ক্ষীণ বল বোড়ে... শালা সাদার আর এ-যাত্রা রক্ষা নেই। কী করা যায়? কী করে বাঁচানো যায়? মরিয়া হয়ে বোড়ের চাল দেবে? সাইডের সাদা পদাতিক যদি এক পা এগোয়, কালো হাতিকে পিছোতে হবে দু'পা। তখন যদি মন্ত্রীকে ঠিকঠাক ব্যবহার করা যায়...! একটাই সমস্যা, কালো বিশেষ ভুল করেনি, বরং সাদাই দুটো-তিনটে গন্ডগোল করে ফেলেছে। অকারণে দু'-দু'খানা আয়ুধ খোওয়াল।

প্যাসেজে কলিংবেলের আওয়াজ। দিব্যজ্যোতির ভুরু কুঞ্চিত হল। গোবিন্দ ব্যাটা কি চাবি নিয়ে যায়নি? গলা চড়িয়ে বলল, আসছি। দাঁড়া।

বিছানা থেকে নেমে লাঠি শক্ত করে ধরল দিব্যজ্যোতি। হাঁটতে গেলে টাল খাচ্ছে না বটে, তবে এখনও যেন কাঁপে ডান পা। এ-সপ্তাহ থেকে ফিজিওথেরাপিস্ট এক বেলা আসছে। আজ সকালেই ছেলেটা বলছিল, হাতের চেয়েও পা নাকি বেশি দিন ভোগাবে। অনেকটা ভার নিতে হয় কিনা।

খুট খুট লাঠি বাজিয়ে দিব্যজ্যোতি দরজায় এল। পাল্লা খুলে অবাক। গোবিন্দ নয়, ঝুনি!

দিব্যজ্যোতি ঘাড় উঁচিয়ে ল্যান্ডিংটা দেখছিল। ঝুনি ফিক করে হাসল, কাকে খুঁজছ? মিমলি? সে আজ আসেনি।

দরজা থেকে সরে এল দিব্যজ্যোতি। স্বাভাবিক গলাতেই বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ভেতরে আয়।

প্যাসেজে ঢুকে চটি ছাড়তে ছাড়তে ঝুনি বলল, মিমলিকে না-দেখে হতাশ হলে নাকি?

সবসময়ে এত সিলি কথা বলিস কেন?... সদর দরজা ভাল করে লাগিয়ে দে।

ফের বিছানায় এসে বসল দিব্যজ্যোতি। লাঠিটা পাশে রেখেছে। ঝুনি

বেড়াল পায়ে অন্দরমহল ঘুরে দিব্যজ্যোতির ঘরে এল। চোখ বড় বড় করে বলল, তাই ভাবি, তুমি দরজা খুললে কেন! বাড়ি ফাঁকা! গেল কোথায় সব?

যে যার কাজে গেছে। সময় হলেই আসবে।

কম্পিউটারের সামনে রাখা চেয়ার টেনে এনে বসল ঝুনি। ঠোঁটে চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল, এমন কাঠ কাঠ করে বলছ কেন? আমায় দেখে খুশি হওনি মনে হচ্ছে?

তোকে দেখে অখুশি হতে যাব কোন দুঃখে?

এক সময়ে কিন্তু... ঝুনি দুলছে অল্প অল্প। গলার আওয়াজটাকেও দুলিয়ে দিয়ে বলল, এরকম একা বাড়িতে আমায় দেখলে তোমার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত।

পুরনো কথা থাক।

থাক তবে। ঝুনি স্থির হল। চোখ কুঁচকে দেখল দাবার বোর্ডখানা। তারপর যেন আপন মনেই বলে উঠেছে, তবে কী জানো দিব্যদা... পাস্ট ভীষণ বিচ্ছিরি ব্যাপার, কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। কোনও না-কোনওভাবে সে ঘুরে-ফিরে আসবেই লাইফে।

ভাঁজ মারিস না তো। প্যাঁচোয়া ডায়ালগ আমার পছন্দ হয় না। যা বলবি স্ট্রেটকাট বল।

শুনবে? সে ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।... পৃথাবউদির সঙ্গে কবেই তো তোমার কাট্টি হয়ে গেছে, তারপর থেকে তো তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগই নেই। সে কোথায় আছে, কেমন আছে, কিছুই জানি না। শুধু বড়মাসির কাছে শুনেছি, সে এখন হ্যাপিলি ম্যারেড।

হ্যাঁ। কণাদকে বিয়ে করেছে। কণাদ আমার ছাত্র। তো?

আরে সেই কণাদের গল্পই তো বলতে চাই। হঠাৎ ওই কণাদ একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে হাজির! ভাবতে পারো?

কণাদ? তোদের বাড়ি? কেন?

সেও এক কাহিনি। কত কী যে ঘটে গো!... কণাদবাবু নাকি আমার বিভাসবাবুর স্কুলের ক্লাসমেট! বিভাস একদিন অফিস থেকে

বেরোচ্ছিল, হঠাৎই পার্ক স্ট্রিটে কণাদের সঙ্গে মোলাকাত। অনেক বছর পর পুরনো বন্ধুর দেখা পেয়ে বিভাসের বুকে পুলক জাগল, টানতে টানতে বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে।

অ। তা এমন তো হতেই পারে।

সে তো বটেই। তবে তোমার এক্স-বউয়ের একদা-প্রেমিক-এখন-হাজব্যান্ডটি সেদিন কিন্তু আমায় খুব বোর করেছে। ঝুনি মুখভঙ্গি করল, আমি তো তাকে চিনতেও পারিনি। তুমি ছাড়া কাকেই বা সে যুগে আর চিনতাম, বলো! হয়তো দেখেছি। তোমার কত ছাত্রকেই তো চোখে পড়ত। তোমরা তো তখন কেউ আমায় বলোনি, পার্টিকুলার ওই ছাত্রটির সঙ্গেই তোমার বউ...। বাট দ্যাট কণাদ কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমাকে রেকগনাইজ করল।

তুই সুন্দরী তো, তাই বোধহয় মনে রেখে দিয়েছে।

টিজ করো না দিব্যদা। ঝুনি ঠোঁট টিপে হাসল, একদিন এই ঝুনিকেই কিন্তু তোমার কুৎসিত লাগেনি।

বাজে কথা ছাড়। যা বলছিস, বল।

ইস, তোমার দেখি খুব আগ্রহ! ঝুনি মুখময় ছড়িয়ে নিল হাসিটা, হ্যাঁ... হয়েছে কী... মিস্টার কণাদের সঙ্গে বিভাস আমার আলাপ করিয়ে দিতেই সে সটান বলে উঠল, আমি তো আপনাকে চিনি! আপনি তো দিব্যদার বোন! পৃথা, আই মিন আমার মিসেসের কাছে আপনাদের দুই বোনের অনেক গল্প শুনেছি। দিব্যদা আপনাদের কত ভালবাসেন! আপনাদের জন্য কত কী করেছেন!... ভাবো তুমি, কী বজ্জাতি! আমাকে চাপে ফেলার কী চেষ্টা!

দিব্যজ্যোতি আলগা হাসল, তুইও তা হলে চাপে পড়িস?

অত সোজা! আমি ম্যানেজ করে নিয়েছি। হেসেটেসে। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে। তবে চলে যাওয়ার পরে মনে হল, কী জানি ওই কণাদ যদি বিভাসকে গলগল করে সব কথা...। যাক গে যাক, মরুক গে যাক, বললে বলবে। অত ভাবাভাবি আমার পোষায় না।... অ্যাদ্দিন পর জেনে বিভাস করবেটাই বা কী? হয় কোঁত করে গিলে নেবে, নয় আমায় প্রশ্ন

করবে। গিলে নিল, তো ঢুকেই গেল। জিজ্ঞেস করলে সোজা ডিনাই।... কাকে সে বিশ্বাস করবে? বউ? না বন্ধু?

তেরচা চোখে দিব্যজ্যোতি বলল, আরও কিছু করতে পারে। যদি তোকে ছেড়ে চলে যায়?

ঝুনি দু'-এক সেকেন্ড চুপ। তারপর হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ে আর কী। কোনওক্রমে হাসির দমক সামলে বলল, ওফ. একটা কথা বললে বটে! বিভাস কোন যুক্তি দিয়ে আমায় ছাড়বে, অ্যাঁ? বিশ্বসুদ্ধু লোককে মুখ ফুটে বলতে পারবে কারণটা? নিজের মুখ পুড়বে না? তা ছাড়া বিয়ের আগে আমার কার সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল, সেই গ্রাউন্ডে ডিভোর্স হয় নাকি? জজ ওকে কান ধরে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে দেবে।

দিব্যজ্যোতি আরও একটু উসকোনো গলায় বলল, তবু... তোদের সম্পর্কে একটা ফাটল তো ধরে যাবে।

ধরতে দেবই না। ঠিক জোড়া লাগিয়ে নেব।... শোনো দিব্যদা, অত দূর ভাবার দরকারই নেই। বিভাস বিশ্বাস করবেই না। তোমার কোনও বদনাম শোনার আগে ও কানে আঙুল দেবে। যা রেসপেক্ট করে তোমায়।

সদর দরজায় আওয়াজ। গোবিন্দ ফিরল। দিব্যজ্যোতির ঘর এক ঝলক দেখে নিয়ে সরে যাচ্ছিল, ঝুনি চেঁচিয়ে ডাকল, অ্যাই. অ্যাই, শোন...?

ঘুরে এসেছে গোবিন্দ। মীরার শাড়িগুলো সামলাতে সামলাতে বলল, আজ্ঞে, কাকিমা?

অ্যাই, আবার কাকিমা! মাসি বল।.. কফি বানাতে পারিস?

হ্যাঁ।

দিব্যদাও তো খাবে... দু'কাপ করে আন। ঝটপট। আমি তোর মামার মতো তিতকুটে কফি খাই না, আমায় দুধ, চিনি সব দিবি।

মামাকে এখন চিঁড়েভাজা দেব। তুমি খাবে চাট্টি?

নাহ্। শুধু কফি।

গুছিয়ে হুকুম করে বাহারি ভ্যানিটিব্যাগখানা খুলেছে ঝুনি। রুমাল

বার করে মুখে জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল সযত্নে। ছোট্ট আয়না সামনে ধরে দেখছে নিজেকে। তাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল দিব্যজ্যোতি। নজরে পড়তেই ঝুনি টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছে। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ গো?

কিছু না।

লিপস্টিক খুলে ঠোঁটে বোলাল ঝুনি, তোমার পেয়ারের রুনি তা হলে শ্বশুরবাড়ি চলল?

দিব্যজ্যোতি ঠোঁট ছুঁচোলো করল, আমি যে উলটোটাই শুনলাম।

মানে? ফট করে হাতআয়না বন্ধ করেছে ঝুনি। বিস্মিত মুখে বলল, দিদির বিয়ে আবার কেঁচে গেল নাকি!

আরে না। শুনলাম সোহমই নাকি রুনির ফ্ল্যাটে এসে থাকবে।

তাই বলো। রুমাল, আয়না, লিপস্টিক ব্যাগে রাখল ঝুনি। চটুল হেসে বলল, দিদি যে কোনও দিন বিয়ে করবে, এ আমি এক্সপেক্টই করিনি। এখন দেখা যাচ্ছে, আলটিমেটলি তোমার ওপর ওর সেই অক্ষয় প্রেমও উবে গেছে।

প্রেম কখনও অক্ষয় হয় না রে ভাই। ভেরি মাচ পেরিশেবল। নশ্বর। কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিলে কিছু দিন থাকে বটে, তবে শেষ পর্যন্ত পচেই যায়। তখন তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। তার চেয়ে উবে যাওয়া ঢের ঢের ভাল।

কথার ফুলঝুরি ছুটিও না দিব্যদা। আমি জানি, তুমি মনে মনে দাগা পেয়েছ।... বলতে না, রুনির মধ্যে একটা ডেপথ্ আছে...। কোথায় গেল সেই ডেপ্থ, অ্যাঁ? সোহম সব ভাসিয়ে দিল তো?

দিব্যজ্যোতি হো হো হেসে উঠল, ওরে শোন, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিব্যজ্যোতি সিংহর হিংসে জাগানো যায় না। কোনও ব্যাপারে, কারও ওপর, আমার যদি হিংসে হয়, আমি সেটাকে ফাইট আউট করি। তবে তুই যে এখনও জ্বলিস, সেটা কিন্তু প্রমাণ করে দিলি।

আমার ভারী বয়ে গেছে। আমি দিদির চেয়ে ঢের ভাল আছি।

গুড। ওরকমটাই থাকার চেষ্টা কর।... এবার ধানাইপানাই ছেড়ে

ঝেড়ে কাশ তো। হঠাৎ কেন আবির্ভূত হলি বল?

বা রে, আমি তো প্রায়ই তোমায় দেখতে আসি। আসি না?

সঙ্গে সারাক্ষণ একটা ল্যাংবোট থাকে, আজ তাকে রেখে এসেছিস যে বড়?

ঝুনির মুখে হাসি ফিরে এল, আমি জানি মিমলিকে দেখার জন্য তুমি ছটফট করো। নিজের মেয়ের ওপর টান যাবে কোথায়?

কাজের কথা বল ঝুনি।

ঝুনির মুখ ফের গম্ভীর। চোয়াল শক্ত করে বলল, হ্যাঁ, বলতে তো হবেই। তুমি যতই অস্বীকার করো, মিমলির কিন্তু তোমার ওপর একটা অধিকার আছে। তোমার সব কিছুই মিমলির প্রাপ্য।

দিব্যর কপালে হালকা ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল। মুচকি হেসে বলল, আমার তো কিছুই থাকবে না রে। কী দেব?

আমাকে বোকা ভেবো না, দিব্যদা। তোমার সুবর্ণলতা আছে, বাড়ি আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও নেহাত কম নেই...

তুই আমার পাসবই দেখেছিস নাকি?

আন্দাজ তো করতে পারি। দিদার সম্পত্তিটাই তো ষোলো লাখে বেচেছ।

উঁহুঁ। টোটাল একুশ লাখ পেয়েছিলাম। মা সঠিক ইনফরমেশন পায়নি। দিব্যজ্যোতি বাঁকা হাসল, উইল তো আমি মনে মনে বানিয়ে ফেলেছি রে। সুবর্ণলতার জন্য একটা ট্রাস্ট তৈরি হবে। বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, এভরিথিং চলে যাবে ট্রাস্টে। এমনকী আমার মৃত্যুর পরে যদি কোনও ছবি বিক্রি হয়, তার টাকাও। কে সেই ট্রাস্টের প্রধান হবে, তাও আমার ঠিক করা হয়ে গেছে।

ঝুনি পাংশু মুখে জিজ্ঞেস করল, কে?

তুই জেনে কী করবি? আমি মরার পরেই দেখতে পাবি।

বুঝেছি।... দিদি?

দিব্যজ্যোতি আবার হো হো হেসে উঠল। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, নাহ্, তুই আর বড় হলি না।

গুমগুমে গলায় ঝুনি বলল, কবে উইলটা করছ?

তাড়া কীসের। ধীরেসুস্থে করে ফেলব।

কফি এনেছে গোবি...। সঙ্গে দিব্যজ্যোতির চিঁড়েভাজাও। রেখে চলে যেতে যেতে বলল, গল্প করতে করতে খেয়ে নাও, মামা। অনেকক্ষণ তোমার পেট খালি আছে।

দিব্যজ্যোতি চামচে করে চিঁড়েভাজা ফেলল মুখে। চিবোতে চিবোতে বলল, নে, কফি খা।

ছোট্ট চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল ঝুনি। শুকনো গলায় বলল, মিমলি সত্যিই কিছু পাবে না?

দিব্যজ্যোতি জবাব দিল না। টুকটুক করে খেয়েই যাচ্ছে চিঁড়েভাজা। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে কাপে। হাসিহাসি মুখে ঝুনিকে বলল, কফিটা খা। জুড়িয়ে যাচ্ছে যে।

থাক। আমার তেষ্টা মরে গেছে।... যাচ্ছি।

ঝুনি চলে যাওয়ার পর দিব্যজ্যোতির মনে হল আজ ভারী সুন্দর করে সেজে এসেছিল ঝুনি। ময়ূরপঙ্খী রং শাড়ি, ঘাড়ের কাছে এলোখোঁপা, কপালে ছোট্ট খয়েরি টিপ... বেশ দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে। লম্বা একটা শ্বাস টেনে দিব্যজ্যোতি টানটান হল বিছানায়। পাশে দাবার বোর্ডে যুযুধান প্রতিপক্ষ। সাদা আর কালো। মিনিট দশেক চোখ বুজে থেকে আবার উঠে পড়েছে। ঝুঁকল দাবার লড়াইয়ে। সাদা মন্ত্রীটাকে এগিয়ে দিল কোনাকুনি। হাঁক পাড়ল, গোবিন্দ, কাপপ্লেটগুলো এখান থেকে সরা। আর ও-ঘর থেকে দিদার টেলিফোনের ছোট বইটা আমায় দিয়ে যা তো।

মীরার কালো ডায়েরিখানা রেখে চলে যাচ্ছিল গোবিন্দ। দিব্যজ্যোতি ফের বলল, দাঁড়া। আর একটা কাজ আছে। আমার কাঠের আলমারিটা খোল। দ্যাখ মাঝের তাকে একটা কাচের বড় বোতল আছে, বের কর।

হুইস্কির বোতল হাতে নিয়ে গোবিন্দ শিহরিত, এ মা, এ তো মদ!

দিব্যজ্যোতি হেসে বলল, দুর ব্যাটা। ওটাকে বলে কারণবারি। ...লে

মন চাঙ্গা হয়। যা, এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো একটা গ্লাস আর ঠান্ডা জল এনে দে তো।

সাইডটেবিলে পানীয়র আয়োজন। অনেকদিন পর সোনালি তরলের মায়াবী হাতছানি। দিব্যজ্যোতি বোতলটা তুলেও কী ভেবে রেখে দিল। মীরার ডায়েরিটা ঘাঁটছে। খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেল প্রার্থিত নম্বর। কর্ডলেস টেলিফোন হাতে থেমে রইল ক্ষণকাল। তারপর বুড়ো আঙুলে বোতাম টিপছে।

রিং বেজে উঠল। বাজছে। বাজছে।

বারদশেক ঘণ্টি বাজার পর সাড়া পাওয়া গেল। বাচ্চার গলা, হ্যালো?

দিব্যজ্যোতি যেন হোঁচট খেল সামান্য।

ওপারে ফের রিনরিনে স্বর, হ্যালো? কে বলছ?

তুমি কে বলছ?

আমি টুকুস। না না, আমি অনিরুদ্ধ।

কেন, টুকুস নামটাই তো বেশ।

কিন্তু মা যে বলেছে অচেনা লোকদের ভাল নাম বলতে!

তাই নাকি? আমার তো বাবা টুকুসটাই বেশি ভাল লাগছে। তোমার মা কোথায়, টুকুস?

বাড়ি নেই। ফিরতে দেরি হবে। দাদুকে দেখতে গেছে।

কোন দাদু? যিনি সুকিয়া স্ট্রিটে থাকেন?

তুমি আমার দাদুকে চেনো?

চেনা তো উচিত। কী হয়েছে তোমার দাদুর?

ফ্র্যাকচার। পা ভেঙে গেছে।

সর্বনাশ! কী করে ভাঙল?

সে এক কাণ্ড! একটা লোক নাকি ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিল না, ঘুরে ঘুরে মরছিল, দাদু তাকে ঠিকানা খুঁজে দিতে একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকেছিল। সেই লোকটাকে বাড়ি খুঁজে দিয়ে আসার সময়ে নিজেই একটা গর্তে পড়ে গেছে।

দিব্যজ্যোতি স্থির হয়ে গেল। গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

আবার টুকুসের স্বর, কী হল? শুনছ?

হুঁ। শুনলাম। তোমার দাদুর কপালটাই খারাপ।

যা বলেছ। বাসে-ট্রামে উঠবে না, শুধু হেঁটে হেঁটে ঘুরবে। দিদা কত বকাবকি করে, দাদু শোনেই না। থাকো এখন পায়ে প্লাস্টার নিয়ে পড়ে। টুকুস একটু দম নিল যেন। বড়দের ভঙ্গিতেই বলল, জানো তো, আমার বাবারও খুব ছোটাছুটি যাচ্ছে। দাদুকে নিয়ে ডাক্তার হসপিটাল, তার ওপর আবার নিজের অফিস...।

এই রকমই হয়, টুকুস। একজনের খেয়ালিপনায় পাঁচজনকে ভুগতে হয়।... তা তুমি কি এখন বাড়িতে একা?

না তো। ময়নামাসি আছে। টিভি দেখছে। ডাকব?

থাক। তোমার সঙ্গেই তো বেশ গল্প করছি। তোমার ডিস্টার্ব হচ্ছে না তো?

একটু একটু হচ্ছে।

সে কী? কেন?

এখনও যে হোমওয়ার্ক ফিনিশ হয়নি। বেঙ্গলি এসেটা না লিখে রাখলে মা এসে ঝাড় দেবে।

সরি। সরি। তা হলে তো এবার ছাড়তে হয়।

কিন্তু তুমি কে, তা তো এখনও বললে না?

আমি? আমি একটা রাক্ষস।

যাহ্, গুল মেরো না। রাক্ষস তো স্টোরিবুকে থাকে।

তার বাইরেও আছে দু'-চারটে। আমার মতো। যে গপ করে সবাইকে গিলে ফেলে।

মাকে তা হলে কী বলব? একটা রাক্ষস তোমায় ফোনে খুঁজছিল?

তাই বোলো।

ঠিক আছে। বাই।

বাই।

টেলিফোন অফ করে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল দিব্যজ্যোতি। চুমুক দিয়ে আপনাআপনি বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। বেশ কিছুদিন পর শরীরে যাচ্ছে অ্যালকোহল। জানান দিচ্ছে। ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে চোখ ঘোরাল রণক্ষেত্রে। সাদা-কালোর যুদ্ধ এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। কালোই জিতবে মনে হচ্ছে। সাদার কি আর কোনও চান্স নেই? মন্ত্রীকে যদি ঠিকঠাক ব্যবহার করা যায়...। কিন্তু বল এত কমে এসেছে...!

গ্লাস শূন্য করে দিব্যজ্যোতি বাথরুমে গেল। ফিরে আর দাবায় বসল না, খেলার উৎসাহ যেন অনেকটা নিবে এসেছে। লাঠি ধরে ধরে এল ঝুলবারান্দায়।

খাঁচায় অল্প অল্প নড়াচড়া করছে গোবিন্দর পাখি। দিব্যজ্যোতি ঝুঁকল খাঁচার সামনে। ওমনি সরু লোহার দাঁড় বেয়ে পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে পাখিটা।

দিব্যজ্যোতি হেসে উঠল, বোকা কোথাকার। ভিতুর ডিম...! ধরা পড়লি কী করে?

পাখি চোখ পিটপিট করল।

দিব্যজ্যোতি আরও জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে গান ধরেছে, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়... ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম তাহার পায়ে...

দু'লাইন গাইতেই গানটা যেন দখল করে নিল দিব্যজ্যোতিকে। গলা চড়ছে ক্রমশ,—

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝল্‌কা কাটা,
তার উপরে আছে সদর কোঠা আয়নামহল তায়...

গোবিন্দ বারান্দায় উঁকি দিয়েছে। জুলজুল চোখে দেখছে মামাকে।

দিব্যজ্যোতি গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রে ব্যাটা, কেমন শুনছিস?

বলেই উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকে সামনে হাত মেলে দিয়েছে। ফিরছে ঘরে। হাঁটিতে হাঁটতে গাইছে,

মন তুই রইলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে রে।
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে,
ও মন
লালন কয় খাঁচা খুলে সে পাখি কুনখানে পালায়...

নিজের ঘরের চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়েও দিব্যজ্যোতি দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ছাদে ওঠার সিঁড়িটাকে। সুরার প্রভাবে মাথা অল্প ঝিমঝিম। বহুকাল খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ানো হয়নি, যাবে একবার?

সিঁড়িতে পা রাখতেই পিছনে গোবিন্দ, তুমি ওপরে চললে যে? তোমার না সিঁড়ি চড়া বারণ?

বেশি গার্জেনি ফলাস না তো। উর্ধ্বপানে চলি আমি, রোধে কে আমায়!

লালনের সুরে স্বরচিত পঙ্‌ক্তি গেয়ে উঠল দিব্যজ্যোতি। লাঠিতে ভর দিয়ে, সময় নিয়ে নিয়ে, ভাঙছে সিঁড়ি। একটা করে ধাপ, একটু করে থামা। বাইশটা সিঁড়ি চড়তে যেন বাইশ বছর সময় লেগে গেল। ওপরে ওঠা কী যে কঠিন!

ছাদে পৌঁছে হাঁপাচ্ছে দিব্যজ্যোতি। ঘেমে গেছে রীতিমতো। কাঁপছে থিরথির। মিষ্টি হাওয়ার ঝাপটা এল সহসা। কিছুটা যেন জুড়োল শরীর। চিলেকোঠার দেওয়ালে হেলান দিয়ে তাকাল উপর পানে। মেঘ নেই, সন্ধের আকাশে ঝিকমিক করছে তারা।

চোখ চালিয়ে দিব্যজ্যোতি চেনা তারাদের খুঁজতে শুরু করল। ওই তো সপ্তর্ষিমণ্ডল। পুলহ, ক্রতু... সোজা চলে গেলে ওই তো সিংহ রাশি। ওদিকের উজ্জ্বল তারাটা মঘা না? সিংহরাশির পূর্ব দিকে তো বুয়োটিসের থাকার কথা!

হ্যাঁ, আছে। লালচে রং স্বাতীকেও দেখা যায়। কিন্তু চিত্রা কোথায় গেল? আবার সপ্তর্ষিমণ্ডলে এল দিব্যজ্যোতি। আন্দাজে আন্দাজে বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা আর মরীচিকে জুড়ল। বৃত্তচাপের মতো লাইনটাকে ঘুরিয়ে দিল দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে। আছে, আছে, স্বাতীর পরে চিত্রাও আছে। উত্তরফাল্গুনী, চিত্রা আর স্বাতী... মুঙ্গেরের দাদু বলত, ঠিক যেন ত্রিভুজের তিনটে কোণ। আরও কত তারা যে তাকে চিনিয়েছিল দাদু। শ্রবণা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, রোহিণী...

রোহিণীর বিয়ে। শ্রাবণ মাসে দিল্লি যেতেই হবে দিব্যজ্যোতিকে। গাঢ় নীল আকাশে দিব্যজ্যোতি রোহিণী তারাটাকে খুঁজল। নেই। কৃত্তিকাকেও দেখা যায় না। কোথায় যে হারিয়ে যায় তারাগুলো! সোনামাটির আকাশ হলে হয়তো চোখে পড়ত। সুবর্ণলতা ঠিকঠাক চলছে তো এখন? কল্পনার বড্ড রাগ, নিজের সব জ্বালাপোড়া দিব্যজ্যোতির সুবর্ণলতায় উগরে দেয়। পৃথা আর কণাদকে একবার বলবে, টুকুসকে নিয়ে সুবর্ণলতায় যেতে? যাবে কি পৃথা?

দিব্যজ্যোতি আবার দৃষ্টি মেলল আকাশে। কী তিথি কে জানে, চাঁদ আজ ওঠেনি এখনও। অন্ধকার ঘনতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জের ঔজ্জ্বল্যও যেন বাড়ছে ক্রমশ। বিচ্ছুরিত হচ্ছে অজস্র রং। খাঁচা খুলে দিলে পাখি কি ওই রঙের দেশে উড়ে যেতে পারে?

ফের দিব্যজ্যোতি গেয়ে উঠল,—

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা...
মধ্যে মধ্যে ঝল্কা কাটা...
তার ওপরে আছে সদর কোঠা আয়নামহল তায়...

হঠাৎই ছিঁড়ে গেল গান। সহসা শরীরের সমস্ত রক্ত আলোর গতিতে ধেয়ে এসে আঘাত করল দিব্যজ্যোতির মাথায়। একটা তীক্ষ্ণ, তপ্ত, লৌহশলাকা মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করল যেন। মুহূর্তের জন্য, অথবা মুহূর্তের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের জন্য, দিব্যজ্যোতির কণ্ঠনালি ছিঁড়ে এক বিকট

গোঙানি ছিটকে এল। পরক্ষণে দীর্ঘ দেহটি আছড়ে পড়েছে মাটিতে। পাশে লাঠিটাও।

শরীর থেকে শেষ বাতাসটুকু বেরিয়ে যাওয়ার আগে ক্ষীণভাবে দিব্যজ্যোতির মনে হল, সাদা আর কালোর যুদ্ধটা অসমাপ্তই রয়ে গেল।

নিষ্প্রাণ দুটো খোলা চোখ অসীম মহাশূন্যে তারাদের দেখছে এখন। নক্ষত্ররাও দিব্যজ্যোতিকে দেখছিল। জ্বলছিল মিটমিট। নিবছিল।
